বিক্রমপুর

(ত্রৈমাসিক পত্র ও সমালোচন)

সন ১৩২০ সাল

(প্রথম বর্ষ)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত

কলিকাতা

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীমনোরঞ্জন সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত

পোঃ ফুলকোচা, জিঃ ময়মনসিংহ, মহারামকোল

হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাশুল

এক টাকা দুই আনা মাত্র।

সূচী

১। শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ঢাকা লালবাগের দুর্গ ৩

রোয়াইলের কাশ্যপবংশ ৩৫

কার্ত্তিক বারুণীর মেলা ১১০

তিন দরিয়া ১৪৭

২। শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন গুপ্ত

পণ্ডিত জগন্নাথ সার্ব্বভৌম ১৪৫

৩। শ্রীমতী আশালতা সেন

অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব ১৩

৪। শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ

নাস্তে সুখমস্তি (কবিতা) ৪৯

বৈষম্য „ ১২৫

৫। শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ

জ্ঞান ও জটিলতা (কবিতা) ১৪১

৬। শ্রীকৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী

সাধনার ধন (কবিতা) ১১৭

৭। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভাদুরী

আকাশ ১০৬

৮। শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল,

বিক্রমপুর-প্রসঙ্গ ৬১

৯। শ্রীমতী চারুবালা দেবী

মৃত্যু (কবিতা) ১২

অন্তিম-প্রার্থনা ৬০

১০। শ্রীদুর্গামোহন কুশারী

পল্লীপুকুর ১৯৫

১১। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ,

বিক্রমপুর (কবিতা) ২১

মিরকাদিমের খাল ৭৭

১২। শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নববর্ষে ২৪

১৩। শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

আহ্বান (কবিতা) ২৯

১৪। শ্রীমতী প্রতিভাময়ী দেবী

প্রভাত (কবিতা) ৩

নিবেদন " ৮৯

পরাজয়ে " ১৬২

১৫। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

নিঃসঙ্গ (গল্প) ৪১, ৯৫

১৬। শ্রীমতী ভক্তিসুধা উকীল

স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী জাতির কর্ত্তব্য ১৬৩

১৭। শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী

নিরাকুলির ব্রত ১০০

আকুলির ব্রত ১৯৭

১৮। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ

ইরিথ্রিয়ান সাগর ১৭

১৯। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সূচনা ১

পণ্ডিত কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম ৬

কাঞ্চনমালা (উপকথা) ২৩

স্বর্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় ৫০

বেণুবতী (উপকথা) ৫৫

গ্রাম্য পাঠাগারের উপকারিতা ৯০

বিক্রমপুরের প্রাচীন ভাস্কর্য্য কীর্ত্তি ১১৮

গ্রন্থ সমালোচনা ২৫

সম্পাদকের নিবেদন ৭১

পল্লী কথা ১৮৬

টেপাই (উপকথা) ১৫৬

সাগর-সঙ্গীত (সমালোচনা) ১৭১

৺রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাদুর ১৬১

২০। স্বর্গীয় রেবতীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল

ওঁ তৎসৎ ১৩৪

২১। শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী

চরিত্র ১৩০

২২। সৈয়দ এম্‌দাদ আলী

বিক্রমপুর (কবিতা) ১৩৩

বিক্রমপুরের গ্রামের নাম-পরিবর্ত্তন ১৪১

২৩। শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী

সাধ ১৪২

চিত্র সূচী

১।	ঘসিটি বেগম (ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্র)	১
২।	রঘুরামপুরের পুষ্করিণী খননে প্রাপ্ত সূর্য্য মূর্ত্তি ...	২০
৩।	অজন্তার বহির্দ্দেশ (ত্রিবর্ণ-মুদ্রিত চিত্র)	২৯
৪।	স্বর্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়	৫১
৫।	শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস	৭৭
৬।	মিরকাদিমের পুল	৭৯
৭।	ঐ খালের নক্সা	৮৫
৮।	গণেশ মূর্ত্তি	১২০
৯।	বরাহাবতার মূর্ত্তি	১২৪
১০।	স্বর্গীয় রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাদুর ...	১৩৩
১১।	৺রেবতীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪০
১২।	রেলষ্টেসন তিন দরিয়া	১৪৯
১৩।	ঐ লুপ	১৫২

ঘসেটী বেগম

বিক্রমপুর

প্রথম বর্ষ	বৈশাখ ; ১৩২০	১ম সংখ্যা

সূচনা

সিদ্ধিদাতা জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া 'বিক্রমপুর' কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। বিক্রমপুর হইতে এইরূপ কোন পত্র প্রকাশের চেষ্টা এই নূতন নহে। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক সকল শ্রেণীর পত্রই বিক্রমপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং জলবুদ্বুদের মত কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বিক্রমপুরও ত্রৈমাসিকরূপে কাল-স্রোতে ভেলা ভাসাইল—সর্ব্ব-নিয়ন্তা জগদীশ্বরই বলিতে পারেন কোথায় ইহার পরিণতি!

এখন নবীন যুগ। নবীন শিক্ষা ও সভ্যতার দিন। শিক্ষিত নর-নারীর অবধি নাই—তাই আজ নবীন উৎসাহ-বলে এই উদ্যম। বিক্রমপুর কি উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে চলিল সংক্ষেপে এই ক্ষুদ্র সূচনায় তাহারও একটু আভাষ দিলাম। বিক্রমপুর - বাঙ্গালার ইতিহাসের অতীত গৌরব-ভূমি। এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রাজধানীতে পালরাজবংশ, সেনরাজবংশ, বর্ম্মরাজবংশের কত শত কীর্ত্তিশালী রাজেন্দ্রবৃন্দ অতুল গৌরবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন—তাহাদের অসংখ্য কীর্ত্তি-গৌরব এখনও মাতা বসুমতীর উদর-গহ্বর হইতে বিনির্গত হইয়া আমাদিগকে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন করিতেছে। এই দেশ শিলভদ্র, দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান অতীষ, হলায়ুধ প্রভৃতি মহামনীষিগণের মাতৃভূমি—যাঁহাদের যশ-গরিমায় আজ সমগ্র বাঙ্গালী ও সমগ্র বাঙ্গালা দেশ জগৎপূজ্য পুণ্যতীর্থ। তার পর বর্ত্তমান যুগেও পণ্ডিত কমলাকান্ত, প্রসন্নকুমার, জগদীশচন্দ্র, সার চন্দ্রমাধব, গুরুপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ, চিত্তরঞ্জন, বিজয়রত্ন, রাজা শ্রীনাথ, অনারেবল

সীতানাথ প্রমুখ মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই দেশকে পবিত্র করিয়াছেন। সে দেশ হইতে এরূপ একখানা পত্র প্রকাশের চেষ্টা দুরাশা এমন কথা কেহই বলিবেন না।

বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য-শিল্প-ভাস্কর্য্য, কথা-প্রবচন, উপকথা ও বিক্রমপুরের প্রধান গৌরব মৃত পণ্ডিতবর্গের জীবনীও ইহাতে আলোচিত হইবে—আর যাহাতে মৃত 'বিক্রমপুর সম্মিলনী' সভা পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারেরও কোন উপায় নির্দ্ধারিত হয় তৎপক্ষেও বিশেষ লক্ষ্য রহিবে। তার পর বিক্রমপুরবাসী প্রবাসী ছাত্রগণের কথা, স্বাস্থ্য-নীতি, সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের উপায় ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা দ্বারা ইহার কলেবর পুষ্ট হইবে।

'বিক্রমপুর' প্রাদেশিক পত্র বলিয়া ইহার মধ্যে কোনরূপ দেশগত, সম্প্রদায়-গত কিংবা জাতিগত সংকীর্ণতা রহিবে না—কোনরূপ রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনাও ইহাতে হইবে না। বিক্রমপুরবাসী নরনারীর মধ্যে প্রীতি ও একতা বর্দ্ধন করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য।

বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অভিনব উন্নতির যুগে বিক্রমপুরের চারিদিকে নব্যযুবকগণের মধ্যে যে দেশ-প্রীতি ও সাহিত্যানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে—আমরা সেই আশা ও উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলাম। কোন পত্রিকারই প্রথম সংখ্যা আশানুরূপ হইতে পারে না, বিক্রমপুরেরও যে হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। তবে দেশবাসীর আশা ও উৎসাহ পাইলে আমরা যে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব সে ভরসা আমাদের আছে।

এখন প্রত্যেক বিক্রমপুরবাসীর নিকট করযোড়ে নিবেদন তাঁহারা আমাদের সহায় হউন। 'বিক্রমপুর'—বিক্রমপুরবাসীর। তাঁহারা তাঁহাদের 'বিক্রমপুর'কে সাদরে বরণ করিয়া লউন—প্রত্যেকে নিজ নিজ চেষ্টা যত্ন ও সাহায্য দ্বারা ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়া নিজ দেশের গৌরব বর্দ্ধন করুন তাহা হইলেই আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

——o——

প্রভাত

কুহেলি গিয়াছে কাটি,　　আলোকিত শুভ্র পথে
দাঁড়ায়েছি আমরা সকলে,
নবীন কিরণে আজি　　নবরবি হাসি মুখে,
আবাহন করিছে ভূতলে।
এস হাতে হাতে ধরি　　হই সবে অগ্রসর
কার্য্যক্ষেত্র বিশাল ভুবন,
পশ্চাতে পড়িয়া একা,　　আঁধারে কাঁদিবে আহা,
লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে কোন জন।
একটী স্নেহের কোলে,　　পালিত আমরা সবে,
কি মধুর মিলনের গান,
আঁধারের অবসানে,　　নবীন আলোকে পুনঃ
সাথীগণে করিছে আহ্বান।
জীবন-প্রভাতে গাহ　　আশার রাগিণী আজ
মুছে যাক্ অতীত কালিমা,
আকুল বিশ্বের এই,　　পরিপূর্ণ আবাহনে
গেঁথে লও দূরত্বের সীমা।

শ্রীমতী প্রতিভাময়ী দেবী

ঢাকা লালবাগের দুর্গ

'Of the fort itself only the battlements facing the river, with terraces and turrets and two imposing gateways, still remain. Grass-grown and falling to decay, the old red walls, with the thin, flat Mussalman bricks here and there destroyed and broken, have but grown the more picturesque with age, the high-arched gateway, rising tier out tier, looking out like a watch tower over river and land.' Bradley Birt.

১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ ঔরংজেবের তৃতীয় পুত্র রাজকুমার আজিম ঢাকা-অবস্থান সময়ে লালবাগ দুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিনি ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সে সময়ে রাজপুতদের সহিত দীল্লির সম্রাটের যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় রাজকুমার আজিম ১৪ই আগষ্ট (১৬৭৯ খ্রীঃ) ঢাকা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। নবাব আজিমের ঢাকা পরিত্যাগের কারণ সম্বন্ধে খাঁ বাহাদুর বলেন,—'মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সম্রাট্ ঔরংজেব পুত্র আজিমকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।' * ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট সাহেবের "বাংলার ইতিহাসে" দেখিতে পাই—'কতকগুলি কারণে রাজপুতেরা ঔরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে জিজিয়া কর স্থাপন, মন্দির ধ্বংস ও যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহের উত্তরাধিকারীদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সেই সময় (১৬৭৮—৯ খ্রীঃ) বাদশাহ শিবাজীর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া চতুর্দ্দিকে নিযুক্ত বড় বড় কর্ম্মচারী ও সেনাপতি-দিগকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পিতার আদেশে সুলতান ১৪ই আগষ্ট, ১৬৭৯ খ্রীঃ ঢাকা পরিত্যাগ করেন।' *

রাজকুমার আজিমের দীল্লি প্রত্যাবর্ত্তনের পর নবাব সায়েস্তা খাঁ দ্বিতীয় বার ঢাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন। মেসার্স টেলর ও ক্লে সাহেবের মতে দুর্গনির্ম্মাণ সময়ে কন্যা পরিবিবির অকাল মৃত্যু হয় বলিয়া নবাব সায়েস্তা খাঁ ইহা অমঙ্গলজনক মনে করিয়া একাজে আর হস্তক্ষেপ করেন নাই। দুর্গ অসম্পূর্ণাবস্থায়ই রহিয়া যায়। উপরোক্ত কারণ খুব যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। নবাব সায়েস্তা খাঁর ন্যায় দৃঢ়চিত্ত ও রাজনীতি-কুশল ব্যক্তি যে পারিবারিক দুর্ঘটনার (সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে) জন্য জনসাধারণের হিতকারী কার্য্য উপেক্ষা করিয়াছিলেন ইহা কখনই বিশ্বাস-যোগ্য নয়। সাময়িক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় নিম্নলিখিত তিনটী কারণ বশতঃই লালবাগ দুর্গের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করা হয় নাই।

১। লালবাগের দুর্গ ঢাকানগরী সুরক্ষিত করিবার জন্য নির্ম্মিত হয়

* ষ্টুয়ার্টের বাংলার ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

নাই। তাহা হইলে দূরদর্শী নবাব সায়েস্তা খাঁ সর্ব্বপ্রথমে দুর্গনির্ম্মাণ শেষ করিতেন। নবাব পরিবারের বাসের জন্যই সম্ভবতঃ এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

২। যে সময়ে সায়েস্তা খাঁ ঢাকার নবাব হইয়া আসেন সে সময়ে তিনি 'জিজিয়া' কর লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। সম্রাটের আদেশানুযায়ী কাজ করিতে যাইয়া তিনি প্রজাসাধারণের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়াছিলেন। *

৩। সর্ব্বোপরি ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত নবাবের ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। এই মনোমালিন্য লক্ষ্য করিয়া ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন,— 'গঙ্গার মুখে অথবা উপকূলে দুর্গনির্ম্মাণ করিবার জন্য মিঃ গাইফোর্ড ১৬৮৫ খ্রীঃ কোম্পানীর পক্ষ হইতে নবাব সায়েস্তা খাঁর নিকট আবেদন করেন। নবাব দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি এই সব ব্যাপারে বিদেশীকে বিশ্বাস করিতেন না। দুর্গ নির্ম্মাণে অনুমতি দেওয়া দূরের কথা, তিনি ইংরেজদের আমদানির উপর শতকরা ৩½ টাকা মাশুল ধার্য্য করেন। * * * * এই প্রকারে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা বিরোধের ভাব আসিয়া দাঁড়াইল। বাংলার ব্যবসা ছাড়িয়া দেওয়া অথবা অস্ত্র-গ্রহণ ভিন্ন ইংরেজদের আর অন্য কোন উপায় ছিল না।

এই সব রাজনৈতিক ব্যাপারে নবাব সায়েস্তা খাঁ এতদূর জড়িত হইয়াছিলেন যে তখন তিনি লালবাগ দুর্গের কথা ভাবিতেও অবসর পান নাই। কোম্পানীর গতিবিধির প্রতি নবাবকে সন্ত্রস্তভাবে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইত। লালবাগ দুর্গ অসম্পূর্ণ রাখিবার এসব কারণই অধিকতর সমীচীন ও যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

বর্ত্তমান সময়ে অট্টালিকা ও প্রাচীরের অনেকাংশ ভগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবার অতি উচ্চ দুইটি তোরণ দ্বার। দুর্গের

---

* Immediately after Shaista Khan's return to Bengal, he was compelled, in obedience to the regulations of Aurungzebe, to enforce the Jizia or Poll-tax, from the Hindus ; which circumstance rendered both him and the Emperor very unpopular throughout the Province. Stewarts.

মধ্যস্থলে একটি সুন্দর গভীর জলাশয় আছে। উহা পাথর দিয়া বাঁধান। পরিবিবির সমাধি মন্দিরই দুর্গ মধ্যে দেখিবার প্রধান বস্তু।

পূর্ব্বে এই দুর্গের নিকট দিয়া বুড়ীগঙ্গা প্রবাহিত হইত, কিন্তু এখন উহা কিছু দূরে সরিয়া গিয়াছে। পশ্চিমাংশের প্রাচীর খুব উচ্চ এবং নদী হইতে উহা অতি সুন্দর দেখায়। বিখ্যাত ভ্রমণকারী মিঃ টেভারনিয়ার যখন ঢাকা আসিয়াছিলেন তখন তিনি নবাব সায়েস্তা খাঁকে এই দুর্গের ভিতর এক অস্থায়ী কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে বাস করিতে দেখিয়া যান। *

সম্রাট্ ঔরংজেব এই লালবাগ দুর্গ নবাব সায়েস্তা খাঁকে জায়গীর স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে রিজার্ভ পুলিশ ফৌজ এই দুর্গে অবস্থান করিয়া থাকে। যে দ্বিতল গৃহে ইহারা বাস করে সেই গৃহের নিম্নতলে নবাবের 'হামাম' বা স্নানাগার ছিল। গৃহের স্তম্ভগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত, ছাত খিলান ও গঠন অতি সুন্দর। কথিত আছে রাজকুমার আজিম এই গৃহ বৈঠকখানারূপে ব্যবহার করিতেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের সময় একদল দেশীয় সৈন্য এই দুর্গে স্থাপিত হইয়াছিল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পণ্ডিত কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম

সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য নবদ্বীপ ও বিক্রমপুরের পণ্ডিত সমাজ বিশেষ বিখ্যাত। বিক্রমপুরে কত শত মহা মহা পণ্ডিতের উৎপত্তি হইয়াছে কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা জানি। বন্য কুসুমের ন্যায় তাঁহারা তাঁহাদের পাণ্ডিত্য-সৌরভে একদিন চারিদিক মোহিত করিয়া অনন্ত কাল-সাগরে চির বিলীন হইয়া গিয়াছেন।

* The residence of the Governor is an enclosure of high walls, in the middle of which is a poor house merely built of wood. He ordinarily resides under tents which he pitches in a large court in this enclosure. Tavernier.

কমলাকান্ত বিক্রমপুরের একজন সুসন্তান। এক সময়ে ইঁহার ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাঙ্গালা দেশে আর ছিল না। দুঃখের বিষয় ইঁহার জীবন-কথা বাঙ্গালা দেশের অতি অল্প লোকেই জ্ঞাত আছেন। আনুমানিক ১২০৩ বঙ্গাব্দে বিক্রমপুরস্থ কাঠাদিয়া গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। কমলাকান্তের পিতার নাম ৺রামজীবন চক্রবর্ত্তী। কমলাকান্ত রামজীবন চক্রবর্ত্তীর প্রথম সন্তান। শৈশবে বিদ্যাভ্যাসের প্রতি তাঁহার কোনও মনোযোগ ছিল না। খেলিয়া বেড়িয়াই সময় কাটাইতেন। এজন্য তাঁহাকে পিতামাতার নিকট হইতে প্রতিনিয়ত ভৎর্সনা সহিতে হইত। এক দিন দিবা দ্বিপ্রহরে কমলাকান্ত বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন এরূপ সময়ে তাঁহার খুল্লতাত যজমান বাড়ী হইতে বাড়ী আসিয়া ইহা দেখিতে পাইলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের অল্প বয়সেই এইরূপ মাদক দ্রব্য সেবনে স্পৃহা দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধের সহিত বলিলেন, "হতভাগার লেখাপড়ার সঙ্গে দেখা নাই—তামাক খাইবার বেলা খুব মজবুত,"—কথার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রের পৃষ্ঠ দেশে হুকার দ্বারা গুরুতররূপে আঘাত করিলেন। এই প্রহার ও কটূক্তি কমলাকান্তের প্রতি শুভক্ষণে বর্ষিত হইয়াছিল। বালক কমলাকান্ত তন্মুহূর্ত্তেই বাটী হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের পুরোহিত বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রাবণ মাস। বর্ষাকাল। মাঠভরা জল। বালক কমলাকান্ত এই জল সাঁতারিয়া পার হইয়া প্রায় এক মাইল দূরস্থিত পুরোহিত বাড়ী উপস্থিত হইলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সিক্ত-বস্ত্রে কমলাকান্তকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কমলাকান্ত তুমি এখন এবেশে কেন?"

বালক বলিল—"পুরোহিত দাদা আমি ব্যাকরণের সন্ধি বৃত্তির দুইটী সূত্র না শিখিয়া কিছুতেই এ বস্ত্র ত্যাগ করিব না কিংবা বাড়ী যাইব না।" কমলাকান্ত তখন পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর বালক। পুরোহিত গঙ্গারাম বালকের আগ্রহাতিশয্যে স্নানাহার ভুলিয়া তাঁহাকে দুইটী সূত্র শিক্ষা দিয়া পরে স্নানাহারে প্রবৃত্ত হইলেন। বালক পাঠ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহা শিক্ষা করিয়া অপরাহ্ণে পুনরায় নূতন পাঠ চাহিলেন। পুরোহিত

ঠাকুর কমলাকান্তের এইরূপ অপূর্ব্ব স্মৃতি-শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কমলাকান্ত তদবধি পুরোহিত বাড়ী থাকিয়া ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া বজ্রযোগিনীনিবাসী তৎকালীন প্রধান পণ্ডিত ৺কাশীশঙ্কর সিদ্ধান্ত-বাগীশের নিকট অধ্যয়নার্থ উপস্থিত হইলেন। কাশীশঙ্কর সে সময়ে বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার যশও চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত ছিল। কমলাকান্ত ইঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। জহুরী জহর চিনে—অধ্যাপক সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের কমলাকান্তের অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাইতে অধিক দিন বিলম্ব হইল না। অল্প সময়ের মধ্যেই কমলাকান্ত অধ্যাপকের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয় তাঁহাকে আদর করিয়া 'সোণার কমল' বলিয়া ডাকিতেন। সেকালে নবদ্বীপ না গেলে কেহ উপাধি পাইতেন না। কমলাকান্ত যদিও বিক্রমপুরেই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপন করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহাকে উপাধি-লাভের জন্য নবদ্বীপ যাইতে হইল। এক বিরাট নিমন্ত্রণ সভা-মধ্যে নবদ্বীপের সমুদয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তিনি 'সার্ব্বভৌম' উপাধি লাভ করিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার যশ সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে। দেশে আসিয়াই কমলাকান্ত এক চতুষ্পাঠি স্থাপন করেন—এই চতুষ্পাঠিতে ন্যায়শাস্ত্র অধীত হইত। তাঁহার নিকট ন্যায় পড়িবার জন্য ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে ছাত্রের আগমন হইত—এমন কি সুদূর মহারাষ্ট্র দেশ হইতেও ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। বলা বাহুল্য যে ছাত্রগণের আহারাদির ব্যয়ভার ও থাকিবার সুখ-সুবিধার জন্য অধ্যাপক মহাশয়কেই ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইত।

সেকালের টোলের চিত্র এখন আর দেখিবার সুযোগ নাই। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপনান্তর ছাত্রগণ যখন সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিত তখন গ্রাম্য জনসাধারণ সে দৃশ্য দেখিতে আসিতেন। ছাত্রগণকে সাধারণে পড়ুয়া কহিত। পড়ুয়াদের সাতখুন মাপ ছিল। গ্রাম্য ছোট বড় সকলেই তাহাদের স্নেহ ও আদর করিতেন। পড়ুয়ারাও তেমনি বিদেশে আসিয়াছে এই কথা ভুলিয়া যাইয়া গ্রাম্য ছোট

বড় সকলের সঙ্গে মেলা মিশা করিয়া চলা ফিরা করিত। আপদে-বিপদে সুখে-দুঃখে-উৎসবে-শ্মশানে তাহারা গ্রাম্য জনসাধারণের সহায় ও সম্বল ছিল। এখন সে দিনও আর নাই—বাঙ্গালার সে চিত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। অধ্যাপক ব্রাহ্মণের এখন নিজের ক্ষুদ্র পরিবার প্রতিপালনই দুঃসাধ্য ব্যাপার, ছাত্র পোষণত পরের কথা।

কমলাকান্ত ছাত্রদিগকে মুখে মুখে শাস্ত্র পড়াইতেন। কখনও কোন পুঁথি খুলিয়া পড়াইতেন না। তাঁহার আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তি ছিল। একবার যাহা শুনিতেন—আর তাহা কখন বিস্মৃত হইতেন না। সার্ব্বভৌম মহাশয় বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমগ্র স্থান হইতেই নিমন্ত্রণ পত্র পাইতেন। মুর্শিদাবাদ, হুগলী, মেদিনীপুর, নবদ্বীপ, উলা, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বাঙ্গালা দেশের প্রতি নগর, উপনগর ও গ্রাম হইতে ত তিনি নিমন্ত্রণ পত্র পাইতেনই তা ছাড়া কাশী, দ্রাবিড়, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান হইতেও তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিত। একবার প্রয়াগে নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানকার পণ্ডিত-সমাজকর্ত্তৃক যেরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন অতি বড় রাজপুরুষের অদৃষ্টেও সেরূপ অভ্যর্থনা অতি অল্পই জোটে। সর্ব্বত্র তাঁহার ষোলআনা বিদায় ও ভূষা ছিল।

একবার বিক্রমপুরস্থ ভাগ্যকূলের কুণ্ডবাবুদের বাড়ী বঙ্গদেশীয় সমস্ত পণ্ডিতবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই সভায় বর্ত্তমান সময়ের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ন্যায়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ও নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সমগ্র পণ্ডিতবর্গকে ন্যায়ের একটী কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। সভাস্থ অনেক পণ্ডিত উহার সদুত্তর দিতে অক্ষম হ'ন। কমলাকান্ত রাখালদাসের প্রশ্ন শুনিয়া ব্যাঙ্গোক্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—"রাখাল, তুমি বালক মাত্র। আমার সঙ্গে ন্যায়-শাস্ত্রে তর্ক করা তোমার শোভন হয় না। আমার ছাত্র উপযুক্ত হইয়া যখন নবদ্বীপে তোমার সঙ্গে ন্যায়-শাস্ত্রে তর্ক করিতে যাইবে, তখন দেখিও আমার ন্যায়শাস্ত্রে কতদূর দখল আছে।" ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। রাখালদাস সার্ব্বভৌম মহাশয়ের উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার অন্য প্রকারের ব্যাখ্যা করিলেন। ইহাতে কমলাকান্ত

রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—'আমি যে অর্থ করিলাম ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় অর্থ সরস্বতীর ভাণ্ডারেও নাই।' তাঁহার এই কথায় চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। পরে সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ভারতের সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী ৺কাশীধামে সমবেত হইয়াছিলেন। কমলাকান্তের অর্থই সেই সভায় সর্ব্ব-বাদীসম্মত বলিয়া গৃহীত হইল - তাঁহার ন্যায়-শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান দেখিয়া সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার অজস্র সাধুবাদ করিয়াছিলেন। কমলাকান্তের ভবিষ্যৎ বাণীও অপর দিক্ দিয়া সফল হইয়াছিল - তাঁহার ছাত্র সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও নবদ্বীপ যাইয়া রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ন্যায়-শাস্ত্রের তর্কে পরাস্থ করিয়াছিলেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয় স্বীয় অধ্যাপককে এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা আর কমলা-কান্তের হস্তগত হয় নাই—উহা হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে দারুণ কাল স্বীয় কবলে কবলিত করিয়াছিল। এই সংবাদ জানিয়া যাইতে পারিলে না জানি তাঁহার কতই আনন্দের কারণ হইত।

তাঁহার অসংখ্য ছাত্রগণ মধ্যে এখানে কেবল মাত্র জন কয়েকের নামোল্লেখ করিলাম। চাঁদপ্রতাপ নিবাসী হরসুন্দর ভট্টাচার্য্য, ঈশ্বর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বড়), ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ছোট), রামকুমার ভট্টাচার্য্য, কোটালী পাড়ার কালীকুমার ভট্টাচার্য্য, সেরপুর (ময়মনসিংহ) হরনাথ চক্রবর্ত্তী, বিক্রমপুরস্থ কাশীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য চাচইরতলা, সারদা চরণ তর্কপঞ্চানন পয়সা গাঁ, মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য চুড়াইন, কালীচরণ ভট্টাচার্য্য বজ্রযোগিনী বর্ত্তমান অম্বিকা চরণ স্মৃতিরত্নের পিতা, কালীনাথ ভট্টাচার্য্য ইনি কমলাকান্ত সার্ব্বভৌমের অধ্যাপক কাশীশ্বর সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র, কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য পরাণীমণ্ডল, প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন, বজ্রযোগিনী, অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহেশ্বরদী নিবাসী। মহারাষ্ট্র দেশবাসী দুইজন ছাত্র ছিল। একজনের নাম শুকব্রহ্মণ আয়ার—অপরের নাম অজ্ঞাত। ইঁহারা স্বপাকে খাইতেন। আমাদের দেশীয় ব্রাহ্মণের হস্তের জলও স্পর্শ করিতেন না। স্নান করিয়া এক কলস জল নিয়া তাঁহারা রান্না ঘরে প্রবেশ করিতেন এবং আহারাদির পরে গৃহের দ্বার উন্মোচন করিতেন, ইঁহারা খুব নিষ্ঠাবান্ ছিলেন।

কমলাকান্ত পারিবারিক জীবনে সুখী হইয়া যাইতে পারেন নাই। ক্রমা-

বয়ে তাঁহার তিনটী স্ত্রী-বিয়োগ হয়। চতুর্থ বা শেষবারে তিনি সোণারগাঁর অন্তঃপাতী ঘোল্লাপাড়া গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া মাত্র ছয় মাস জীবিত ছিল। কমলাকান্তের মৃত্যুর সময় তাঁহার এই পত্নীর বয়স মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ ছিল। ইনি এক্ষণে প্রায় সপ্ততি বর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধা। সেকালের পণ্ডিতমণ্ডলীকে সময় সময় বার্ষিকী আদায় করিতে বিদেশে যাইয়া যে কিরূপ বিপদে পড়িতে হইত কমলাকান্তের জীবনের একটী দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকবর্গ তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। একবার বাখরগঞ্জ জেলা হইতে তাঁহার বার্ষিকী আদায় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে রাত্রি হওয়ায় তিনি কোন এক জমিদার বাড়ীতে শিষ্যসহ অতিথি হইলেন। উক্ত জমিদার বাড়ী দক্ষিণ সাহবাজপুর ছিল। জমিদারই যে স্বয়ং ডাকাত—একথা কমলাকান্ত কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কমলাকান্ত সশিষ্য এক গৃহে আশ্রয় লইলেন। পাক করিবার জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি জমিদার স্বয়ং মনোযোগী হইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে একটু লবণের কম পড়ায় একজন ছাত্র বাড়ীর ভিতর গমন করিলেন, তিনি বাড়ীর ভিতরে যাহা দেখিলেন তাহাতে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়া হতাশভাবে গুরুদেবের নিকট আসিয়া সমুদয় অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। কমলাকান্ত ভীত শিষ্যকে অভয় দিয়া স্বয়ং বাড়ীর ভিতর যাইয়া দেখিতে পাইলেন, একটী বৃহৎ গৃহ মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন ব্যক্তি বিবিধ অস্ত্রাদিতে শাণ দিতেছে আর গৃহকর্ত্তা নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাদের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। কমলাকান্ত এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও নির্ভীক চিত্তে গৃহস্বামীকে আহ্বান করিয়া বহির্বাটীতে আনয়ন করিলেন এবং বৈঠকখানা গৃহে বসিয়া তাঁহার সহিত ন্যায়-শাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের আলাপ করিতে লাগিলেন। কমলাকান্তের সুযুক্তিপূর্ণ সুললিত বাক্যচ্ছটায় গৃহস্বামী অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিলেন। কমলাকান্ত তাঁহাকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া ভবিষ্যতের জন্য এ সমুদয় দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। একদিনের শুভ উপদেশেই ঐ জমিদারের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল—ভবিষ্যতে তিনি উক্ত জমিদারের নিকট হইতে বার্ষিকী পাইতেন। পরদিবস প্রত্যুষে স্বদেশাভিমুখে রওয়ানা

হইবার সময় উক্ত জমিদার তাঁহাদিগকে এক প্রকার নিদর্শন দিয়া বলিয়া দিলেন যে ইহা দেখাইলে পথিমধ্যে আর কেহই আপনাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।

কমলাকান্ত শ্যামবর্ণ ও দীর্ঘাকার ছিলেন। তাঁহার শরীর একটু কৃশ ছিল। বেশভূষার প্রতি বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না। কোন সভাতে কিংবা কোন জমিদার বাড়ী যাইবার সময় সঙ্গে কেবল মাত্র একখানা নামাবলী লইতেন। তিনি বিশেষ সদালাপী ও বিনয়ী ছিলেন---এত বড় পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার কোনও অভিমান ছিল না—ছোট বড় সকলের সঙ্গে মিশিতেন—এমন কি মুসলমান চণ্ডালদের বাড়ী যাইয়া পর্য্যন্ত আলাপাদি করিতেন। তিনি বহু ন্যায় গ্রন্থের টীকা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সে সমুদয় গ্রন্থরাজি কে কোথায় লইয়া গিয়াছে তাহার কোনও খোঁজ নাই।

পূর্ব্বে কাঠাদিয়ার নাম ছিল কাষ্ঠ গ্রাম বা কাষ্ঠকাঠা, তিনিই উহাকে সর্ব্বত্র কাঠাদিয়া নামে রূপান্তরিত করেন। তদবধি উহা কাঠাদিয়া নামে রূপান্তরিত হইয়া আসিতেছে। প্রায় ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে আমাশয় রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যু

জ্ঞানী বলে 'মৃত্যু মুক্তি
বদ্ধজীবে করে শান্তি দান',
ভক্ত বলে 'মৃত্যু আনে
ভক্ত জনে অমৃত সন্ধান।'
শিব মৃত্যু অধিপতি
মঙ্গল যাঁহার খ্যাতি
মৃত্যুরে সৌন্দর্য্য-সুধা দেন চিরকাল—
সরাইয়া নিজ হস্তে কুহেলিকা জাল।
মৃত্যুতে মহত্ব লাভ
দেয় মৃতে দেবভাব—

স্বর্গে মর্ত্তে করে যোগ অনন্ত অক্ষয়,
আত্মার নির্ব্বাণ লাভ, মৃত্যু তুচ্ছ নয়।
মৃত্যু নহে রক্তচক্ষু কল্পনা ভীষণ
পরকালে মৃত্যু দেয় অনন্ত জীবন।

শ্রীমতী চারুবালা দেবী।

অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব

আজকাল স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন, এবং তাহার প্রচারের জন্যও কেহ কেহ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বস্তুতঃই ভাবিয়া দেখিতে গেলে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার, বিশেষরূপেই প্রার্থনীয়। শিক্ষাই জীবনের উন্নতির মূল; শিক্ষা ছাড়া হৃদয়ের বিকাশ বা মনে বল সঞ্চয় হইতে পারে না। সৎ শিক্ষা অথবা অসৎ শিক্ষাই মানুষকে দেবত্বে অথবা পশুত্বে উপনীত করিয়া থাকে। নারীগণ সমাজের অর্দ্ধেক অংশ স্বরূপ, তাঁহারা যদি উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত না হন তবে কিছুতেই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না।

সংসারে রমণীর প্রভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ গৃহেতে রমণীর প্রভাব অক্ষুণ্ণ। আর গৃহই মানবের আশ্রয় ও বিশ্রাম স্থল। গৃহিণীর কোমল সুন্দর হৃদয়ের সংস্পর্শে গৃহ শান্তি-নিকেতন স্বরূপ হয়,—কিন্তু আবার গৃহিণী যদি সুশিক্ষিতা না হন্, তাঁহার হৃদয় যদি জ্ঞানালোকিত ও নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত না হয়, তবে গৃহ কিছুতেই সুখময় হইতে পারে না। তাহা ছাড়া ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের উপরেও এই মাতৃজাতির প্রভাব সম্ভবতঃ পুরুষ অপেক্ষা অধিকই হইবে।

যাহা হউক স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু কিরূপে রমণীগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাই এখন ভাবিবার বিষয়, ইহা ঠিক যে যদিও আজ কাল খুব কম লোককেই স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধবাদী দেখা যায়, তবু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে রমণীগণ যথোপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতেছেন না।

ইহার কারণ মোটামুটি তিনটি। প্রথমতঃ বাল্য বিবাহ। যদি বিবাহের বয়স কিছু বাড়াইয়া দেওয়া যায়,—(ইহা এখন অনেকটা স্বতঃই হইতেছে) এবং বিবাহের পরেও রমণীগণের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত রাখার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হয়, তবে সুফল লাভ করিবাব সম্ভাবনা আছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রাচীনাগণ মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, 'ইহাতে গৃহকর্ম্মের ব্যাঘাত হয়, "কালী কলম" হাতে নিলে মেয়েরা আর "হাতা বেড়ীর" দিকে মনোযোগী হয় না। বিশেষতঃ মেয়েদের এত লেখা পড়া শিখিয়াই বা দরকার কি ? তাহারা তো আর চাকুরী করিবে না ?'

এই সব কথার যে উত্তর না আছে তাহা নয়, কিন্তু এখানে সে বিতর্ক না উঠানই ভাল। এইজন্য তাঁহারা দোষী নহেন,—শতাব্দীর পর শতাব্দী যে আলো তাঁহাদের নয়নে প্রতিভাত হয় নাই, আজীবন—আজীবন বলি কেন বংশ-পরম্পরা ক্রমে তাঁহারা যেরূপ ভাবে দিন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহাতেই তাঁহারা স্বকীয় সন্তুষ্টি, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অধিক কিছু বুঝিতে চাহেনও নাই বোঝেনও নাই। কিন্তু আশা করি শীঘ্রই তাঁহারা শিক্ষার উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন।

আমার মতে নানাবিধ শিল্প ও গৃহ কর্ম্মের উপযোগী জ্ঞান যাহাতে নারীগণ প্রাপ্ত হন তাহা করা উচিত, এবং রন্ধন বিদ্যাও অন্তঃপুরে শিক্ষার অঙ্গীভূত করিয়া নেওয়া উচিত। তাহা হইলে সম্ভবতঃ প্রাচীনাগণ শিক্ষার পক্ষপাতী হইতে পারেন—এবং ইহাতে অন্তঃপুরে শিক্ষা সহজে প্রসারিত হইতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। গৃহিণীর গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য অবশ্য পালনীয় ; আধুনিক রমণীগণ কখনই গৃহকর্ম্মকে তাচ্ছিল্য করেন না,—বরং

শিক্ষালাভ করিলে এই সব বিষয়ে তাঁহাদের অধিক উন্নত বুদ্ধির পরিচয়ই পাওয়া যাইবে এবং প্রাচীনাগণের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসও সহজেই তিরোহিত হইবে আশা করি।

তৃতীয়তঃ পুরুষ অভিভাবকগণ মেয়েদের শিক্ষা অপছন্দ না করিলেও সেজন্য নিজেরা কোনও চেষ্টা যত্ন করেন না, 'যদি কিছু শিখে তবে তো ভালই, না হয় নাই' তাঁহাদের মনোভাব এই প্রকার। অবশ্য সকলে এইরূপ নহেন, কেহ কেহ নারীগণের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণতঃ বঙ্গীয় পিতা পুত্রগণের শিক্ষার জন্য যেরূপ পরিশ্রম, যত্ন ও অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন তাহার দশ ভাগের একভাগও কন্যাগণের শিক্ষার জন্য দিতে কুণ্ঠিত হন। তাঁহারা হয়ত ইহা মনে করেন যে পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইয়া ভবিষ্যতে সহায় স্বরূপ হইবে, কিন্তু কন্যাদিগের দ্বারা সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সাহায্য পাওয়ার আশা নাই; অতএব এ বিষয়ে অর্থব্যয় করা বৃথা!

কিন্তু অর্থ লাভ করাই কি বিদ্যোপার্জ্জনের লক্ষ্য? জ্ঞানার্জ্জন কি আত্মার উন্নতির জন্য নহে? দুর্ভাগ্য বশতঃ অধুনাতন বঙ্গদেশে অর্থোপার্জ্জনই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত। যাহা হউক স্নেহপরায়ণ পিতার নিকটও কি স্বার্থই বলবৎ হইবে? কন্যা শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে পিতার কি তাহা গৌরব নহে? পুত্র শিক্ষিত হইলে পিতামাতা যে আনন্দ অনুভব করেন কন্যা শিক্ষিতা হইলেও তো তাঁহারা সেইরূপ আনন্দ অনুভব করিতে পারেন।

যখন সকলেই স্বকীয় অন্তঃপুর শিক্ষার বিমল আলোকে আলোকিত করিবার জন্য ব্যাকুল ও সচেষ্ট হইবেন, তখনই এই উদ্যম সফল হইবে।

স্ত্রী-শিক্ষার বহুল প্রচার মানসে প্রতি গ্রামে প্রতি পল্লীতে যথোপযুক্ত অনুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন। আজ কাল নারীগণের মধ্যেও শিক্ষা লাভ করিবার জন্য ও জীবনের উন্নতির জন্য একটা ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হয়। আমার বিশ্বাস 'অন্তঃপুর-শিক্ষা'র প্রসার বিষয়ে রমণীগণের নিজেদের শক্তি কিছু পরিমাণে নিয়োজিত হইলে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

ইঁহাদের নিজেদের মধ্যে ছোট খাট একটি সমিতি স্থাপিত করিয়া কোনও উপযুক্তা মহিলার নেতৃত্বে যদি পরস্পরের মধ্যে শিক্ষার বন্দোবস্ত

করিয়া লন্‌, এবং কোনও কোনও মহিলা যদি শিক্ষার তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা থাকেন, তাহা হইলে গ্রামস্থ কন্যা ও বধূগণের তাঁহার নিকট শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য লইতে এবং আলোচনা করিতে সুবিধা হইবে। আর সহৃদয় পুরুষবর্গ যদি সর্ব্বদাই অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা সহজেই প্রসারিত হইতে পারে।

উপরোক্ত প্রণালীতে রমণীগণের নিজেদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সুবিধা ছাড়াও আর একটা বিষয়ে উপকার হইবে। গৃহকর্ম্ম ভিন্নও অন্যান্য বিষয়ে নিজেদের যে কিছু করিবার শক্তি আছে, তাহা রমণীগণ বুঝিতে পারিবেন।

'আমরা মেয়ে মানুষ, আমরা কি করিব, কি করিবার সাধ্য আছে?' এইরূপ ভাব রমণীগণের হৃদয়ে প্রায়শঃই দেখা যায়। আত্ম-প্রত্যয় এবং আত্ম-নির্ভরতা ভিন্ন কেহই কিছু করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা যদি এইরূপ নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া নিজেদের মধ্যেই একটু একটু করিয়া কাজ করিতে থাকেন, তবে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য নানা বিষয়েও আপনাদের শক্তি প্রয়োগে সক্ষম হইবেন।

শিক্ষাপ্রাপ্ত উন্নতহৃদয়া বিদেশিনী মহিলাগণ, যেমন স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতা, শ্রীমতী আনিবেসান্ত প্রভৃতি, আমাদের দেশের জন্য কত করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু আমাদের স্বদেশীয়া মহিলাগণ নিজেদের জন্য কিছুই করিতে পারিতেছেন না, ইহা কি কম ক্ষোভের বিষয়?

নর ও নারীর কার্য্যক্ষেত্র ঠিক এক নহে এবং একের কাজও অপরের দ্বারা সুসম্পন্ন হয় না। পুরুষের শক্তি দেশে যে কাজ করিতেছে, তাহা অর্দ্ধেক অসম্পূর্ণ, এই জড় নারীশক্তি যখন কার্য্যক্ষম হইবে তখন ইহার দ্বিগুণ কাজ পাওয়া যাইবে,—এবং তখনই চেষ্টা উৎসাহ ও কার্য্যকরী শক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করিবে ইহা নিশ্চিত।

সমাজ তখনই উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবে, যখন সর্ব্ব বিষয়েই দেশের শক্তি নর-নারী উভয়ের শক্তিতে শক্তিমান্‌ হইবে, নচেৎ কিছুতেই কিছু হইবে না।

শ্রীমতী আশালতা সেন।

বিক্রমপুর—রঘুরামপুরের (কোবিশ্বর পল্লীর) পুস্করিণী খননে
প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তি।

Photo by N. Sen B. A.
Deputy Magistrate, Dacca.

Printed by K. V. Seyne & Bros

ইরিথ্রিয়ান সাগর

প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ আফ্রিকার উপকূল হইতে পূর্ব্বাঞ্চলের সমুদ্রের যতখানি জ্ঞাত ছিলেন, তাহাকে (Erythraean Sea) ইরিথ্রিয়ান সাগর নামে অভিহিত করিত। এইরূপ নামকরণের প্রধান কারণ এই যে গ্রীকগণ লোহিৎ সাগরের প্রণালীগুলিকে ইরিথ্রিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছিল এবং পারস্যোপসাগরকেও এই নামের অন্তর্ভুক্ত করিত। যখন মিসর রোমের অধীন ছিল, তখন মিসরের সহিত ভারতবর্ষ ও নিকটবর্ত্তী দেশ সমূহের যে বিশেষ বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ Periplus of the Erythrean Sea বা ইরিথ্রিয়ান সাগর প্রদক্ষিণ নামক পুস্তকে পাওয়া যায়।

গ্রন্থকার গ্রীসদেশীয় বণিক্ ছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মিসরের অন্তঃর্গত বেরিনিস বন্দরে বাস করিতেন। এই শেষোক্ত স্থল হইতেই তিনি সাময়িক বায়ুর সাহায্যে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলস্থ বন্দরাদিতে বাণিজ্যার্থ আগমন করিতেন। এই সকল দেশের বাণিজ্যাদি সংক্রান্ত বিষয় তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া অন্যান্য সওদাগরদিগের সুবিধার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকারের লিপি-কৌশল নাই বটে কিন্তু তিনি যে সকল সংবাদ আমাদের জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার পূর্ণতা, সত্যতা, এবং প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিলে আমাদের অন্য কোন রূপ ক্ষোভের কারণই থাকে না। বস্তুতঃ, এই পুস্তক পাঠে আমরা ভারতের তদানীন্তন বাণিজ্যের অতি পরিস্ফুট চিত্র পাই এবং ইহা বলিলে কোনরূপেই অত্যুক্তি হইবে না যে, এ পুস্তক না লিখিত হইলে আমাদের এই বিষয়ের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।

অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার যদিও কোন প্রকারেই নিজের নামোল্লেখ করেন নাই, তত্রাপি তিনি যে মিসরে বাস করিতেন ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পুস্তকের কয়েক স্থলেই এ বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং খুব সম্ভবতঃ তিনি মিসরের অন্তঃর্গত বেরিনিস নগরেই বাস করিতেন। বেরিনিস হইতেই তিনি প্রথম সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি নিজে সওদাগর ছিলেন এবং কেবলমাত্র অপ-

রের শোনা কথা সংগ্রহ না করিয়া তিনি নিজে স্বচক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই হিসাবে গ্রন্থের মূল্য আরও বেশী।

গ্রন্থকার ঠিক কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন আমরা সেই বিষয় পর্য্যালোচনা করিব। গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, তিনি রোমক সম্রাট অগষ্টসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ভূগোল লেখক টলেমী অপেক্ষা তিনি যে প্রাচীন ছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে টলেমী ভারতবর্ষের ভূগোল সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করিয়াছেন ইনি তাহা করেন নাই এবং টলেমীর সময় রোমকগণ ভারতবর্ষের ভূগোল সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এই অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের সময় তাঁহারা ততদুর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

পেরিপ্লাস গ্রন্থকার লঙ্কার নাম পালেসিমোয়াণ্ডান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—টলেমী লঙ্কার নাম সালিকি বলিয়াছেন। শেষোক্ত নামই পরে প্রচলিত হইয়াছিল এবং আমাদের গ্রন্থকার প্রথমোক্ত নাম উল্লেখ করাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, প্লিনি কিংবা তাঁহার সময়ে ঐ নাম প্রচলিত ছিল না। গ্রন্থকার যে প্লিনির পরে লিখিয়াছেন তাহারও প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্লিনি তাঁহার পুস্তকে হিপোলাস কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সাময়িক বায়ুর উল্লেখ করে বলিয়াছেন যে "ইহার সঠিক বৃত্তান্ত জনসমাজে এই প্রথম প্রচারিত হইল।" কিন্তু, পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার যে সময় তাঁহার পুস্তক রচনা করেন তখন ঐপথ বহুপূর্ব্বে যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। প্লিনি ৭৯ খ্রীঃ অঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে পুস্তক রচনা শেষ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই ৭৯ খ্রীঃ অঃ পরে যে সময়েই হউক না কেন—এই পেরিপ্লাস লিখিত হয়। পুস্তকের অন্য একস্থলে আবিসিনিয়া দেশের রাজা জলকালিসেরর উল্লেখ আছে। এই নরপতি ৭৭ হইতে ৮৯ খৃষ্টাব্দ রাজত্ব করেন। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে অনুমান করিয়া লইতে পারি যে এই পুস্তক প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে লিখিত হইয়াছিল।

পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার কয়েকটী সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার

মধ্যে যে কয়েকটী ভারতবর্ষ সংক্রান্ত আমরা তাহার বিষয়ই আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন যে আরব পৌছিবার দুইটী পথ আছে। প্রথম মাইয়স হার্ম্মস হইতে নিউকোকোমী হইয়া আরব দেশান্তর্গত বন্দর মৌজায় পৌছিতে হয়। দ্বিতীয় বেরিনিস বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িয়া বরাবর মৌজায় পৌছান যায়। অন্য আর একটীতে তিনি বর্ত্তমান রাসেলহেড হইতে আরবের পূর্ব্ব উপকূল দিয়া পারস্যোপসাগর হইয়া আপলোগস (বর্ত্তমান আবাল) পৌছানের কথা বলিয়াছেন। গ্রন্থকার ভারতবর্ষ পৌছিবার তিনটী পথ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমটী আরব, কারমেনিয়া এবং গেড্রোসিয়া হইয়া বরুগজ (বরোচ) পৌছান। বরোচ তখন একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। দ্বিতীয়টী কানে বন্দর হইতে। এবং তৃতীয়টি গুয়ার্ঙ্গফো বন্দর হইতে। শেষোক্ত দুটী পথই সমুদ্রবক্ষ ভেদ করিয়া মৌজিরিস এবং নেলকুন্দ পৌছিতে হইত। এই একটী পথের বর্ণনাকালে তিনি বলিয়াছেন যে এই পথ দিয়া ভারতবাসীরা আরবে পৌছিত এবং আরবীয়েরা ভারতে আসিত। অন্যটিতে হিপোলাস কর্ত্তৃক সাময়িক বায়ুর আবিষ্কারের পূর্ব্বে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল হইতে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে পৌছানের পথের বর্ণনা আছে। ভারতবর্ষ হইতে তখন আফ্রিকায় চাউল, ঘৃত, তিল, তৈল, চিনি, কার্পাস, মসলিন এবং রঙ্গীন কাচ রপ্তানি হইত।

অতঃপর আমরা পেরিপ্লাসে উল্লিখিত বাণিজ্যার্থ যে সকল দ্রব্যাদি আমদানী ও রপ্তানি হইত তাহার একটি তালিকা দিব।

পেরিপ্লাস লিখিয়াছেন যে রাজার জন্য সুন্দরী বালিকাগণকে বরোচে আমদানী করা হইত এবং আরব ও ভারতের ক্রীতদাসীগণকে জয়সকরাই-ডিসের দ্বীপে প্রেরণ করা হইত। এতদ্ব্যতীত অশ্ব ও অশ্বতর, কাণী ও মৌজা বন্দরে আমদানী হইত। পশুজাত দ্রব্যের সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে ঘৃত এবং হস্তীদন্ত বরোচ হইতে বারবারী দেশে রপ্তানী হইত। বরোচ হইতে চীনের কার্পাস, শৃঙ্গ, প্রবাল, লাক্ষা, মুক্তা, রেশম-সূত্র, শুক্তি, রং, গণ্ডারের খড়্গ, কচ্ছপ ও রপ্তানী হইত। অগরু এবং অন্যান্য গন্ধ দ্রব্য, হিঙ্গু, বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড, আবলুসকাষ্ঠ, তিলতৈল, নীল, মসলিন, নানা

প্রকার মসলা, জাফরণ, পান, মধু, মস্ত, লঙ্কা, গম, চিনি, খইয়ের উল্লেখ ও এই পুস্তকে পাওয়া যায়। রৌপ্য পাত্র, আর্সেনিক, রৌপ্য ও সুবর্ণ মুদ্রা, সীসা, পিত্তল মিসর হইতে রপ্তানী হইত এবং টীন, লৌহ, তরবারী ভারতবর্ষ হইতে দেশান্তরে প্রেরিত হইত পেরিপ্লাস নানারূপ মূল্যবান্ প্রস্তরাদির এবং নানাপ্রকার বস্ত্রের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

পেরিপ্লাসে বর্ণিত আখ্যান হইতে আমরা ভারতের সম্বন্ধে যে কিছু কথা আছে তাহার সার সংগ্রহ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। বর্তমান ওগুর দেশের বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে উহা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। আবিরিয়া এবং সুরাষ্টীন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে এখানে প্রচুর পরিমাণে শস্য, চাউল, তিলতৈল, মাখন, মসলিন এবং ভারতীয় কার্পাসে প্রস্তুত মোটাবস্ত্র পাওয়া যাইত। রাজধানী মিন নগর হইতে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র বরোচে প্রেরিত হইত। ভারতবর্ষে অনেক নদী আছে এই সকল নদ নদী দ্বারা পণ্য দ্রব্য প্রেরিত হয়।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বরোচে আমদানী হয়—ইটালি দেশীয় মস্ত, পিত্তল, তামা, টীন এবং সীসা, প্রবাল, নানাপ্রকার বস্ত্র, ধুনা, সাদা কাচ, গঁদ, সুর্ম্মা, স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা, গন্ধদ্রব্য। হস্তিদন্ত, গন্ধদ্রব্য, চীনামাটী (Porcelain) কার্পাস, রেশম, রঙ্গীন সুত্র, রেশমের সূত্র, এবং লঙ্কা বরোচ হইতে রপ্তানী হয়। সাধারণতঃ জুলাই মাসে জাহাজ মিসর পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্যার্থ ভারত যাত্রা করে।

নেলকুন্দা নামক বন্দরে মুদ্রা, প্রস্তরাদি, বস্ত্র, সুর্ম্মা, টিন, সীসা, মস্ত, সিন্দুর, আর্সেনিক আমদানী হয়। এবং এই বন্দর হইতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি রপ্তানী হয়—লঙ্কা (প্রচুর পরিমাণে), হস্তিদন্ত, জটা মাংস (একপ্রকার লতা), পান, মূল্যবান প্রস্তরাদি এবং কচ্ছপ।

পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার কয়েক প্রকার সমুদ্রগামী তরীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই পুস্তকেই আমরা জানিতে পারি যে তখন সঙ্গর ও কোলান্দী ও পগু নামক দুইপ্রকার তরী পণ্য দ্রব্য বহনে ব্যবহৃত হইত। পেরিপ্লাস আজানীয়ায় প্রচুর পরিমাণে মুক্তা, মূল্যবান প্রস্তরাদি ও মসলিন এবং মাসালিয়ার উৎকৃষ্ট মসলিন যে পাওয়া যাইত তাহার উল্লেখ

করিয়াছেন। গঙ্গায় যে তখন অনেক তরী পান, মসলা, মুক্তা, অত্যুৎকৃষ্ট মসলিন এবং অন্যান্য পণ্যাদি বহন করিত, তাহার বিষয়ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার অবশেষে থিনাইয়ের কথা উল্লেখ করিবার সময় বলিয়াছেন যে, এখানে প্রচুর পরিমাণ রেশম এবং পশমী বস্ত্রও পাওয়া যায়।

পেরিপ্লাসে বর্ণিত দ্রব্যাদির মধ্যে কতকগুলি এখন আমাদের দেশে পাওয়া যায়, তাহা একবার দেখা কর্ত্তব্য নহে কি? প্রাচীন ভারতীয়গণকে আমরা অসভ্য, বর্ব্বর বলিয়াই জানি এবং বলি একবার তুলাদণ্ড ব্যবহার করিতে দোষ আছে কি? *

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
পাটনা

বিক্রমপুর

মা তোর মু'খানি মনে প'ড়ে আজি ভরিয়া উঠিছে আমার বুক;
আমি যে তোরি গো তনয়, জননি, ভেবেও উথলে স্বরগ সুখ।
আমার শৈশব বাল্য কাটিল যাহার উরসে অতি মধুর,
তুই মা আমার সেই স্নেহময়ী, তুই সে আমার বিক্রমপুর।
সুখের দুঃখের অতীতের স্মৃতি, তোরি সনে মাগো জড়িত যত;
তোরি মাঠে মাগো উড়ায়েছি ঘুড়ি, তোরি খালে মাছ ধরেছি কত।
তোরি বিলে মাগো ভাসায়ে তরণী দিয়েছি উঠায়ে কণ্ঠস্বর,
তুই মা আমার সেই স্নেহময়ী, তুই সে আমার বিক্রমপুর।
কোথায় এমন ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মীদেবীর আঁচল দোলে?
কোথায় তমাল বেণুর কুঞ্জে বিহগ এমন মধুর বোলে?
গোলাপজামে ডেফল কাউ এ কাহার বাগান হেন ভরপুর?

---

* "প্রাচীন ভারত" শীর্ষক গ্রন্থাবলীতে লেখক পেরিপ্লাসের আমূল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'পেরিপ্লাস' শীঘ্রই যন্ত্রস্থ হইবে।   সম্পাদক।

তুই মা আমার সেই স্নেহময়ী, তুই সে আমার বিক্রমপুর।
কোথায় বরষ বরষ পরে বরষা এমন ঘনিয়ে আসে ?
কোথায় এমন মোহন লীলায় ঘর বাড়ী সব সলিলে ভাসে ?
বিলের বিশাল বক্ষ ছাইয়া সাপ্‌লা কোথায় হাসিয়া চুর ?
তুই সে আমার স্নেহময়ী মাতা তুই সে আমার বিক্রমপুর।
অতীত যুগ হইতে কে মা জ্ঞান গরিমায় সবার উপর ?
শীলভদ্র ঘোষে নাম কার দূর হতে আরো দূরান্তর ?
কার দীপঙ্কর তীব্বতবাসী মোহ অন্ধতা করিল দূর ?
তোরি সন্তান তাহারা জননী, তুই সে আমার বিক্রমপুর।
গৌরব শতলীলার আগার রামপাল কার কণ্ঠহার ?
ভৌমিক কেদার জলদ-মন্দ্রে স্বাধীনতা বাণী ঘোষিল কার ?
কাহার বক্ষে বল্লাল-রমণী করিল আত্ম-বিসর্জ্জন ?
কাহার কন্যা বীর অঙ্গনা সোণামণি করে ভীষণ রণ ?
বিশাল পদ্মা ধবলেশ্বরী কাহার চরণ চুম্বিয়া ধায় ?
শ্রীধাম শ্রীপুর একুশরত্ন, উঠেছিল ফুটি কাহার গায় ?
কাহার কুঞ্জে আনন্দময়ী গেয়েছিল গান, মধুর সুর ?
তুই মা আমার সেই স্নেহময়ী, তুই সে আমার বিক্রমপুর।
কাহার বুকের সুধাধারা পানে শ্রীশ্যামাকান্ত সাহসী সুর,
হাসিতে হাসিতে ভীষণ সিংহ ব্যাঘ্র দর্প করিল চুর ?
কার তরে দ্বিজ রাসবিহারী খাটিয়া শরীর করিল ক্ষয় ?
তোমারি বুকের তাঁহারা জননি, তাঁহারা জননি তোরি তনয়।
মুছে ফেল মাগো আনন কালিমা মুছে ফেল মাগো অশ্রুজল ;
শত সন্তান, জগদীশ আদি, তুলিছে ললাট করে উজল।
ক্ষুদ্র মোরাও দিব প্রাণ মাগো তোমার দৈন্য করিতে দূর।
তুই মা মোদের স্নেহময়ী মাতা, তুই মা মোদের বিক্রমপুর।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত উপকথা

কাঞ্চনমালা

এক মস্ত বড় সওদাগর। সওদাগরের দুই স্ত্রী। প্রথমার নাম রতনমালা আর দ্বিতীয়ার নাম কাঞ্চনমালা। রতনমালার কোন ছেলে মেয়ে নাই। কাঞ্চনমালার এক পুত্র ও এক কন্যা—নাম নারায়ণ ও কমলা। রতনমালার গর্ভে কোন ছেলে মেয়ে না হওয়ায় সওদাগর বৃদ্ধ বয়সে কাঞ্চনমালাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র ও কন্যা লাভ করিয়া সওদাগর হাতে স্বর্গ পাইলেন। দিন রাত কাঞ্চনমালার পুত্র ও কন্যা নিয়া আনন্দে দিন কাটান। রতনমালার কিন্তু সতীনের ছেলে মেয়ের প্রতি সওদাগরের এত আদর যত্ন বড় ভাল লাগিত না। তবু উপায় কি? সওদাগরের ভয়ে ভয়ে সতীনও তাহার পুত্র কন্যাগণকে কিছু বলিতে পারিতেন না। নারায়ণ কমলা কিন্তু নিজ মায়ের চেয়েও বড়মাকে বেশী ভালবাসিত।

কিছুদিন পরে সওদাগর বাণিজ্যে গেলেন। বাণিজ্যে যাইবার সময় উভয় স্ত্রীকে ছেলে মেয়ে দু'টীকে লইয়া মিলিয়া মিশিয়া শান্তি-সুখে থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া গেলেন। সওদাগর বাড়ী হইতে যাওয়ার পর হইতেই রতনমালার আধিপত্য বাড়িল। কাঞ্চনমালা—নিজের ছেলে মেয়ে দু'টীকে লইয়া অতি সতর্কে দিন কাটান। তার বাপের বাড়ীর বুড়ী দাসী ও কাজ কর্ম্মে সকল বিষয়েই তাহার খুব সাহায্য করে। মানুষ হাজার সাবধান থাকিলে কি হয়? দুষ্ট লোকের—কূট-চক্র ভেদ করা বড় সহজ কথা নয়। একদিন দুই সতীনে মিলিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। দুষ্টা রতনমালা একখানা শিকর কাঞ্চনমালার চুল ধুইয়া দিবার ছল করিয়া যেমনি চুলের গোড়ায় বাঁধিয়া দিল—অমনি সে একটা কচ্ছপের আকার ধারণ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। রতনমালা কৃত্রিম ভাবে নানা ছাঁদে কাঁদিয়া বাড়ী ফিরিল। সওদাগর বিদেশে, তিনি এ ঘটনার কিছুই জানেন না। কাঞ্চনমালার দাসী প্রমাদ গণিল। কিন্তু মনের ভাব গোপন রাখিয়া সে নারায়ণ ও কমলাকে সহ গঙ্গার তীরে একখানা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল। রাত্রি গভীর হইলে সে নদীর তীরে আসিয়া বলিত,—

"ওঠ, ওঠ, কাঞ্চনমালা
দুধ দাও তোমার নারায়ণ কমলা।
আসিবেন সওদাগর
বাঁধিবেন রতনমালা
রাজ্য ভোগ কর্‌বে তোমার নারায়ণ কমলা ॥"

বুড়ীর ডাকে একটা মস্ত বড় কাছিম জল হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া কুটীরে প্রবেশ করিত এবং কয়েকটা ডিম পাড়িয়া পুনরায় নদীর গভীর জলে ডুবিয়া যাইত।

এইরূপে এক বছর যায়। সওদাগর বাড়ী ফিরিবার পথে ঐ কুটীরের পাশ দিয়া নৌকায় করিয়া চলিয়াছেন। অমাবস্যার ভীষণ অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না—সওদাগরের নৌকা সেই কুটীরের ঘাটেই আসিয়া লাগিল। সওদাগর কুটীরের ভিতর আলোক দেখিয়া চাকরকে বলিলেন—'ঐ যে লোকের বসতি দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে আগুণ নিয়ে এসে রান্নার যোগাড় কর।' চাকর কুটীর দ্বারে আসিয়া দেখে যে একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক 'ওঠ ওঠ কাঞ্চনমালা' বলিয়া ডাকা মাত্র মস্ত বড় একটা কাছিম জল হইতে উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ডিম পাড়িয়া চলিয়া গেল। চাকর এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি যাইয়া তাহার প্রভুর নিকট সব কথা খুলিয়া বলিল। ইহাও বলিল যে সে ঘরে আপনার পুত্র কন্যা ও ছোট কর্ত্রীমার দাসীকেও দেখিলাম। চাকরের মুখে এ কথা শুনিয়া সওদাগর দ্রুতপদে সে কুটীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দাসী ঐরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে সওদাগরকে সেখানে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পুত্র ও কন্যা পিতাকে দেখিয়া তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সওদাগর দাসীর মুখে সব কথা শুনিয়া পুনরায় কাঞ্চনমালাকে ডাকিতে বলিলেন। দাসী যেমনি ডাকিল,—

'ওঠ ওঠ কাঞ্চনমালা
দুধ দাও তোমার নারায়ণ কমলা।
এসেছেন সওদাগর বাঁধিবেন রতনমালা,
রাজ্যভোগ কর্‌বেন তোমার নারায়ণ কমলা ॥'

অমনি কচ্ছপরূপী কাঞ্চনমালা আবার সেই কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সওদাগর কচ্ছপটীকে ধরিয়া যেমন মাথায় হাত দিয়া আদর করিবেন অমনি একটা শক্ত বস্তু হাতে লাগিল। উহা কি দেখিবার জন্য আলোর নিকট যাইয়া দেখিলেন যে একটা শিকড়,—সওদাগর তাড়াতাড়ি ছুড়ি দিয়া যেমন শিকড়টাকে কাটিয়া ফেলিলেন অমনি কাঞ্চনমালা পুনরায় মনুষ্য দেহ ধারণ করিলেন। সওদাগর পরম সন্তুষ্ট মনে পুত্র কন্যা ও স্ত্রীসহ নৌকায় গেলেন এবং পর দিবস খুব ভোরে যাইয়া বাড়ীর ঘাটে পঁহুছিলেন। চাকর বাড়ীতে যাইয়া বলিল—যে কর্ত্তার আদেশ তাঁহার দুই স্ত্রী পুত্রকন্যাসহ নদীর ঘাটে যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবেন।

রতনমালার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এখন উপায়? রতনমালার দাসী বলিল—"ভয় কি? আমি তোমাকে নিয়ে নৌকায় যাচ্ছি। তুমি সওদাগরকে বল্‌বে যে কাঞ্চনমালা নদীতে স্নান কর্‌তে যেয়ে জলে ডুবে মারা গিয়েছে। কত খুঁজেছি কোথাও তার সন্ধান পাই নাই। দাসী বেটীকে কত বোঝালেম ছেলে মেয়ে দু'টীকে কত আদর যত্ন কল্লেম কিন্তু দাসী তাদের নিয়ে কোথায় যে চলে গেল আমি কোন খোঁজই পাচ্ছিনে। সে অবধি বড়ই মনের কষ্টে দিন কাটাচ্ছি।" দাসীর কথা মতই কাজ হইল। রতনমালা নৌকায় উঠিয়া কাঁদিয়া পড়া মাত্রই কাঞ্চনমালা পুত্রকন্যাসহ বাহিরে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। রতনমালা ও তাহার দাসীর মুখ একেবারে শুকাইয়া গেল। প্রাণের ভয়ে উভয়ে সওদাগরের পায়ে লোটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা চাহিল। কাঞ্চনমালার অনুরোধে সওদাগর উহাদিগকে প্রাণে না মারিয়া বনবাস দিলেন—আর সুশীলা পত্নী কাঞ্চনমালা ও পুত্র কন্যা নারায়ণ কমলাকে লইয়া মনের সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।*

গ্রন্থ-সমালোচনা।

পথের কথা—শ্রীফকির চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত

---

* বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত এই শ্রেণীর উপকথা যদি বিক্রমপুরবাসিনী মহিলাগণ লিখিয়া পাঠান তাহা হইলে আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিব। সম্পাদক।

১০৪ পৃষ্ঠা, লিম্প বাইণ্ডিং মূল্য দশ আনা। এখানা একখানা ভ্রমণকাহিনী। দেওঘর ও তপোবন, এটোয়া, কাল্‌কা পথে, বালেশ্বরে আট দিন, খুরদা, চক্রধরপুর এছয়টী স্থানের বিবরণ লইয়াই এ গ্রন্থখানা রচিত। ফকির বাবু সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। এ বহিখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি, ভাষার বেশ একটী স্বচ্ছন্দ গতি আছে, স্থানে স্থানে বর্ণনা অতি মনোহর। জলধর বাবুর ভূমিকা পাঠে কিন্তু নিরাশ হইয়াছি। তাঁহার নিকট হইতে আমরা একটী সুন্দর সারগর্ভ ভূমিকার আশা করিয়াছিলাম তৎপরিবর্ত্তে 'এখন কাগজ কলম লইয়া বসিয়াছি, কিন্তু কি লিখিব ভাবিয়া পাইতেছি না' পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। ফকির বাবু নিবেদনে লিখিয়াছেন 'আমার আত্মীয় ও সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ, মহাশয় 'পথের কথা'র আগাগোড়া প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন সেজন্য চিরকৃতজ্ঞ।' সুবোধবাবু এরূপ সতর্কতার সহিত প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন যে প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় পংক্তিতেই ইস্কুল না হইয়া ইস্কুল হইয়াছে! ফকিরবাবু দেখিতে জানেন ও দেখাইতে জানেন—তাই কোন স্থানই তেমন উল্লেখযোগ্য না হইলেও বর্ণনা চাতুর্য্য সবকয়টিই অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাল্‌কাপথেই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর লাগিল।

পঞ্চবটীতত্ত্ব—স্বর্গীয় মুন্সী কাশীনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবগলামোহন দাশগুপ্ত নোয়াখালী। ডিমাই ১২ পেইজী ৫০ পৃষ্ঠা মূল্য ।৵০। ইহাতে পঞ্চবটী মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়া আত্মার অবিনশ্বরত্ব পুনর্জ্জন্ম, ভক্তি ও বিশ্বাস ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের নিকট যে এগ্রন্থ বিশেষ আদৃত হইবে তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ভাষা সেকেলে হইলেও দিব্য সরল ও সরস এক নিঃশ্বাসে পাঠ সমাপ্ত করা যায়। বগলাবাবু তদীয় স্বর্গগত দেশহিতৈষী পিতৃদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থের উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

কুহকিনী—শ্রীযতীন্দ্র নাথ সমাদ্দার বি, এ, এম, আর, এ, এস প্রণীত। লেখক বঙ্গ সাহিত্যে স্বাধীন প্রেমের কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের ভাষা বেশ মিষ্ট ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ। যতীন্দ্রবাবু শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার রচনা শক্তি অন্য দিকে ধাবিত হইলেই আমরা অধিকতর সুখী হইব। কারণ বাঙ্গলা দেশের চৌদ্দ আনা গ্রন্থই—তথা কথিত 'প্রেম' লইয়া, স্কুল কলেজের তরুণ যুবক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রৌঢ় ব্যক্তি পর্য্যন্তও প্রেমের নাকি সুরেই ঝঙ্কার তোলেন। এমন কিছু রচনা করুন যাহাতে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয় অথচ মানুষ—প্রকৃত মানুষ হইতে শিখে। যতীনবাবুর লিখিবার শক্তি আছে, তাই তাঁহাকে বলি যে তিনি এদেশের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কাব্য এই সকল লইয়া আলোচনা করুন। আমাদের দেশে Free love প্রচার করিবার কোন প্রয়োজন আছে কি? আমরা একেবারেই অলস আরও অলস করিবার জন্য চাঁদের জ্যোছনা, কোকিলের কুহু মলয় বাতাসের আমদানী রহিত করাই ভাল।

চন্দ্রধর (কাব্য)—শ্রীবিপিন বিহারী নন্দী প্রণীত। বঙ্গ-গৃহের চিরপরিচিত চাঁদসওদাগরের করুণ কোমল কাহিনী লইয়া গ্রন্থকার অতি সুন্দর ভাষায় এ কাব্যখানা রচনা করিয়াছেন। বিপিনবাবু পূর্ব্ববঙ্গের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুকবি। আইনের শুষ্ক তর্ক ও জটিল তত্ত্বের মধ্য দিয়াও তাঁহার কাব্যরস ফুটিয়া আসিতেছে। কাব্যখানা অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত, অথচ অনুকরণদুষ্ট নহে। চন্দ্রধরের তেজস্বিতা, ভক্তি ও বীরত্ব কাব্যের প্রতি ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। এই মনুষ্যত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ দেবতা হইয়া উঠে। চন্দ্রধরও স্বীয় অমানুষিক তেজ-বীর্য্য প্রভাবেই দেবত্বের পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। বেহুলা বা বিপুলার দেবী-চরিত্র, সনকার করুণ-শোক-গাঁথা পড়িতে পড়িতে নয়ন যুগল অশ্রু-সিক্ত হয়। গ্রন্থখানা দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। শব্দ-সম্পদে বর্ণনা-মাধুর্য্যে পাঠকের এ কাব্যখানা পাঠ করিতে বিন্দুমাত্রও ক্লেশ বোধ হয় না—চিত্ত আনন্দে ও বিস্ময়ে পরিপূরিত হইয়া উঠে। আমাদের উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই—নচেৎ আমরা যদৃচ্ছা ক্রমে এ কাব্য হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতাম। গ্রন্থকার কর্তৃক পটিয়া, চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ভগীরথ—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। ছেলেদের চণ্ডী, শাক্যসিংহ, সর্ব্বানন্দ, ধ্রুব ইত্যাদি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়াছেন। ভগীরথও তাঁহার শিশুপাঠ্য গ্রন্থ শ্রেণীর অন্যতম। ভগীরথের অপূর্ব্ব নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের কথা অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কৃত্তিবাস হইতে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন কাহিনী তুলিয়া দিয়া গ্রন্থকার ভালই করিয়াছেন। শৈশব হইতেই আমাদের প্রাচীন কবিগণের কাব্যাদির সহিত শিশু পাঠকগণের পরিচিত হওয়া উচিত। ছবি—ছাপা বাঁধাই অতি পরিপাটি, মূল্যও গ্রন্থের সৌন্দর্য্যের তুলনায় সামান্য। ভূমিকা লেখক হীরেনবাবুর কথায় আমরাও বলি, 'অতুলবাবু ভগীরথের পুণ্য কথা সহজ ভাষায় মনোজ্ঞ আকারে শিশুদের নিকট উপস্থিত করিয়া শুধু শিশুদের কেন সকলেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।' ছেলেদের খেলনার পরিবর্ত্তে এইরূপ সুন্দর ও সুলিখিত গ্রন্থই খেলনার স্বরূপ দেওয়া উচিত।

* * * *

আমরা অত্যল্প সময়ের মধ্যেই বহু গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি এজন্য গ্রন্থকারগণকে ধন্যবাদ দিতেছি। আগামী সংখ্যায় আরও কতকগুলি বহির সমালোচনা প্রকাশ করিব।

নববর্ষে

দেখিতে দেখিতে বিলাইয়া গেল
একটী বছর জলবিম্ব-প্রায়।
শূন্য পিঠে বহি আসিল বিংশতি
Regular যেন সেনা সমবায় ॥
কত যে ভাবিনু বছর ভরিয়া
কত যে ভাঙ্গিনু গড়িনু কত।
কত যে বাসনা ছিল গো হিয়ায়
কত এল গেল স্রোতের মত ॥
পরমাণু গেল, তাদের সহ
সেও সদা তার ভাইটী যেন।
সাথে সাথে যায় ফিরে নাহি চায়
ডাকিলে কেয়ে না বধির হেন ॥
তোমার গিয়াছে, আমার (ও) যে গেল
উহারও গিয়াছে তাহার (ও) তাই।
সকলের দশা একই প্রকার
পরমাণু পথে প্রভেদ নাই ॥
কিন্তু জীবনেতে, দেখ গো চাহিয়া
কতই প্রভেদ তুমি ও আমি।
ধর্ম্মপথে তুমি কত অগ্রসর
কত পাছে পড়ে রয়েছি আমি ॥
কর্ম্মপথে তুমি, বীরের মতন
সত্য অসিকরে সেনানী যথা।
শত্রু তাড়াইয়া আছ তার স্থানে
আমি হতভাগা বসেছি হেথা ॥
বরষ Diary, দেখিনু খুলিয়া
প্রতি পাতা তায় কলুষ মাখা।
পাপ কল্পনায় পাপ অনুষ্ঠান
ভীষণ পাপের আলেখ্য আঁকা ॥
তুমি ধর্ম্মবীর, বল দেখি ভাই
কিসে পাপ তাপ ঘুচিবে মোর।
(কিসে) ধর্ম্মের আলোক, হৃদয়ে পশিয়ে
পাপ নিশা মম করিবে ভোর ॥

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অজন্তার বহির্দ্দেশ।
অধ্যাপক সমাদ্দারের 'সমসাময়িক ভারত' হইতে।

বিক্রমপুর

প্রথম বর্ষ	শ্রাবণ ; ১৩২০	২য় সংখ্যা

আহ্বান

আজ্‌কে আমার ডাক পড়েছে
সবার শেষে ;
স্বপ্নলোকের দেয়াল ঘেরা
আলোছায়ার সেই দেশে।—
যা'র গগনের মেঘের কোলে
রক্তরেখার দীপ্তি জ্বলে,
মর্ম্মব্যথা বাতাসে যা'র
বেড়ায় ভেসে,—
আজ্‌কে আমার ডাক পড়েছে
আলোছায়ার সেই দেশে।
মর্ম্মে আজি বেড়ায় বাজি'
কাহার বাণী ?
লক্ষ যুগের অশ্রুঝরা
কাঁদে সে কা'র প্রাণখানি ?
ওরে আজি মুক্ত বাঁধে
কাঁদে যে মোর পরাণ কাঁদে !

বাহুর পাশে লয় সে আমার
হৃদয় টানি'!
মর্ম্মে আজি বেড়ায় বাজি'
অশ্রুঝরা কার বাণী?
ওগো আমার কাঙ্গালিনী,
সকলহারা!
বক্ষে জাগে কোন কথা সে?
—গণ্ড বহি' বয় ধারা।
কোন্ স্মৃতি সে স্বর্গমায়া
নিত্য সেথা আছে ঢাকা?
কাঙ্গালিনীর বিভব কিসে
রতনপারা?
স্বপ্নসম কোন্ কথা সে
নিত্য জাগে বাক্‌হারা?
আজ্‌কে আমার ডাক পড়েছে
সবার শেষে,
গন্ধে গানে চিত্তহরা
স্বপ্নলোকের সেই দেশে।
ওগো আজি সবার আগে
ভুলে-যাওয়া মূর্ত্তি জাগে,
মন ভোলানো, প্রাণ কাঁদানো
মলিন বেশে।—
আজ্‌কে আমার ডাক পড়েছে
দূর জগতের সেই দেশে।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতা

আমাদের সমাজে অবরোধ-প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহা ভাল কি মন্দ সে আলোচনার প্রয়োজন এখানে নাই; এবং যাহারা স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তাহাদের শিক্ষার আলোচনাও আজ প্রয়োজনীয় নহে।

আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় অন্তঃপুরবাসিনী নারীগণ কি প্রকারে শিক্ষালাভ করিতে পারেন। সর্ব্বদা বদ্ধগৃহে বাস করিলে মনও সঙ্কীর্ণ হয়। রুগ্ন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের নিমিত্ত এবং মানুষের জীবনধারণের জন্য যেমন বাহিরের মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুর একান্ত প্রয়োজন, তেমনি মানবের হৃদয়বৃত্তির উন্মেষের জন্য, মন সজীব উন্নত রাখিবার জন্য বাহিরের জ্ঞান আলো বাতাস চাই। তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া আমরা কখনই জ্ঞান লাভ করিতে পারিব না; আমাদের মন উন্নত হইবে না। সেই উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, যাহাতে মহিলাগণ বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন এবং শিক্ষালাভে আগ্রহান্বিতা হন।

বাহিরে যে নিত্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইতেছে, কত পুরুষ ও মহিলাগণ জ্ঞান-ধর্ম্মে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া কি অমৃত আনন্দের অধিকারী হইতেছেন; আর এই নিখিল বিশ্বের উৎসব হইতে আমরাই শুধু বঞ্চিত; আমাদের জ্ঞানের অভাবে। কিন্তু আমরাও মানুষ, কোন অংশে অবহেলার পাত্র নহি; আমরাও ইচ্ছা করিলে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হইতে পারি, জগতের একজন হইয়া মানুষের মত দাঁড়াইতে পারি। কিন্তু জীবনের কত বড় সরসতা হইতে আমরা স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়া আছি। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন, এই সংস্কার আমাদের সমাজে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই কুসংস্কার দূর করিতে হইবে; এবং পুত্রের ন্যায় কন্যার শিক্ষার জন্যও যত্নশীল হইতে হইবে।

যে মহিলা যে পরিমাণে শিক্ষিতা তিনি সেই পরিমাণে প্রতিবেশিনীকে অন্ততঃ আত্মীয়াকে শিখাইতে পারেন। কিন্তু আমাদের অন্তঃপুর খুঁজিলে প্রায়শঃ এমন একটিও মহিলা পাওয়া দুর্ল্লভ। তাঁহারা অপরকে শিখাইবেন কি? নিজেরাই শিক্ষালাভে উদাসীনা। সজীব বৃক্ষেই পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে; ফলেই বৃক্ষের পরিচয়।

যাহাদিগকে বই পড়িতে দেখা যায় প্রায় সর্ব্বত্রই তাহা শুধু তরলতাপূর্ণ উপন্যাস পাঠেই পরিসমাপ্ত। জ্ঞানার্জ্জনের জন্য গ্রন্থপাঠ কেহই করেন না। যে বিষয় লইয়া আলোচনা করা যায় মনের গতি সেই দিগেই ধাবিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহারা উপন্যাস লইয়া বিব্রত তাহাদের কাছে আমরা কতটুকু মঙ্গল আশা করিতে পারি ?

পল্লীগ্রামে সর্ব্বদাই পাড়ার মহিলাগণ একত্রিত হইয়া তুচ্ছ এবং অবাঞ্ছনীয় নানা বিষয়ের আলোচনায় সময় কাটাইয়া আত্ম-বিনাশের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। তাহা না করিয়া অবসর সময়টা যদি তাঁহারা কাহারও কাছে শিক্ষা লাভ করেন, বা নিজেরাই (যাহারা অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষিতা) কোন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করেন তাহা হইলেও অনেক উপকার হয়। শিক্ষা বলিতে শুধু বিদ্যাশিক্ষা নহে ; শারীরিক মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা যাহাতে লাভ হয় তাহাকেই শিক্ষা বলা যায়। পথ চলিতে আলোক লাভের জন্যই বর্ত্তিকা, অন্ধকারে বিচরণ করিবার জন্য নহে। জ্ঞানের আলোকে মানবের হৃদয়ান্ধকার দূর করে। মনুষ্যত্ব লাভের জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, সেই পথের সহায়তা লাভের জন্য বিদ্যাশিক্ষারও প্রয়োজন ; সুতরাং মনুষ্যত্বের জ্ঞান যাহাতে জাগিয়া উঠে ও লব্ধজ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতে হৃদয়ে শক্তি দান করে তাহাতেই বিদ্যালাভের স্বার্থকতা। সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া সহৃদয় পুরুষগণ যদি অপনাপন পরিবারস্থ মহিলাদিগের শিক্ষা বিষয়ে মনোনিবেশ করেন তাহা হইলে বাহিরের কাহারও দ্বারা শিক্ষা অপেক্ষা সেই শিক্ষা সহজসাধ্য হয় না কি ? পুরুষগণ নানাবিধ উন্নত দৃষ্টান্তের দ্বারা ও উৎসাহ দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষালাভে আগ্রহান্বিতা করিয়া তুলিবেন এবং সাক্ষাৎ হইলে শারীরিক কুশল প্রশ্নাদির ন্যায় শিক্ষা বিষয়েও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন।

নানাবিধ সদ্‌গ্রন্থ ও জীবন চরিত নিয়মিত পাঠ্য হওয়া উচিত। মহিলাগণ যাহাতে আপনাদের দোষ ত্রুটী সংশোধন করিয়া মানুষ হইতে পারেন, এবং জ্ঞানের আলোকে সেই পথে সাহায্য পান সে বিষয়ে নারীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য পুরুষদিগের সর্ব্বদাই আগ্রহের সহিত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। পুরুষদিগের বিন্দুমাত্র অসন্তোষের কারণ হইলে পরিবারস্থ মহিলাগণের কোন প্রকার শিক্ষা লাভ একেবারেই অসম্ভব হইয়া থাকে। আমার ভিতরে দোষ কি কি তাহা আমি নিজে যেমন বুঝিতে ও ধরিতে পারি অপর কেহ তেমন পারে না, যদি আমার

সম্মুখে উন্নত জীবনের একটা আদর্শ থাকে। (আমি যাহার মত হইতে চাই তিনি কথনও পরনিন্দা করেন না, তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ, তিনি অক্রোধী, অনলস, সত্যবাদী এবং তিনি সর্ব্বদাই নূতন জ্ঞান ও অনন্ত উন্নতির প্রয়াসী ইত্যাদি) সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যদি আমরা আত্ম-গঠনে সচেষ্ট হই তাহা হইলে আমাদের ভিতরে দোষ কি কি, তাঁহার মত হইতে হইলে আমাদিগকে কি কি করিতে হইবে; কোন্ দোষ সংশোধন করিয়া কোন্ গুণ অর্জ্জন করিতে হইবে তাহা নিজেরাই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এইজন্য সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও অন্তরে সদিচ্ছা জাগাইয়া তোলা সৎপথের প্রথম সোপান।

অন্তঃপুরবাসিনী অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এমন একদল মহিলার বাহির হওয়া একান্ত প্রয়োজন, যাঁহারা ঘরে ঘরে যাইয়া শিক্ষাদান করিতে পারেন। মানুষের নিন্দা অনাদর তাঁহাদিগকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। গ্রামে গ্রামে অথবা শৃঙ্খলানুসারে পাড়ায় পাড়ায় মহিলা সমিতি স্থাপন করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ আলোচনায় আহ্বান করিলে একটি দুইটি করিয়া তাঁহারা কি অগ্রসর হইবেন না? শক্তি যতই ক্ষুদ্র হউক ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় সাধু চেষ্টা জয়যুক্ত হইবেই হইবে। অন্তঃপুরবাসিনীগণ যাহাতে সহজেই পুস্তকাদি পাইতে পারেন তাহার সুবিধা করিতে হইবে। মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাদি পাঠ করিলে, প্রাচীন ও আধুনিক সর্ব্বদেশের উন্নত চরিত্র নর-নারীর জীবনচরিত পাঠ করিলে মনের গতি উন্নতির দিকে সৎপথে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইবেই, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, চেষ্টা করিলেই যে হাতে হাতে সুফল পাওয়া যাইবে এমন আশা যাঁহারা করেন অনেক সময়েই তাঁহাদিগকে ভগ্নোদ্যম হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হয়। কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ সফল চেষ্টা সহস্রবার নিষ্ফল না হইয়াছে? ধৈর্য্যের সহিত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কঠোর কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। কর্ম্মের পথ পুষ্পাবৃত নহে। হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না; মনে রাখিতে হইবে বিফল চেষ্টা সার্থকতারই পূর্ব্ববর্ত্তী।

গৃহকর্ম্মের সুশৃঙ্খলা দ্বারা মহিলাদিগকে শিক্ষালাভের জন্য অবসর দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্যথায় অনেক স্থলে নারীগণ বিশেষতঃ গৃহস্থ ঘরের বধূগণ সময়াভাবে আপনাদের কোন প্রকার উন্নতি করিতে পারেন না। অনেকে বলিয়া থাকেন সুশৃঙ্খলার জন্য সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কার্য্য বিভাগ করা হইয়াছে।

স্ত্রীলোক গৃহসজ্জা করিবে, রন্ধন করিবে ইত্যাদি। গৃহের কর্ম্ম নারী করিবেন এবং পুরুষ বাহির হইতে নানা দ্রব্য আহরণ করিবেন, বাহিরের যাবতীয় কার্য্য পুরুষের। যে যে কাজের উপযুক্ত তাহার প্রতি সেই কাজের ভার অর্পিত হইয়াছে। শুনিতে এ নিয়ম মন্দ নহে, কিন্তু ফলে অপনাদের ছোট খাট সুখ দুঃখ লইয়া, সর্ব্বদা অনিত্য পদার্থ লইয়া ব্যস্ত নারীগণের আধ্যাত্মিক জীবন একেবারেই ম্লান অথবা নষ্ট হইয়া যায়।

যে সমাজে একপক্ষের আহার বিহারাদি শারীরিক সুখ সাধনের জন্যই অপর পক্ষকে অতি বড় মঙ্গল হইতেও বঞ্চিত রাখা হয় সেখানে বাস করিয়া কোন মানুষ আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারে না। যাহারা অত্যাচারী, স্বার্থসাধনতৎপর ধর্ম্ম তাহাদিগকে শাসন করেন। আপনাদের সুখের জন্য অপরকে যাহারা নত রাখিতে চায় তাহারাই অবনত হইয়া থাকে। যাহা সকলের প্রতি সমান মঙ্গলদায়ক নহে কখনই তাহা ধর্ম্মের বিধান নহে।

নারীগণ দিবসের অধিকাংশ সময়ই খাদ্য প্রস্তুত করিতে ব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা যে ইহাতেও অনাবশ্যক রকমে কত সময় নষ্ট করি তাহা কেহই চিন্তা করিয়া দেখি না। জ্ঞানের আনন্দ এত মূল্যবান্ যে তাহার জন্য একটা সুস্বাদু তরকারীর লোভ ত্যাগ করা কিছুই কষ্টকর নহে।

অনেক স্থলে গৃহকর্ম্ম হইতে নারীগণের অবসর ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু পুরুষগণ পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ঘুমাইয়া গল্প করিয়া সময় কাটাইতে পারেন না। পুরুষ তাহার মাতা সহধর্ম্মিণী বা ভগিনীর মানসিক উন্নতির বিষয় চিন্তা করেন না। নারী তাহার স্বামী পুত্র ভ্রাতার সঙ্গে পূর্ণ মিলনে এক ভূমিতে দাঁড়াইতে পারেন না। হায়! আমরা নারী ও পুরুষ উভয়েই অতি পিচ্ছিল সংকীর্ণ পথে চলিতেছি; কে কাহাকে রক্ষা করিবে, কে কাহাকে শক্তি দিবে? আপনার মাতা ভগিনী সহধর্ম্মিণী প্রভৃতির মনুষ্যত্ব বিকসিত করিয়া তুলিবার জন্য যদি গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিতে হয়, তাহাতে বোধ হয় পুরুষদিগের অগৌরবের কারণ কিছুই নাই।

তিনিইত প্রকৃত স্বজনের কর্ত্তব্য পালন করেন যিনি মাতা ভগিনী সহধর্ম্মিণী প্রভৃতির আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য সাহায্য করেন। তিনিই প্রকৃত স্বামী, রক্ষক ও পালয়িতা যিনি শুধু বাহিরের নহেন, যিনি ইহ পরকালের

রক্ষক, সুহৃদ্ ও সহায়। যিনি বাহিরের এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সমভাবে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

আমাদের শক্তি অল্প কিন্তু কর্ত্তব্য গুরুতর। অন্তরের সাধুতা লইয়া ভগবানের নামে আমরা যেন কর্ত্তব্য পালনে সচেষ্ট হই।

শ্রীমতী সুধাসিন্ধু সেনগুপ্তা।

রোয়াইলের কাশ্যপ বংশ *

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় সমাজের উপর সাধক, কবি ও ভূম্যধিকারীর প্রভাব কম নয়। সমাজ কিরূপে দেশধর্ম্ম ও কালধর্ম্মদ্বারা আপনার ভিতরকার প্রকৃতিটা ধর্ম্ম, সাহিত্য ও রাজশক্তির বিকাশলাভে সহায়তা করিয়া মনুষ্যকে বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত করিয়াছে তাহা সমাহিতভাবে অনুসন্ধান করিলে দেশের সাধক, কবি ও ভূম্যধিকারীকে জানিতে হয়। ঢাকার অন্তর্গত চাঁদপ্রতাপ পরগণার কাশ্যপ বংশ শৌর্য্য বীর্য্য ও মহত্ত্বে এক সময়ে বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সমকক্ষ উন্নত পরিবার পূর্ব্ববাংলায় খুব কমই ছিল। প্রাচীনত্ব ও সদ্‌গুণের হিসাবে এই বংশের প্রাচীন ইতিহাস বাংলার সমাজ গঠনে নানা দিক দিয়া সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া এখানে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গেল।

ভূম্যধিকারীর প্রভাব।

রোয়াইল কাশ্যপ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত বাঙ্গালী বীর সঞ্জয় রায়। † ইনি আকবর বাদসাহের সমসাময়িক এবং তদীয় সৈনিক বিভাগে অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে ধীরে ধীরে ভৌমিক বা ভূঁইয়াগণের অভ্যুদয় হয়। ভাওয়াল এবং ভাওয়ালের পশ্চিমাংশে অবস্থিত চাঁদপ্রতাপ পরগণা

প্রতিষ্ঠাতা।

---

* ভাওয়াল, মুড়াপাড়া, ধানকোড়া, ঢাকার নবাব, গাজীবংশ, মাজপাড়া প্রভৃতি বহু প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দু ও মুসলমান বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে। শ্রী অঃ।

† কাহারও মতে সঞ্জয় হাজরা ও কালিন্দী হাজরা (সুয়াপুর নিবাসী) ময়মনসিংহের

গাজিবংশের শাসনাধীনে ছিল। সেই সময়ে তুরাগ নদীর তীরস্থিত ধামরাইয়ের নিকটবর্ত্তী কোন বিদ্রোহী পাঠানদলপতিকে শাসন করিবার জন্য বাদশাহের আদেশে তিনি বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তুরাগ নদীর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালীজাতির নিকট গৌরবময় উজ্জ্বল ইতিহাস। রণন্মত্ত সঞ্জয় রায় অসীম শক্তিপ্রভাবে পাঠানের সৈন্যসমূহ ও দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে সেই সুদূর অতীত যুগের বাঙ্গালী ভীরু কাপুরুষ ছিলেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদের দুর্জ্জয় শক্তির প্রভাবে বিরুদ্ধ দলকে পরাজিত হইতে হইত। বর্ত্তমান সময় আমরা যেমন বিলাসিতার মোহে মজিয়া দরিদ্র ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছি, সেই চিরগৌরবময় স্বর্ণযুগে আমাদের বলশালী পূর্ব্বপুরুষেরা সেরূপ ছিলেন না। 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া সেনাপতি সঞ্জয় রায় পাঠানকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন এবং তাঁহার এই বিজয় লাভের পারিতোষিক স্বরূপ সম্রাট্ তাঁহাকে চন্দ্রপ্রতাপ প্রভৃতি সাতটী পরগণা দান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে উদারহৃদয় মুসলমান নৃপতির এহেন দান দুর্ল্লভ ছিল না।

রাজা ভবানী।

সঞ্জয় রায়ের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ ভবানীচরণ রায় শাহ আলমগির (ঔরংজেব) বাদশাহের অধীনে দিল্লীতে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁর কার্য্যদক্ষতায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া বাদশাহ ইহাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। ঔরংজেবের সময়ে অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ কর্ম্মচারীকে রাজদত্ত উপাধি প্রদান করা হইত না। ভবানীচরণ কার্য্যকরী শক্তির প্রভাবে সম্রাট্‌কে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তির মস্তকে সম্রাটের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে রাজা ভবানী ও তাঁহার বংশধরগণ বাংলার সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছেন।

অন্তর্গত হোমরাবাজে গমন করেন, এবং উত্তরকালে তাঁহারা নবাব হইতে 'জলডুবি' পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রোয়াইলের উত্তরে বেলিশ্বর গ্রামে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির প্রাঙ্গনে গোবধ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এইরূপ জনশ্রুতিও আছে।

রাজা ভবানীর পুত্র রামনারায়ণ রায়। ইঁহার আট পুত্র আট কাশ্যপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। রোয়াইলের কাশ্যপবংশ ইঁহার সপ্তম পুত্রের সন্তান এবং ইঁহারাই পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। রামনারায়ণ রায়ের অন্যান্য পুত্রের সন্তানগণ সোমভাগ, মহাদেবপুর, রঘুনাথপুর প্রভৃতিস্থানে অদ্যাপি অবস্থান করিতেছেন।

রামমোহন।

রাম নারায়ণ রায়ের প্রপৌত্র রামমোহন রায় অতি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যে চন্দ্রপ্রতাপ পরগণার লোক তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। জনশ্রুতি এই যে ইনি ৺ কাশীধামে মণি-কর্ণিকার ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিবার সময় ঊর্দ্ধ হইতে একখণ্ড তাম্রফলক ইহাঁর ক্রোড়দেশে পতিত হয়। ঐ ফলকে বীজমন্ত্র ও পূজা-পদ্ধতি অঙ্কিত ছিল। এই তাম্রফলক ৺ জগদম্বা নামে অভিহিত। ভগবতী ও পূর্ব্বপুরুষের প্রতি অচলা ভক্তি হেতু আজিও কাশ্যপবংশ জগদম্বাকে রোয়াইলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জ্ঞানে পূজা-ভক্তি করিয়া থাকেন।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা।

সাধক রামমোহনের পুত্র ব্রজমোহন রায় অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। ইঁহার তিন পুত্র রাধামোহন, কৃষ্ণমোহন ও গৌরমোহন যথাক্রমে বর্ত্তমান বড়, মধ্যম ও ছোট হিস্যার প্রতিষ্ঠাতা। রামমোহন ও ব্রজমোহন রায়ের সময় জমিদারীর দশশালা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তিন ভাই রাধামোহন কৃষ্ণমোহন ও গৌরমোহন এক যোগে বহু অর্থব্যয়ে নবাগ্নি,পক্ষাগ্নি প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন,এবং যজ্ঞশেষে নবনির্ম্মিত শিবমন্দিরে বৃষভমূর্ত্তি সহিত শিব স্থাপন করেন। মঠের বারেন্দার শিরোভাগে সংলগ্ন প্রস্তর ফলকে খোদিত আছে,—'শ্রীরাধামোহনাখ্যো দ্বিজ ইহ সুতুলাপুরুষাদি প্রণেতা মাতৃরুদ্রাগ্নিসংজ্ঞ প্রবরমখমুখৈ রুদ্রালিঙ্গ প্রতিষ্ঠাম্। ভ্রাতৃভ্যাং মোহনাভ্যাং সমকৃত সহিতঃ কৃষ্ণ গৌরাদিকাভ্যাং স্ত্রীলোকাভ্যাং শাক ইন্দুজ্বলনঘুনিসমেহশ্বেন্দ্ব হে মাধবস্য॥" এই শিলালিপি হইতে জানা যায় ১৭৩১ শকাব্দের ১৭ই বৈশাখ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

কাশ্যপ-বংশের উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ রাজমোহন ও সুখেন্দুমোহন। ইহাঁরা উভয়েই প্রখর বুদ্ধিশালী ও তেজস্বী জমিদার বলিয়া পূর্ব্ববাংলার সর্ব্বত্র

পরিচিত ছিলেন। রাধামোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজমোহন রায়ের অতিথি-

রাজমোহন।

পরায়ণতা এবং অমায়িক ব্যবহারে আপামর সকলেই মুগ্ধ হইত। ইনি মাতৃশ্রাদ্ধে স্বর্ণদানসাগর ও রোয়াইল ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রাজমোহন ও সর্ব্বমোহন দুই সহোদর ছিলেন। তাঁহাদের পিতা রাধামোহন তাঁহাদিগকে নাবালক রাখিয়া কাশীবাসী হন এবং তথায়ই পরলোক গমন করেন। রাজমোহন অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও অধ্যবসায় গুণে সেই সময়ের জমিদারমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জমিদারী কার্য্যে তাঁহার দূরদৃষ্টি ও দক্ষতা সকলেরই অনুকরণীয় ছিল। সে সময়ে তাঁহার অপেক্ষা অধিক সম্পত্তিশালী জমিদার এদেশে ছিল না এমন নহে; কিন্তু প্রতাপ ও রাজসম্মানে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। সৎকর্ম্মানুষ্ঠান ও বিদ্যানুরাগ তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার সময়ে রোয়াইল সংস্কৃত বিদ্যার কেন্দ্রস্থান ছিল। তিনি প্রতিবৎসর নানা দেশ হইতে বড় বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে আনিতেন এবং বিরাট সভায় তাঁহাদের শাস্ত্রীয় আলোচনা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতেন। বিচারে বিজয়ী পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট হইতে প্রভূত অর্থ পারিতোষিক স্বরূপ লাভ করিতেন। টোল চতুষ্পাঠীর সাহায্যার্থ তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। সেই সময় পূর্ব্ববাংলার কোন পণ্ডি-তই রোয়াইলের সভায় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারিলে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন না। তিনি নিজে সংস্কৃত না জানিলেও বিচারের সভায় উপস্থিত থাকি-য়াই পণ্ডিতগণের জয়-পরাজয় সম্যক্ বুঝিতে পারিতেন। মাতৃশ্রাদ্ধে সুবর্ণ-দানসাগর ও ধাত্রীর (ধাইমার) শ্রাদ্ধে রৌপ্যদানসাগর তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অন্যতম কীর্ত্তি। যে সামান্য নারীর স্তন্য পান করিয়া শৈশবে তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন সেই নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া তিনি নিজে ধন্য হইয়া-ছিলেন এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট একটা অতি উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রাজমোহন দেখাইয়া গিয়াছেন ধাই-মা অবজ্ঞার পাত্রী নয়। মানুষ যতই বড় হউক না কেন তাঁহার সামান্য নারীর প্রতিও একটা কর্ত্তব্য আছে। গৃহদেবতা জগদম্বার প্রতি তাঁহার অচলাভক্তি ছিল। তিনি স্বয়ং প্রত্যহ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত দেবীর অর্চ্চনা করিতেন। তাঁহার সদ্ব্যয়, আচার-নিষ্ঠা

ও দেবীর প্রতি অচল ভক্তি হেতু জনসাধারণের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে জগদম্বা প্রতিদিন তাঁহার জন্য এক কলসী স্বর্ণমুদ্রা প্রসব করিতেন এবং তজ্জন্যই তিনি এইরূপ ব্যয় বিধান করিতে সক্ষম হইতেন। ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজনে তিনি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতেন, নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া ভোজন করাইতেন ও দক্ষিণাদি দিতেন। প্রথমতঃ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাঁহার কতকটা বীতস্পৃহা ছিল। তৎকালে ইংরেজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকের ধর্ম্মত্যাগই *এই অশ্রদ্ধার কারণ। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র ৺ সুখেন্দুমোহন রায় ইংরেজী শিক্ষার বহুমুখী উপকারিতা তাঁহাকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার একবৎসর পরই রোয়াইল ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

ভণ্ডামির শাস্তি।

ধর্ম্মপ্রাণ রাজমোহন ভণ্ডামি ও কপটতার একান্ত বিরোধী ছিলেন। কথিত আছে তাঁহার এলাকা মধ্যে একজন বৈরাগী নানা প্রকার শঠতাদ্বারা বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল। রাজমোহন রায় এই সংবাদ অবগত হইয়া বিশ্বস্ত ব্যক্তিদ্বারা উহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া বৈরাগীকে নিজ গৃহে ডাকাইয়া পাঠান। বৈরাগীর গায়ে বহু ফোঁটা তিলক দেখিয়া রাজমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কি প্রত্যহই এরূপ মাটীদ্বারা ফোঁটা তিলক করিয়া থাক?' উত্তরে বৈরাগী কহিল, 'আজ্ঞে, হাঁ, আমি প্রত্যহই এইরূপ করিয়া থাকি।' রাজমোহন বলিলেন,—'তুমি কতকাল আমার এলাকায় বাস করিতেছ?' বৈরাগী—'আজ্ঞে, প্রায় ৪০।৫০ বৎসর যাবৎ এখানে আছি।' রাজমোহন—'তুমি আমার বিনা অনুমতিতে এইরূপে আমার বহু মাটী নষ্ট করিয়াছ, এই অপরাধে আমি তোমাকে ৫০০৲ শত টাকা জরিমানা করিলাম, এই মুহূর্ত্তেই টাকা দিতে হইবে।' প্রবল পরাক্রান্ত রাজমোহন রায়ের হুকুম কাহার সাধ্য লঙ্ঘন করে? বৈরাগী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া টাকা আনিয়া রাজমোহন রায়ের পদপ্রান্তে রাখিয়া দিল। তখন রাজমোহন রায় নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে গরীবদিগকে আনাইয়া বৈরাগীর হাত দিয়া ঐ টাকাগুলি তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া বৈরাগীকে বলিলেন,—'সাবধান, তুমি ধর্ম্মের ভাণ করিয়া আমার এলাকায় অধর্ম্মাচরণ করিতেছ, ভবিষ্যতে আর এরূপ করিও না। বৈরাগী, ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া পাপ করিলে কি ফল?' বৈরাগী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে

আদর্শ জমিদারের পবিত্র মূর্ত্তি প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। একদিনের শিক্ষায় বৈরাগীর চক্ষু ফুটিয়াছিল, সে আর জীবনে কখনও ভণ্ডামীর আশ্রয় করিয়া ধার্ম্মিক সাজিতে সাহসী হয় নাই। রাজমোহন রায়ের উদারতা ও দান সম্বন্ধে বহু প্রচলিত গল্প আছে, বাহুল্য ভয়ে উহা এখানে সংযোজিত হইল না। ১২৬৮ সনের ১০ই বৈশাখে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ঋষিতুল্য সুধেন্দুমোহন রোয়াইলের মুকুট স্বরূপ ছিলেন। তিনি ঢাকা নগরীতে ইংরেজী শিক্ষা করিয়া সেই সময়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সংস্কৃত সাহিত্য, ভাগবত পুরাণ, পাণিনির ব্যাকরণ ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। পূর্ব্ববাংলার অভিজাত্য বংশে তাঁহার ন্যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যানুরাগী আর কেহও ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায় না। তিনি নিজ বাড়ীতে সর্ব্বপ্রকার আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া স্বয়ং গরীব দুঃখীকে বিতরণ করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার এত অনুরাগ ছিল যে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রির সময়ও কোন উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া গমন করিতেন এবং ব্যবস্থা মত ঔষধ ও পথ্যাদি দিয়া আসিতেন। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া এইরূপে ভোগ-বিলাসাদি বিসর্জ্জন করিতে কয় জন জমিদার সন্তান যে পারেন তাহা একটু অনুধাবন করিলে এই স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষের প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিবে ইহা স্বাভাবিক। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁহার এত অধিকার ছিল যে মত্তগ্রামের বিখ্যাত কবিরাজ ৺অমৃতানন্দ সেন মহাশয় বলিতেন,—"সুধেন্দুমোহন রায় বার আনা কবিরাজ ও চারি আনা জমিদার; জমিদার না হইলে তাঁহাকে ষোল আনা কবিরাজই বলিতাম।' তাঁহার চিকিৎসাগুণে মৃত্যু-মুখ প্রত্যাগত সহস্র সহস্র ব্যক্তি আজও তাঁহার এই অসাধারণ গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

সুধেন্দুমোহন।

সাধু সুধেন্দুমোহনের উৎসাহ ও উদ্যোগেই রোয়াইল ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল বলিয়াই আজ তাঁহার পুণ্যগৃহে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন রায়কে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। মাতৃভাষার সহিত ইংরেজীর অনুশীলন করিলে শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ সাধন হয় মনে করিয়া সাধু সুধেন্দু তাঁহার জ্যেষ্ঠ

পুত্রকে ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ গৃহে বহুসংখ্যক ছাত্রকে আহারাদি দিয়া রোয়াইল স্কুলে পড়াইতেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে কলেজে পড়িবার জন্যও অর্থ সাহায্য করিতেন। প্রজাগণের নিকট হইতে অন্যায়পূর্ব্বক একটী পয়সাও গ্রহণ করা তিনি অতিশয় পাপের কার্য্য মনে করিতেন। পরোপকার, সত্যনিষ্ঠা ও জ্ঞানানুরাগ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। হিংসাবৃত্তি তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের চতুঃসীমায়ও আসিতে পারিত না। মহাশত্রুও বিপন্ন হইয়া তাঁহার উপদেশ প্রার্থী হইলে, তিনি তাহাকে সদুপদেশ দিয়া রক্ষা করিতেন। পরের উন্নতিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার চরিত্র অতি উদার ও নির্ম্মল ছিল। স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রাণ হইলেও সামাজিক ও ব্যক্তিগত কুসংস্কার প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথার প্রতি তাঁহার মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ ছিল। শাস্ত্রীয় প্রণালী অনুসারে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রতি তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। নানাদিক দিয়া এই মহাপুরুষের কর্ম্মময় জীবনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মনে হয় সাধু সুধেন্দু আভিজাত্য বংশকে সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই সারা জীবন যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এহেন নির্ম্মল চরিত্র, উদারস্বভাব মহামনা ব্যক্তি ১৩০১ সনের ৮ই বৈশাখ ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। *

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নিঃসঙ্গ

(১)

সে আজ অনেক দিনের কথা। আমার বয়স যখন সতের বৎসর তখন আমাদের গ্রামের স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাশ করিলাম। শিশুকালেই পিতৃহীন

---

* এই প্রবন্ধ রচনায় রোয়াইল জমিদার বংশের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নিরভিমান ও সর্ব্বজন-প্রিয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন রায় এম, এ, মহাশয় আমাকে নানারূপ সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ। তাঁহার সাহায্য না পাইলে আমি এই বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জনসাধারণে প্রকাশ করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।

হইয়াছিলাম। আমার বিধবা মাতা বহুকষ্টে আমাকে লালন-পালন করিয়া এতকাল আমাকে স্কুলে পড়াইয়াছেন। পরীক্ষা দেওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনিও আমাকে ফাঁকি দিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। মাতৃশোকে বড়ই অধীর হইয়া পড়িলাম। ঝড়ের একটা দম্‌কা বাতাসের মত প্রবল শোকের বেগ আমার সমস্ত হৃদয়টা যেন ওলটপালট করিয়া দিয়া গেল। শোকের প্রথম আবেগ কতকটা প্রশমিত হইলে, ক্রমে ক্রমে সংসারের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি আমার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। মাতা জীবিতা থাকিতে ক্ষুধার অন্ন, পরিধানের বস্ত্রের জন্য কখনও ভাবিতে হয় নাই; কিন্তু, এখন কি করিয়া দিন চলিবে, ভাবিয়া অস্থির হইলাম। দয়ার্দ্রহৃদয় আমাদের প্রতিবেশী একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মধুর বচনে আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—"ভাবনা কি বাবা, ভগবান যতদিন আমার অন্নের সংস্থান রাখ্‌বেন, দুবেলা দুটী অন্নের জন্য ততদিন তোমার ভাব্‌তে হবে না। তুমি আমার পুত্র-তুল্য, আমাদের পর ভেবো না।" কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল আসিল, আমি দেবহৃদয় বৃদ্ধের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলাম। অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন। আপাততঃ দুটী অন্নের সংস্থান হইল ভাবিয়াও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু, হায়, এমন করিয়া কতদিন চলিবে? কৈশোরেই আমার জীবনের সমস্ত তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া গেল; পিতার শাসন, মাতার স্নেহ হইতে অকালে বঞ্চিত আমার নিজকে অত্যন্ত হতভাগ্য ও পৃথিবীর ভারস্বরূপ মনে হইতে লাগিল। শোক-সন্তপ্ত চিন্তাকুল হৃদয় লইয়া কখনও মাতৃপরিত্যক্ত জীর্ণকুটীরের নিভৃত কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, কখনও হৃদয়ের গুরুভার কথঞ্চিৎ লঘু করিবার জন্য গ্রাম ছাড়িয়া খোলা মাঠে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতাম, কখনও গ্রামপ্রান্তস্থ নদীতীরে একটা বহু পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বসিয়া বসিয়া ঘনপত্রজালে বাধাপ্রাপ্ত বায়ুর সোঁ সোঁ শব্দ শুনিতে থাকিতাম। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিটি আরক্তিম পশ্চিমাকাশে ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইত, নদীর অপর পার হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীগুলি অশ্বত্থবৃক্ষের বহুবিস্তৃত শাখা-প্রশাখার অন্তরালে আপন আপন কুলায়ে ফিরিয়া কলরব করিতে থাকিত; বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে পাখীগুলির সেই বিদায়-কাকলী আমার মনের মধ্যেও যেন একটা বিষাদের সুর জাগাইয়া তুলিত, মানসপটে ধীরে ধীরে মাতার

রোগশীর্ণ পাণ্ডুর বদনখানি এবং চিরবিদায়ের ব্যাকুল চাহনি ফুটিয়া উঠিত; হঠাৎ হয়ত আমি শিহরিয়া উঠিয়া ত্রস্তপদে বাড়ী ফিরিতাম। এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার গৃহিণী সর্ব্বদাই আমাকে নানারূপ প্রবোধবাক্য বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেন, ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল যোগাইতেন, এবং না চাহিতে আমার সমস্ত অভাব পূরণ করিতেন। সন্ধ্যার পর বৃদ্ধ ক্ষীণ দীপালোকে যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করিতেন, আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া শুনিতাম; কতক বুঝিতাম, কতক বুঝিতাম না, কিন্তু তাঁহার স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি, সুস্পষ্ট মধুর উচ্চারণ আমার অশান্ত হৃদয়কেও আবিষ্ট করিয়া ফেলিত। অল্পদিনেই তাঁহারা আমার পিতৃমাতৃস্থানীয় হইয়া উঠিলেন। বিশ বৎসর পরে আজও আমি তাঁহাদের অকৃত্রিম স্নেহ ভুলিতে পারি নাই।

মাতৃবিয়োগের পর প্রায় দেড়মাস কাল অতীত হইয়াছে। মাতুল মহাশয়ের নিকট হইতে এক পত্র পাইলাম, আমি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি, মাতুল আমাকে কলিকাতায় তাঁহার বাসাতে থাকিয়া কলেজে পড়িতে লিখিয়াছেন। কৃতকার্য্যতার আনন্দে আমার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। আমার মাতুল কলিকাতাতে কোন আফিসে চাকুরী করেন। এখন তিনি প্রৌঢ়বয়স্ক, তাঁহার স্বভাবটি অতি সাদাসিধে রকমের, হৃদয়টিও স্নেহ-প্রবণ, কিন্তু মাতুলানীর কড়া শাসনে তাঁহার নিজ ইচ্ছানুযায়ী কোন কার্য্য করিবার উপায় ছিল না। সেই জন্যই আমাদের দুর্দ্দশার সময়ে তাঁহার ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারেন নাই। এখন আমার অনাথ অবস্থা দেখিয়া হয়ত মাতুলানীরও কিঞ্চিৎ করুণার উদ্রেক হইয়াছিল, তাই মাতুল মহাশয় আমাকে কলিকাতা আনাইতে সাহস করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

যথাসময়ে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর নিকট সাশ্রুনয়নে বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। মাতুলের বাসার নিম্নতলে একটি অন্ধকার ছোট ঘরে আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। মাতুলের একটি অল্পবয়স্ক পুত্র এবং একটি কন্যাকে প্রত্যহ দুই বেলা পড়াইতে হইত। দীন দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, শৈশব হইতে সুখলালিতও নহি; সুতরাং, মাতুলালয়ে আমার শারীরিক বিশেষ কোন অসুবিধা হইত না। কিন্তু, স্নেহের জন্য একটা আকুল কাতরতা সময়ে সময়ে

আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিত। মাতুলানীর স্নেহশূন্য বিরাগ পদে পদে আমাকে পীড়িত করিত। আমি তাঁহার চক্ষে একটি অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধি, এবং সর্ব্বদাই একটা ভারস্বরূপ কুগ্রহের মত প্রতিভাত হইতেছি, তাহা তিনি তাঁহার প্রত্যেক কথায় এবং অঙ্গভঙ্গীতে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। উপায়ান্তর নাই, সুতরাং তাঁহার উপেক্ষা এবং দুর্ব্বাক্য ম্লানমুখে ভারক্লান্ত গর্দ্দভের ন্যায় সহ্য করিতাম।

কলিকাতা আসিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছি, পড়াশুনাও রীতিমত চলিতেছে। কিন্তু, আমার গ্রাম্য প্রকৃতি রাজধানীর ইট পাথরের চাপে ভালরূপ স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল না। অন্তর্নিহিত কোমল বৃত্তিগুলিও যেন বাহির হইবার অবসর খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতার সবই নবীন সতেজ, শুধু আমিই আমার অর্থহীন সঙ্গীহীন জীবন লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলাম। নিয়মিত সময়ে প্রত্যহ কলেজে যাইয়া অধ্যাপনা শুনিতাম, কিন্তু শুধু তাহাতেই হৃদয়ের তৃপ্তি হইত না।

আমাদের একজন সহাধ্যায়ী সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যক। তাহার নাম ছিল নির্ম্মল, অত্যন্ত সুকুমার মূর্ত্তি, এবং ধনী সন্তান। সহাধ্যায়ীদের মধ্যে অনেকেই তাহাকে ভালবাসিত, কেহ কেহ বা ধনী বলিয়া উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে খাতির করিত। কলেজে তাহার বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। সে সকলের সঙ্গেই মিশিত, এবং নিরহঙ্কার সদালাপী এবং সরলপ্রকৃতির ছিল। বন্ধুবান্ধব লইয়া সে যে বেঞ্চিতে বসিত, সেখানে পড়াশুনা অপেক্ষা হাসিঠাট্টা আমোদের মাত্রাই বেশী চলিত। এই বালককে প্রথম যে দিন দেখি, তখন হইতেই আমি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। কিন্তু তাহার সহিত আলাপ করিতে অথবা মিশিতে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতাম; কারণ, সে ধনী আমি নির্ধন, সে সুসজ্জিত সুপুরুষ আমি জীর্ণ মলিন বেশধারী, সে সদা প্রফুল্ল ও মিষ্টভাষী আমি বিষণ্ণ ও গম্ভীর, সে বন্ধুবান্ধব পরিবৃত আমি নিঃসঙ্গ, তাহার জীবন সুখশান্তিময় আমার জীবন অভিশপ্ত। কি যেন এক জন্মান্তরীন সংস্কারের ন্যায় নির্ম্মলের প্রফুল্ল মধুমাখা এবং ভাসা ভাসা চোখ দুটি আমার নিকট বহু দিনের পরিচিত, বড়ই আপনার বলিয়া বোধ হইত। তাহার কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে মধুবর্ষণ করিত, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ

ভঙ্গী আমি সোৎসুক নয়নে চাহিয়া দেখিতাম, প্রত্যহই সে যেন আমার নিকট নবীন এবং অভিনব বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হইত। রবিবার কলেজ বন্ধ, সুতরাং তাহার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল না; সপ্তাহের মধ্যে সেই দিনটাই আমার নিকট নিতান্ত বিরক্তিজনক বলিয়া বোধ হইত, সেদিনের দীর্ঘ মুহূর্ত্তগুলি যেন কিছুতেই কাটিতে চাহিত না, শুইয়া শুইয়া তাহারই কথা ভাবিতাম। দ্বিপ্রহরে রৌদ্রতপ্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাসগুলি যেন আমার গায়ে লাগিত, রৌদ্র-শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি লক্ষ্যহীন ভাবে শ্লথ গতিতে নীল আকাশের গায়ে ভাসিয়া বেড়াইত, অসীম শূন্য হইতে পক্ষ বিস্তার করিয়া দুই একটা চিল করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া যেন আমারই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি করিত।

কিছু দিন এইরূপে গত হইলে নির্ম্মলের সঙ্গে আলাপ হওয়ার একটা সুযোগ ঘটিল। তাহারা কয়েক জন মিলিয়া একটা আলোচনা সভা খুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। ক্লাসে ভাল ছাত্র বলিয়া আমার বেশ একটু খ্যাতি ছিল। সুতরাং তাহাদের ইচ্ছা যে আমি ঐ সভায় যোগদান করি। একদিন কলেজের ছুটি হইলে নির্ম্মল আমার নিকট আসিয়া অতি সহজ ভাবে আমাকে তাহাদের সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করিল। তাহার অকুণ্ঠিত ভাব আমার হৃদয়ের সঙ্কোচ অনেকটা দূর করিয়া দিল। আমি সানন্দে তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী সভায় সকলের অনুরোধে আমার রচিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। অনেকেই আমার রচনা পদ্ধতির প্রশংসা করিলেন; নির্ম্মল গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শত মুখে আমার সুখ্যাতি করিল এবং তাহার নিমন্ত্রণেই আমি সভায় যোগদান করিয়াছি, তাহাতে যেন একটু গর্ব্ব অনুভব করিল। এই শ্রেণীর সভার শেষে যেরূপ গতি হয়, এই সভাও শীঘ্রই তদ্রূপ সদ্গতি প্রাপ্ত হইল; কিন্তু, এই সূত্রে আমাদের পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল।

বাড়ীতেও আমার একটি সঙ্গী জুটিল। আমাদের বাড়ীর অপর এক অংশে একটি ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিতেন। ভদ্রলোকটি সামান্য বেতনে কোনও সওদাগরি আফিসে চাকরি করিতেন। তিনি সস্ত্রীক আমাকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, এবং বৈকাল বেলাটা তাঁহার সহিত গল্প গুজবেই প্রায় কাটাইয়া দিতাম। তাঁহার একটি মাত্র সন্তান; বেশী বয়সে জাত কন্যাটীকে পিতামাতা উভয়েই অত্যন্ত আদর করিতেন। কন্যাটীর নাম কমলা; একাদশ

বৎসরে পদার্পণ করিয়া সে পিতামাতার আদরে নিতান্ত ছেলে মানুষের মতই দিন কাটাইত। কমলার চোখেমুখে একটি শৈশবসুলভ সরলতার দীপ্তি সকলকেই মুগ্ধ করিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাতুলের পুত্রকন্যা আমার নিকট পড়িত। কমলা আমার মাতুল কন্যার সমবয়স্কা, এবং সর্ব্বদাই তাহার সহিত একত্র থাকিত। সে আমার নিকট নিঃসঙ্কোচে আসিত, পড়া বুঝিয়া লইয়া যাইত, এবং আমার অবসর সময়ে আমার সহিত কত গল্প করিত। ছেলেবেলার কত তুচ্ছ কথা, খেলা ঘরের কথা, পুতুল খেলার কথা, বাপমার কথা সে চিরপরিচিতের ন্যায় আমার নিকট অনর্গল বকিয়া যাইত। ক্ষুদ্র বালিকার সে তুচ্ছ কথাগুলি আমার নিকট বড়ই মধুর বড়ই স্বভাব-সুন্দর বলিয়া বোধ হইত। আমিও আমার ভাঙ্গাকুঁড়ের কথা, আমার স্নেহময়ী মাতা, অসময়ে আমার আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর কথা তাহাকে প্রাণ খুলিয়া বলিতাম। যে সকল কথা সর্ব্বদাই মনে হয়, অথচ কলেজের আমোদ-প্রিয় বন্ধুসমাজে যাহা কোন মতেই উত্থাপন করা যায় না, জীবনের সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি যন্ত্রচালিতের ন্যায় সেই ক্ষুদ্র বালিকার নিকট বলিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিতাম,—কিছুমাত্র অসঙ্গত বোধ হইত না। সমবেদনায় বালিকার হৃদয় ব্যথিত হইত, চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইত, সে যেন তাহার করুণ দৃষ্টিপাতে আমার হৃদয়ের সমস্ত বেদনাটুকু মুছিয়া দিতে চাহিত। এমনি করিয়া সে আমার সম-দুঃখভাগী হইয়া উঠিল, তাহার সমস্ত প্রাণ দিয়া আমাকে চিনিয়া লইতে লাগিল। কখনও কখনও আমার পাঠ্য ইংরাজী পুস্তক হইতে কোনও কোনও অংশ তাহাকে অনুবাদ করিয়া শুনাইতাম। সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ অনিমেষ নয়নে আমার পানে চাহিয়া চাহিয়া শুনিত, সমস্ত কথা বুঝিত কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রত্যেকটি কথা সে একাগ্রতা সহকারে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিত।

এইরূপে কলেজে নির্ম্মল এবং বাড়ীতে কমলা আমার সমস্ত প্রাণটিকে অধিকার করিয়া বসিল, এবং সুখ-দুঃখে আমার জীবন একরূপ কাটিয়া যাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে মাতুলালয়ে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। এখন আমি বি, এ, পড়িতেছি, নির্ম্মলও আমার সহাধ্যায়ী। এই তিন বৎসরে নির্ম্মলের সহিত যথেষ্ট হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। পূর্ব্বরাগের সে তীব্রতা আর এখন নাই, কিন্তু

তাহার সহিত বন্ধুত্ব এখন সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। আমি প্রত্যহই তাহার বাটিতে যাই, সেও মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আসে।

কমলার বয়স এখন প্রায় চৌদ্দ বৎসর। শৈশব অতিক্রম করিয়া সে এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। অজ্ঞাতসারে যৌবনের কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা কুসুমকলিকার পাপড়ির ন্যায় একটি একটি করিয়া প্রস্ফুটিত হইতেছে। কমলার পিসিমাতা আমাকেই কন্যাসম্প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছেন, আকারে ইঙ্গিতে তাহা বুঝাইয়াও দিয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ্যতঃ এখনও কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই। কমলা বোধ হয় এবিষয়ে কিছু শোনে নাই, তাই সে পূর্ব্বের মত এখনও নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পড়া বুঝিয়া লইত, কিন্তু, যৌবন-সুলভ লজ্জার বশবর্ত্তী হইয়া এখন আর সে আগের মত বিনাকারণে যখন তখন আসিয়া তুচ্ছ গল্প করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিত না। শৈশব-সরলতার পরিবর্ত্তে এখন লজ্জা-কাতর নম্রতা তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। কমলা আমাকে ভালবাসিত কিনা জানি না, কিন্তু আমার অভাবে তাহার হৃদয়ের অনেকটা স্থান যে শূন্য হইয়া পড়িবে তাহা বুঝিতে পারিতাম। কমলাকে স্ত্রীরূপে লাভ করিবার জন্য যে আমিও বিশেষ ইচ্ছুক ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না, বরঞ্চ তাহা যেন আমার নিকট একটু বিসদৃশই বোধ হইত; অথচ সে অপরের কণ্ঠলগ্না হইবে তাহা ভাবিতেও যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। মনে হইত এখন যেমন আছি, চিরটা কাল কমলার সহিত এইরূপভাবে কাটাইয়া যাইতে পারি তো বেশ হয়। মানব-হৃদয় সাধারণতঃ মুক্তি ও বন্ধনের মাঝামাঝি অবস্থা-তেই থাকিতে চায়।

একদিন সন্ধ্যার পরে আমি আমার ঘরে বসিয়া আছি। বাহিরে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না; রৌদ্রতপ্ত ধরণীর ক্লান্তি হরণ করিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে; কমলা যথারীতি তাহার পুস্তকাদি লইয়া আমার নিকট আসিয়া বসিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ নির্ম্মল আমার ঘরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া সে বাহিরে যাইতেছিল, কিন্তু আমি বাধা দেওয়াতে চুপ করিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইল। নির্ম্মল বাতায়নপ্রবিষ্ট জ্যোৎস্নালোকে দেখিল, তাহার সম্মুখে একখানা কুসুমপেলব মুখ, অসংযত চূর্ণকুন্তল ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, এবং লজ্জায় আনমিত বড় বড় চোখের পল্লব দুটি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পালাইবার

পথ খুঁজিতেছে। আমি বলিলাম,—"কমল, এই আমার বন্ধু নির্ম্মলচন্দ্র।" বহুদিন আমি কমলার নিকট নির্ম্মলের সম্বন্ধে কত কথা বলিয়াছি, তাই সে সোৎসুক অথচ ব্রীড়ানম্র নয়নে নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া হাত উঠাইয়া ছোট্ট একটি নমস্কার করিল। নির্ম্মলের হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত হইয়া উঠিল, অপ্রতিভ হইয়া সে যে কি করিবে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অবশেষে প্রতিনমস্কার করিয়া হঠাৎ খাপছাড়া রকমে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—"আপনি ভাল আছেন?" ছোট একটি "আজ্ঞে হ্যাঁ" বলিয়া যৌবন-মঞ্জরিত দেহলতাটি ঈষৎ আনমিত করিয়া ধীরে ধীরে কমলা আমার ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নির্ম্মলের চক্ষে কমলার দেহের প্রত্যেক গতিতে সৌন্দর্য্যের ছটা স্বাভাবিক হিল্লোলে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। মুগ্ধ যুবকের তরুণ হৃদয়ে একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল; বিকচোন্মুখ পুষ্পকলিকা যেমন প্রভাতের আলোর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, নবযৌবনের আবেশে নির্ম্মলের হৃদয়ও তেমনি কি যেন কিসের জন্য উতলা হইয়া উঠিল।

কমলার সমস্ত সংবাদ নির্ম্মল আমার নিকট হইতে সংগ্রহ করিল। সে আজ বড়ই উন্মনস্ক; কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া চলিয়া গেল। ইহার কয়েকদিন পর নির্ম্মলের পিতা পুত্রের সহিত কমলার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া পাত্রীর পিতার নিকট ঘটক প্রেরণ করিলেন। পিতৃ-মাতৃ-সহায়-সম্পদহীন আমাপেক্ষা ধনীসন্তান নির্ম্মল সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ, সুতরাং কমলার পিতা সানন্দে উক্ত প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় কমলার মাতা আমাকে ডাকিয়া নিয়া অপরাধীর ন্যায় সমস্ত কথা বলিলেন। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম, সুতরাং প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিলাম। আমার প্রাণে যে যন্ত্রণার অনলশিখা জ্বলিতেছিল, তাহার চিহ্নমাত্রও প্রকাশ না করিয়া নানারূপ কৃত্রিমআনন্দ প্রকাশ করিলাম; কিন্তু প্রাণের ভিতরটা যেন পুড়িয়া পুড়িয়া ক্ষার হইয়া যাইতে লাগিল।

কমলার মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমার ঘরে আসিয়া বসিলাম। যে যত নিঃশব্দে সহ্য করে, তাহার যন্ত্রণা তত মর্ম্মান্তিক হয়। নিশীথের নিস্তব্ধতা যতই নিবিড় হইয়া আসিতে লাগিল, আমার হৃদয়ের মর্ম্মভেদী হাহাকার ততই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অন্তরের আর্ত্তনাদ যদি বাহিরে শুনা যাইত, তবে সেই সুপ্ত নিশীথের গভীর নিস্তব্ধতা আমার করুণবিলাপধ্বনিতে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া

যাইত। এমন গভীর নিঃশব্দে এমন প্রাণস্তুদ ব্যাপার সংঘটিত হয়। আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, সবচেয়ে প্রিয়, রক্তমাংসের সহিত যাহার সত্ত্বা মিশিয়া গিয়াছিল, সে আজ আমা হইতে এত দূরে! আর কয়েকদিন পরে সে পরস্ত্রী হইবে। তখন আমার তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সহিত একটি কথা বলিবার অধিকার আমার থাকিবে না, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা আমার তখন পাপ! হায়, এই সংসার! উদ্বোধনের মঙ্গলবাদ্যের স্থানে আমার শূন্যহৃদয়ের বিজয়ার বিদায়-গীতি করুণসুরে বাজিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি নিদ্রাহীনভাবে কাটাইলাম। প্রভাতে চৌকির উপর বসিয়া আমার উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন, অভিশপ্ত জীবনের কথা ভাবিতেছি, এমন সময় পুস্তকাদি লইয়া তাহার নিয়মিত পাঠ নিবার জন্য কমলা উপস্থিত হইল। তাহার বিষণ্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া আমার রুদ্ধ আবেগ আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; অতিকষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া আমি গদগদকণ্ঠে ডাকিলাম,—'কমল'! চাহিয়া দেখিলাম, তাহার বদনমণ্ডল শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় অজস্র অশ্রুপাতে ভিজিয়া যাইতেছে। শুধু একবার, একবার মাত্র মর্ম্মভেদী সকরুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া হৃদয়ের জ্বালাময় প্রস্রবণ অতি কষ্টে নিরুদ্ধ করিয়া কমলা ধীরে ধীরে আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল! সেই শেষ বিদায়,—আর কখনও আমার তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু।

"নাল্পে সুখমস্তি"।

হলমুখে বিদারিয়া কঠিন মাটিরে,
শস্যাঞ্জলি ঢালি পায় সম্ভারে সম্ভারে,
জলধির তল হ'তে রত্ন আহরিয়া
মনেরে সুধাল নর,—বিশ্ব অন্বেষিয়া
"কহ কি আনিব আর, হে প্রিয়া আমার"
মন কহে "ক্ষমতার সুখ ক্ষুদ্রতার!

চাহি না এ"। হর্ম্মে হর্ম্মে আবরি মহীরে
উৎকীর্ণ মণি ও শিলা প্রবালে মর্ম্মরে,
উন্নত গর্ব্বিত শির গগনে তুলিয়া
জগতের রূপস্বপ্নে দুয়ারে বাঁধিয়া
নর কহে "চাহ ফিরে" মন কহে "একি!
রূপ? এ যে স্বর্ণছায়া বিভ্রমের ফাঁকি!"
"চাহ এবে" কহে নর পঞ্চভূতে বাঁধি
"হায় এ যে অন্তযুক্ত" মন কহে কাঁদি।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

স্বর্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

পূর্ব্ববঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে ৺কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবন-কথা আলোচনা করিতে হয়। মাইজপাড়া বিক্রমপুরের একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানকার অতি প্রাচীন রায় উপাধিধারী জমিদারবর্গের নাম বহুকাল হইতেই বিখ্যাত। রায়-জমিদারগণ নানাস্থান হইতে কুলীন আনয়ন পূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান করিতেন। জমিদার ৺ রামকানাই রায় মহাশয় ফুলেমেলের ভরদ্বাজ গোত্রীয় বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান ৺ কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় নামক একজন অতি প্রসিদ্ধ স্বকৃতভঙ্গ কুলীনের নিকট স্বীয় কন্যা ৺ তিলোত্তমা দেবীকে সম্প্রদান করেন। এই তিলোত্তমা দেবীর গর্ভে মাতুলালয়ে মাইজপাড়া গ্রামে ৺ কাশীকান্ত আনুমানিক ১৮৩৯—৪০ খ্রীঃ অঃ ভূমিষ্ঠ হ'ন—জন্মের মাত্র ছয় মাস পরে ইঁহার মাতার মৃত্যু হয়—বৃদ্ধা মাতামহী দয়াময়ী দেবী ইঁহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন।

সে সময়ে দেশে বিদ্যাশিক্ষার তেমন সুযোগ ও সুবিধা ছিল না—বিশেষ কুলীন সন্তানের বিদ্যার আবশ্যকতাই বা কি? বহু বিবাহই তখন অতি উত্তম অর্থ সংগ্রহের পথ ছিল—তারপর মাতামহ রামকানাই রায় জামাতাকে যে ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন তাহার আয়ও সামান্য ছিল না, ক্ষুদ্র সংসার সুন্দররূপেই চলিতে পারিত। কিন্তু শিশু কাশীকান্ত গ্রাম্য বিদ্যালয়ের সামান্য শিক্ষা সমাপন

করিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মনের কথা মাতামহীকে বলিলেন। দয়াময়ী দেবী কিশোর কাশীকান্তের বিদ্যাশিক্ষার জন্য একান্ত আগ্রহ দেখিতে পাইয়া বিনা ওজরে সম্মতি দিলেন এবং সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। ঢাকা ব্যতীত অন্যত্র তখন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না। কাশীকান্ত ঢাকা হইতে ১৮৫৬-৫৭ খ্রীঃ অঃ সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়া উহা দুই বৎসর কাল ভোগ করেন—ইংরেজী সাহিত্যে সবিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া ইনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন ও বঙ্গভাষার জন্য এক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হ'ন।

স্বর্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়

ছাত্র-জীবনে নিজ অধ্যবসায় গুণে ইনি যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন—কর্ম্ম-জীবনেও তিনি স্বীয় দেশ-প্রীতি এবং কর্ম্ম-নৈপুণ্যে দেশের ও দশের

নিকট অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা প্রচারই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ইনি ১৮৫৯ খ্রীঃ অঃ ঢাকা পোগোজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষাদান-কৌশলে এই বিদ্যালয়ের বিশেষ খ্যাতি হয়। সে সময়ে ঢাকার অন্য কোন বিদ্যালয়ই পোগোজ স্কুলের ন্যায় খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার কার্য্য গ্রহণের অব্যবহিত পরে ১৮৫৯ খ্রীঃ অঃ অক্টোবর মাসে গভর্মেণ্ট তাঁহাকে আসামের অন্তঃর্গত শিবসাগর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন,—তখন যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা ছিল, সর্ব্বোপরি তাঁহার মাতৃস্থানীয়া মাতামহীর মত না হওয়ায় কাশীকান্তকে গভর্মেণ্টের এই সাদর প্রস্তাব ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রায় তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত পোগোজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার রায় (পি, কে, রায়,) এবং ঢাকা নগরীর সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র রায় মহাশয় ইঁহারই শিক্ষকতায় উক্ত বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। গুণের আদর চিরদিনই হইয়া থাকে। গভর্মেণ্ট কাশীকান্তের গুণের পুরস্কার স্বরূপ ১৮৬১ খ্রীঃ অঃ তাঁহাকে ঢাকা বিভাগের স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টারের পদে নিযুক্ত করেন। পোগোজ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার বিদায় গ্রহণ কালে পুরস্কার স্বরূপ সোণার ঘড়ি, ঘড়ির চেইন ও সুবর্ণ পদক প্রদান করেন।

গভর্মেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পর বঙ্গের নানা স্থানের বিদ্যালয়াদি পরিদর্শনান্তর দেশের প্রকৃত অভাব কোথায় তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। স্ত্রী-শিক্ষার অভাবে যে দেশ দিন দিন অবনত হইতেছে এ কথা তিনি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলেন—দেশের সর্ব্বত্র স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কাশীকান্তের কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার মার্টিন সাহেব ইঁহাকে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টারগণের উচ্চতম শ্রেণীতে উন্নীত করেন। এইবার তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ঢাকার সর্ব্বত্র স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন—স্ত্রী-শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি অসম্ভব এ কথা শিক্ষিত সমাজকে বুঝাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। কথা ও

কাজ এক সঙ্গে হইলে জনসাধারণ আপনা হইতেই সেইরূপ কর্ম্মী পুরুষকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকে, কাশীকান্ত এক দিকে যেমন জনসাধারণকে স্ত্রী-শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইতেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে আবার তেমনি ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল এবং বিক্রমপুরের নানা গ্রামে এবং ঢাকা জেলার নানাস্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সে সকলের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিলেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অঃ ইনি রাজসাহী বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন, ঢাকা পরিত্যাগ করিবার সময় উক্ত ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষকগণ তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন পাঠকগণের কৌহতূল নিবারণার্থ এখানে তাহার অবিকল প্রতি-লিপি প্রদত্ত হইল।

বহুমান্যাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় এ জিলার ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর

মহাশয় সদন্তঃকরণেষু।

মহাশয়

আপনি এ দেশীয় জনসাধারণের যেরূপ বান্ধব, আপনার স্থানান্তর গমন সংবাদ ব্যক্তি মাত্রেরই নিতান্ত দুঃখকর হইয়াছে। কেবল উন্নত পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন ইহাই নিতান্ত আহ্লাদের বিষয়। আপনি কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এ দেশীয় লোকদিগের হিতসাধনকল্পে যেরূপ চেষ্টিত ছিলেন তাহা স্মরণ করিলে কাহার না অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা রসে পরিপূরিত হয়। আপনার যত্নেই এ অঞ্চলের পল্লীগ্রামে বালিকা বিদ্যালয় প্রথম সংস্থাপিত হয়, এবং আপনার যত্নেই এইক্ষণ স্ত্রীশিক্ষার প্রথা বাহুল্যরূপে প্রচলিত হইতেছে। আমাদের এই বিদ্যালয়টীও যে আপনার হস্তের এক প্রধান চিহ্ন তাহা বলা বাহুল্য। আমরা আপনার যত্নের প্রসাদেই একত্র সম্মিলিত হইয়া নিরাপদে বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছি। আপনার এই কার্য্যটী স্ত্রীশিক্ষা-বান্ধবজনগণের যে কি পর্য্যন্ত প্রীতিপ্রদ ও স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতিসাধক তাহা বলিয়া উঠা দুষ্কর। আপনি সময়ে সময়ে এই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া সস্নেহ সম্ভাষণে নানাপ্রকার নীতি ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশে আমাদিগকে যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহার প্রতিক্রিয়া আমরা কি করিব।

কেবল স্মরণার্থ মনের আহ্লাদে, এই অভিনন্দন পত্রখানি আপনার হস্তে প্রদান করিয়া, বিনীতভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, হে জগদীশ্বর তুমি এই দেশ-হিতৈষী-মহানুভব মহোদয়কে নিরাপদে রাখিয়া দীর্ঘজীবী কর।

অপর ফটোগ্রাফ্ দ্বারা আপনার একটী প্রতিমূর্ত্তি আমাদের স্কুল গৃহে রাখার একান্ত বাসনা। ইহার ব্যয় আমরা চাঁদা করিয়া উঠাইয়াছি। ভরসা করি স্নেহবশতঃ এবিষয়ে আপনি অনুমোদন করিবেন।

সন ১৮৬৫ ইং ২১ শে অগষ্ট । ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল } শ্রীমতী রাধামণি দেবী প্রথম শ্রেণী শ্রীমতী পরাণমণি প্রথম শ্রেণী

শ্রীমতী সরস্বতী প্রথম শ্রেণী শ্রীমতী বিদ্যামণি প্রথম শ্রেণী শ্রীমতী হরিপ্রিয়া প্রথম শ্রেণী শ্রীমতী সুমিত্রা দ্বিতীয় শ্রেণী

শ্রীমহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল বিদ্যালয়। শ্রীমতী ফেলি খ্রীষ্টয়ানী। ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলের অন্যান্য ছাত্রীগণ।

রাজসাহী বিভাগের অস্থায়ী ইন্‌স্পেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া সেখানেও স্বীয় প্রতিভাবলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই জনসাধারণের মনোরঞ্জন করেন এবং রামপুর বোয়ালিয়ায় চন্দ্রনাথ ফিমেলস্কুল, কাঁকিনা ফিমেলস্কুল, তুষভাণ্ডার ফিমেলস্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয় সমূহ স্থাপন করেন। এইরূপে সর্ব্বত্র তাঁহার জ্ঞানবিস্তার চেষ্টা বিশেষরূপে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। সরকার বাহাদুর তাঁহার কার্য্যাবলী দৃষ্টে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া জমীদারীর অধীনস্থ স্থান সমূহে শিক্ষার অবস্থা কিরূপ এবং কিরূপে তাহা উন্নত করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য আদেশ করেন। কালীকান্তের এ কার্য্যে সরকার বাহাদুর এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে দেশীয় রাজ্য কুচবিহারের শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ অর্থাৎ ডিরেক্টার নিযুক্ত করেন। ১৮৭২ খ্রীঃ অঃ এই পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৮০ খ্রীঃ অঃ অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদেই নিযুক্ত ছিলেন। কুচবিহারের কার্য্যের সময় তিনি স্বর্গীয় কুচবিহারাধিপতি মহারাজাধিরাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর জি, সি, এস, আইর অভিভাবক ও গৃহশিক্ষক ছিলেন। কালীকান্ত তেজস্বী, সুবক্তা অথচ অত্যন্ত বিনীত প্রকৃতির

লোক ছিলেন। বর্ত্তমান কুচবিহার রাজ্যের শিক্ষার উন্নতির মূলে কাশীকান্তের অসামান্য প্রতিভা-কৌশল কতখানি নিয়োজিত ছিল তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

কাশীকান্ত বিক্রমপুরের অতীত যুগের এক মহা মনীষী পুরুষ, দেশের প্রকৃত অলঙ্কার। বিক্রমপুরের শিক্ষার উন্নতিকল্পে ইনি অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন তাহা চিরদিন দেশবাসী শিক্ষিত নর-নারীর হৃদয়ে জীবিত থাকিয়া তাঁহার গৌরব-স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিবে।

বেণুবতী *

এক রাজা। তার চারিপুত্র এক কন্যা। কন্যার নাম বেণুবতী। রাজা রাণী কন্যাকে বড়ই স্নেহ করেন—ছেলেদের চেয়েও মেয়ের আদর ও যত্ন খুব বেশী। বেণুবতী পরমা রূপবতী। চারি ভাই বাপ মা সকলেরই সে আদরের ধন। বেণুর যেমন রূপ—স্বভাবও তেমনি সুন্দর। সে ভাইদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া শিকারে যায়, খেলা করে, লেখাপড়ার চর্চ্চা করে। এক কথায় রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। মানুষের চিরদিন সমান যায় না। রাজা রাণী চারিছেলে, ছেলের বৌ ও মেয়ে নিয়ে পরমসুখে কাল কাটাইতেছিলেন, কিন্তু বিধাতার এত সুখ সহিল না। এক দিন রাজা মৃগয়ায় যাইয়া প্রাণ হারাইলেন। রাজার শোকে রাণীও অল্পদিনের মধ্যেই মারা গেলেন। এ ঘটনাগুলি ঝড়ের মত দ্রুতবেগে ঘটিয়া গেল।

রাজ-বাড়ীতে লোকজন দাস-দাসী চাকর চাকরাণীর অভাব নাই তবু কিন্তু বেণুর আর সে সুখ সে আনন্দ নাই। পিতা মাতার মৃত্যুতে বেণুর মুখের হাসি লোপ পাইয়াছে, পূর্ব্বের মত তাহার আর সে হাসি খুসি আমোদ প্রমোদ কিছুই নাই, সে মনের দুঃখে দিন কাটায়। এদিকে বড় রাজপুত্র রাজা হইলেন আর ছোট তিন ভাই যুবরাজ হইয়া নানা কাজে নানা স্থানে যাইতে লাগিলেন।

* বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত উপকথা

একবার চারি ভাই একত্রে মৃগয়া করিতে গেলেন—বেণুবতী বধূগণের সহিত রাজপুরীতে রহিল।

বেণুর এক সই ছিল তার নাম ছিল রূপমতী। রূপমতী এক বণিকের স্ত্রী। বণিকের ধন-দৌলত ও ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। রূপমতী তার মেয়ের বিয়েতে সই বেণুবতীকে নিমন্ত্রণ করিল। বেণুবতীকে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ তাহার পরিবার একখানা ভাল বারাণসী সাড়ি পরাইয়া সাজাইয়া বলিলেন—'বেণুবতী সাবধান! যদি আমার এ কাপড়ে এক তিলও ময়লা ভরে তা'হলে তোমার রক্ষা নেই।' বেণুবতী সইর বাড়ী যাইয়া অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিল এবং সকলকে বলিল যে 'আমার কাপড়ে যেন ময়লা না লাগে, তোমরা সেদিকে একটু নজর রেখো। যদি ময়লা লাগে তবে আমার আর রক্ষা নেই।' বেণুবতীর এমন ভয়ের কথা শুনিয়া একটা ছোট্ট মেয়ে দুষ্টুমি করিয়া একটা খড়্‌কায় করিয়া বেণুর কাপড়ে খানিকটা চুণ লাগাইয়া দিল। বেণুবতী ইহার কিছুই জানিল না। সে বাড়ী ফিরিয়া অন্য কাপড় পরিয়া বড় বৌ'দির সাড়ী খানা তাহাকে ফিরাইয়া দিল। বড় বৌর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র দাগটি ও এড়াইল না, কাপড়ের সে দাগ যেমন দেখা অমনি সে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বেণুবতীকে প্রহার করিতে লাগিল। বেণু কত কাঁদিল, কত মিনতি করিল কিন্তু কোন ফলই হইল না। বড় তিন বৌ একত্র হইয়া বেণুবতীকে প্রহার করিতে করিতে মারিয়া ফেলিল এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কুটিয়া মাংসগুলি একটা নির্জ্জন স্থানে ফেলিয়া দিল। ফেলিয়া দেওয়ার কিছুকাল পরে সে স্থানে একটা ঝুম্‌কো লতার গাছ হইল। গাছটি সবুজ পাতায় রাশি রাশি ফুলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

বেণুবতীর মাসীমা অনেক দিন পরে রাজবাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া বেণুর মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন। এ সংবাদে তাঁর যারপরনাই কষ্ট হইল। হায়! হায়! অনাথা মেয়েটি! বেণুর মাসীমা বেণুর জন্য শোক-প্রকাশ করিতে করিতে রাজোদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে বাগানের এক পাশে ঐ ঝুম্‌কো লতার গাছটি দেখিতে পাইলেন। সুন্দর ফুলগুলি দেখিয়া যেমন তিনি ফুল তুলিতে হাত বাড়াইয়াছেন অমনি গাছটি বলিয়া উঠিল,—

'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা মোরে আমি ঝুম্‌কো লতা।
রাজকন্যা বেণুবতী সহি মর্ম্ম-ব্যথা॥

কাপড়ে লাগিল চূণ হৈল প্রাণ-নাশ।
বিধি বাম হৈল তাই মোর সর্ব্বনাশ॥'

মাসীমা বৌদের কাছে ঝুম্‌কো লতার এই আশ্চর্য্য কথা বলিলেন, তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিল এবং ঝুম্‌কো লতার সে গাছটিকে কাটিয়া ফেলিল। কিন্তু আবার ঠিক্ সে যায়গায় একটি ডালিম গাছ হইল। এবং দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যেই সে গাছে খুব বড় বড় ডালিম ফলিল। এবার রাজ-বাড়ীতে বেণুর পিসীমা বেড়াইতে আসিলেন। পিসীমা বেণুর জন্য খুব কাঁদিলেন, হায়! হায়! পিতৃ-মাতৃহীনা মেয়েটি, তার অদৃষ্টে এই ঘটিল! পিসীমাও একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে সেই ডালিমতলার নিকট আসিলেন। বড় বড় লাল টুক টুকে ডালিম ছিঁড়িবার জন্য যেমনি হাত বাড়াইয়াছেন—অমনি মানুষের ন্যায় গাছ বলিয়া উঠিল,—

'ছুঁয়োনাগো পিসীমা! আমি বেণুবতী
কর্ম্মদোষে গাছের বেশে কাটাই দিবা রাতি॥
কাপড়ে লাগিল চূণ কৈল প্রাণ নাশ।
বিধি বাম হৈল তাই মোর সর্ব্বনাশ॥'

পিসীমাও আশ্চর্য্য হইয়া বৌদের কাছে এ গল্প বলিলেন। আগের মত এবারও তাহারা কথাগুলি হাসিয়া উড়াইয়া দিল। নানা মিথ্যা ছলে ভুলাইয়া পরদিনই তাহারা পিসীমাকে বিদায় দিবার ব্যবস্থা করিল। আর বড় বৌ তাড়াতাড়ি গাছটা কাটিয়া ফেলিল। ডালিম গাছটার যায়গায় এবার জন্মিল একটা মরিচ গাছ। এবার মামী বেড়াইতে আসিলেন। বেণুর মামী বেণুর জন্য নানা ছাঁদে কথার ফাঁদে বিনাইয়া বিনাইয়া কত কাঁদিলেন। হায়! হায়! অনাথা অভাগা মেয়েটি ফুলের মত অকালে ঝরিয়া গেল, কি দুঃখ! কি কষ্ট! মাসী পিসীর মত বেণুর মামীও একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে বাগানের সেই মরিচ গাছটি দেখিতে পাইলেন। খুব বড় বড় মরিচ ফলিয়াছে। বেণুর মামী কয়েকটি মরিচ ছিঁড়িবার জন্য যেমনি হাত বাড়াইয়াছেন অমনি গাছটি বলিয়া উঠিল,—

'কি কর! কি কর মামি! আমি বেণুবতী
মা নাই বাপ নাই বলে আমার দুর্গতি॥

কাপড়ে লাগিল চূণ কৈল প্রাণ-নাশ।
বিধি বাম হ'ল তাই মোর সর্ব্বনাশ ॥'

মামী চলিয়া গেলে আবার তিন বৌ মিলিয়া ঐ গাছটা কাটিয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দিল। সে পুকুরে একটী অতি সুন্দর লাল পদ্ম ফুটিয়া রহিল। কিছু দিন পরে বেণুর মাতুল আসিলেন এবং ঐ পুকুরে স্নান করিতে যাইয়া ঐ সুন্দর পদ্ম ফুলটি দেখিয়া উহা ধরিবার জন্য যেমন হাত বাড়াইয়াছেন অমনি ফুলটি বলিয়া উঠিল,—

'ছুঁয়োনা-ছিঁড়োনা মামা আমি বেণুবতী।
ভাই সব দেশে নাই তাই এ দুর্গতি ॥
কাপড়ে লাগিল চূণ কৈল প্রাণ-নাশ।
বিধি বাম হৈল তাই মোর সর্ব্বনাশ ॥'

মামা বধূদের নিকট ফুলের এ আশ্চর্য্য কথা বলিলেন এবং বেণুর জন্য আক্ষেপ করিয়া দেশে চলিয়া গেলেন।

এক বৎসর পরে রাজ-পুত্রগণ নানা দেশ বিদেশ ঘুরিয়া মৃগয়া করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। রাজধানীতে আনন্দ-লহরী ছুটিয়া চলিল। বাড়ী আসিয়াই তাঁহারা সকলে বেণুর খোঁজ করিলেন। তিন বৌ বলিল 'কি বল্‌বো গো কি বল্‌বো! হঠাৎ মাথার বেদনায় বেণু মারা গেল!' রাজপুত্রেরা বলিলেন,—'মন্ত্রীকে কেন খবর দেওয়া হইল না? রাজ-বৈদ্য কেন আসিল না!' বেণুর কথা নিয়া মহা তোলপাড় পড়িয়া গেল। হাঁক ডাক ধূমধাম বেণু কেমন করিয়া মরিল! ছোট রাজপুত্রের বৌটি খুব ভাল ছিল—সে বেণুকে খুব ভালবাসিত কিন্তু জায়েদের ভয়ে সব কথা এতদিন চাপিয়া গিয়াছিল, এখন সুযোগ বুঝিয়া ছোট রাজপুত্রের কাছে গোপনে সব কথা বলিয়া দিল। এদিকে বড় তিন বৌ বিপদ বুঝিয়া তাড়াতাড়ি পুকুর হইতে পদ্মটি লইয়া আসিলেন এবং পাপড়িগুলি ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। যেমন মাটিতে ফেলা অমনি সেখান হইতে একটী টিয়া পাখী উড়িয়া পালাইল।

একদিন চার ভাই এক যায়গায় বসিয়া আহার করিতেছেন। এমন সময়

সেখানে ছাতের এক পাশে একটা টিয়া পাখী উড়িয়া আসিল এবং বলিতে লাগিল,—

"আসিয়াছ চারি ভাই সুখে কর বাস।
অভাগিনী বেণুবতীর পাখী দেহে বাস॥
রাজার নন্দিনী আমি রাজার ভগিনী।
কত দুঃখ পাইলাম আমি অভাগিনী॥

পাখীর কথা শুনিয়া রাজপুত্রগণ চমকিয়া উঠিলেন। পাখী এ কি বলিতেছে! ছোট রাজপুত্র তাড়াতাড়ি ভাত ফেলিয়া ছাতে উঠিয়া পাখীটি ধরিতে গেলেন এবং ধরিবার জন্য হাত বাড়াইবামাত্র আপনা হইতেই পাখীটি আসিয়া তাহার হাতে বসিল। ছোট রাজপুত্র পাখীটিকে লইয়া যাইয়া ছোট বৌর হাতে দিলেন। ছোট বৌ তাড়াতাড়ি ঘরের দরোজা বন্ধ করিয়া পরিষ্কার সুবাসিত জলে পাখীটিকে স্নান করাইয়া শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা যেমন তাহার গা মুছাইয়া দিবেন অমনি কোথায় গেল পাখী? ছোট বৌ দেখিলেন রূপে ঢল ঢল সোণার কমল বেণুবতী তাহার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। বেণুবতী ছোট বৌর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাদাদের প্রণাম করিল। সকলে আনন্দে অধীর। দেশশুদ্ধ লোক চমৎকৃত। বৃদ্ধ মন্ত্রী দেখিয়া সব কথা শুনিয়া অবাক্! কি আশ্চর্য্য! এত আশ্চর্য্য ঘটনা সে তাহার কিছুই শোনে নাই। বেণুবতী ভাইদের কাছে একে একে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সব কথা বলিল। তাহার কথা শুনা মাত্রই সেই রাক্ষসী তিন বৌকে রাজপুত্রেরা বনবাস দিলেন, চারিভাই ও বেণুবতী মহাসুখে দিন কাটাইতে লাগিল। ছোট বৌ বেণুকে ছোট বোনটীর মতই যত্ন করিতেন। ভাইরা আর বেণুকে চোখের আড়াল করেন না। বড় তিন ভাই আবার তিন সুন্দরী ও গুণবতী রাজকন্যা বিবাহ করিলেন। আর এদিকে রূপবান্ ও গুণবান্ মন্ত্রী পুত্রের সহিত গুণবতী বেণুবতীর বিবাহ হইল। চারিভাই স্নেহের ছোট বোনটিকে ধন, রত্ন, দাস দাসী কত যে যৌতুক দিলেন সে কি আর বর্ণনা করা যায়! দারুণ কাল মেঘ কাটিয়া সুখের পূর্ণচন্দ্র হাসিয়া উঠিল। বেণুর সুখে রাজ্যের ছোট বড় সকলে সুখী হইল।

অন্তিম প্রার্থনা

সুখ শান্তি হ'ল শেষ, অন্তিম শয্যায়
একাকী নিরালা পড়ে কাঁদি হায়, হায় !
সব গেছে খোকা সনে, মরণের তীরে
আমিও চলেছি সেথা অতি ধীরে ধীরে ।
সুখ দুঃখ কত শত
উথলিছে অবিরত,
যাই তবে চলে যাই,
খোকা আছে যেই ঠাঁই ;
থাক্ খুকু, থাক্ খুকী
হ'স্ তোরা চিরসুখী
বিপদ কাটিয়া শান্তি আসুক আবার,—
রক্ষ দুর্গে দয়াময়ি, দয়ার আধার ।

* * * * * *

শেষ হ'ল রাত্রি দিন,
হস্ত হ'তে খসে বীণ্,
অন্ধকারে ডুবে যাই কোথায় একেলা,
হল বুঝি শেষ আজি সংসারের খেলা !
দুর্গা জগতের সার,
করি তোমা নমস্কার,
ধ্যানময়ী প্রাণময়ী জননী সবার,
হও আবির্ভূতা মাগো অন্তরে আমার ।

শ্রীমতী চারুবালা দেবী

বিক্রমপুর-প্রসঙ্গ

'বিক্রমপুর'-সম্পাদক মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বিক্রমপুরের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথার অবতারণা করিলাম। আমার লেখনী অক্ষম হইলেও আমি বিক্রমপুরবাসী ও বিক্রমপুরের গৌরবে গৌরবান্বিত, সুতরাং ভরসা আছে যে আমি যে কয়েকটি কথা বলিব, তাহা বিপক্ষের ছিদ্রান্বেষণতৎপরতা-প্রসূত বিবেচিত না হইয়া প্রকৃত হিতৈষীর উন্নতি কামনা প্রণোদিত বলিয়া গৃহীত হইবে।

নদীমেখলা বিক্রমপুর খাল বিলের দেশ। বর্ষায় সমগ্র দেশ জলপ্লাবিত হয় এবং প্রত্যেক বাড়ী সলিলপরিবেষ্টিত দ্বীপখণ্ডে পরিণত হইয়া অভিনব দৃশ্যের সৃষ্টি করে। ইহাই বিক্রমপুরের প্রাকৃতিক বিশেষত্ব। সকলেই সন্তরণপটু, সকলেরই ছোট ছোট ডিঙ্গি আছে, এবং অনেক ভদ্রলোক স্বহস্তে নৌকাচালনে অভ্যস্ত। বঙ্গদেশের যে সকল প্রদেশে জলের এতটা প্রাদুর্ভাব নাই, তথায় বাঁধা রাস্তাঘাটের যেরূপ প্রাচুর্য্য আছে, বিক্রমপুরে তাহার নিতান্ত অভাব। দুই একটি বড় রাস্তা ব্যতীত মাঠের আল-ই যাতায়াতের একমাত্র উপায়। সুতরাং অশ্ব, অশ্ব অথবা গোশকট, ও দ্বিচক্রযান বিক্রমপুরে একেবারেই দৃষ্টিগোচর হয় না। শতবর্ষ পূর্ব্বে বিক্রমপুরের মাঠগুলিতে কার্পাস ও কুসুমফুল, এবং অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ধান্যশীর্ষগুলি দর্শকের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিত। তৎস্থলে এখন দীর্ঘ পাটগাছসমূহ এক অশোভন বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছে। যখন পাট কাটিয়া জলে ভিজান হয়, তখন খাল, নালা, ডোবা প্রভৃতির জল দুর্গন্ধ ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, এবং তাহা সেবনে বহুবিধ রোগের সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালীগুলি (পোড়াগঙ্গা, মিরকাদিম ও তালতলার খাল প্রভৃতি) ভরিয়া আসিতেছে, তাহাতে জলনির্গমন ও যাতায়াতের ব্যাঘাত হইতেছে। মুন্সীগঞ্জ লোকালবোর্ড আবশ্যক হইলে সরকারী সাহায্য লইয়া একটি মাটিকাটা জাহাজ (dredger) কিনিলে এবং প্রতি বৎসর খালের মুখগুলি পরিষ্কার করিয়া দিলে বোধ হয় এই অসুবিধা নিরাকরণ হইতে পারে। টেলার সাহেব কৃত

Topography of Dacca নামক পুস্তকে দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আইরল বিল একটি বিশাল হ্রদ ছিল। ফরিদপুরের ঢোলসমুদ্রের ন্যায় সেই বিলের গৌরবও এখন অস্তমিত প্রায়। ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলায় এখনও যেরূপ উৎকৃষ্ট দীর্ঘিকা বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান, বিক্রমপুরে উচ্চভূমির অভাব-বশতঃ কোনকালে তদ্রূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যাহাও ছিল তাহা কাল-প্রভাবে কর্ষিত ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ফারগুসন সাহেব যখন বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধের মধ্যমভাগে বল্লালবাড়ী দেখিতে আসেন, তখনও দীঘিটি একটি বিরাট জলাশয় ছিল—বঙ্গদেশের অন্য কুত্রাপি এত বড় দীঘি তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। এখন তাহা সম্পূর্ণ শুষ্ক। কীর্ত্তিনাশা রাজবল্লভের শতরত্ন কুক্ষিগত করার পর বিক্রমপুরে আর নূতন কোন কীর্ত্তি রচিত হয় নাই। রাজাবাড়ীর মঠ ব্যতীত বিক্রমপুরে স্থাপত্যের কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নাই। সলিলপরি-বেষ্টিত বিক্রমপুরের মৃত্তিকা কোন বৃহৎ হর্ম্ম্যের ভিত্তিস্থাপনের অনুপযুক্ত, পদ্মার গতিও বিচিত্র, এবং নিয়ত দেশবাসী ধনী ও জমিদার বিরল, এই কারণত্রয়ের সমবায়ে পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম সমূহের ন্যায় বিক্রমপুরে সৌধবহুল কোন গ্রাম শীঘ্র দেখা যাইবে বলিয়া বোধ হয় না।

সৌভাগ্যের বিষয় বিক্রমপুরে ম্যালেরিয়া এখনও প্রবেশ করে নাই। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, বর্ষাকালে মাঠ ঘাট এমন কি গৃহস্থের আঙ্গিনা-পার্শ্বস্থ আবর্জ্জনা স্রোত-জলে বিধৌত হইয়া যায়। বর্ষার প্রারম্ভে ও শেষে মাঠগুলি কর্দ্দমাক্ত হইয়া যাতায়াতের বিশেষ বিঘ্ন জন্মায়। কার্ত্তিকমাসে মাঠের জল শুকাইতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে পুষ্করিণীর জলও কমিতে থাকে এবং তৎপরই জল-কষ্ট আরম্ভ হয়। বলাবাহুল্য, ইহাতে নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়। গ্রীষ্মকালে ওলাউঠায় এবং বর্ষাকালে সর্পাঘাতে বহু লোক প্রাণ-ত্যাগ করে। বসন্তও মাঝে মাঝে দেখা দেয়। শীতের দুই মাস বিক্রমপুরের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে, তখন আহার্য্যও ভাল পাওয়া যায়, এবং মাঠের দৃশ্যও সুন্দর, উজ্জ্বলপীতাভসর্ষপপুষ্পগন্ধসুবাসিত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে ভ্রমণ বড়ই চিত্তপ্রফুল্লকর। বিক্রমপুরস্থ যে সকল প্রবাসী ভদ্রলোক ছুটি লইয়া নানা স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে যান, তাঁহারা ঐ সময় স্বদেশে ও স্বগ্রামে থাকিলে নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যোন্নতি লাভ করিতে পারেন।

আদমসুমারির বিবরণ হইতে দেখা যায়, বিক্রমপুরে যেরূপ ঘন বসতি এরূপ বঙ্গদেশের আর অল্পস্থানেই আছে। পূর্ব্ববঙ্গের এক বিক্রমপুর পরগণায়ই হিন্দুগণ সংখ্যায় মুসলমানদিগের নিকট একান্ত পরাভূত নহে। ভদ্র ও ইতর শ্রেণীর অনুপাত পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বিক্রমপুরে ভদ্রশ্রেণীর অধিকতর অনুকূল। এই কারণেই বিক্রমপুরে ইংরাজী বিদ্যালয়, ডাকঘর, ও টেলিগ্রাফ আফিসের এত বাহুল্য। উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা কলিকাতার সমীপবর্ত্তী উপগঙ্গ প্রদেশের সমতুল্য। শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে বঙ্গদেশের অন্যান্য সর্ব্বত্র যেরূপ বৈদ্যগণ সর্ব্বাগ্রগণ্য, তৎপর কায়স্থ, তৎপর ব্রাহ্মণ, বিক্রমপুরেও এই অনুপাতের বৈলক্ষণ্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না। সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য হীয়মান। সমাজের উচ্চশ্রেণীসমূহের মধ্যে সমবেত কার্য্যচেষ্টা নাই বলিলেই হয়। একটি 'ব্রাহ্মণসভা' আছে, তাহার প্রযত্ন কতদূর দেশের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত তাহা বলা কঠিন। এই শ্রেণীর অন্যান্য সমিতির ন্যায় শিখার দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে গবেষণায় সভার শক্তি অযথা ব্যয়িত হইতে পারে এই আশঙ্কা অনেকে অমূলক বলিয়া বিবেচনা করেন না। উচ্চজাতিদিগের মধ্যে পরস্পর ভেদজ্ঞানবৃদ্ধিদ্বারা একতার অন্তরায় সৃজন করাও ইহার অনিচ্ছাকৃত গৌণফল দাঁড়াইতে পারে। সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের মধ্যে বারুজাতি, তিলি ও সাহা জাতি উন্নতিশীল, তবে, শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে অর্থশালী লোকের অভাব না থাকিলেও বিদ্যাচর্চ্চা এখনও ভালরূপ আরম্ভ হয় নাই। ফরিদপুর জেলার ন্যায় নমঃশূদ্রগণ এখানে সংখ্যায় বহুল হইলেও তদ্রূপ দলবদ্ধ ও উন্নতিশীল নহে। নমঃশূদ্রদের মধ্যে অনেকে সূত্রধরের ব্যবসা ধরিয়াছে। যোগীগণের মধ্যে অনেকে দোকানদারী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। গোপদিগের অবস্থা ভাল। প্রান্তবর্ত্তী চর-অঞ্চলবাসী চণ্ডাল ও মুসলমানদিগের অবস্থা খুব ভাল, কিন্তু বিক্রমপুরের অভ্যন্তরে কৃষক সম্প্রদায়ের জোতগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হওয়ায় তাহারা হীনদশাপন্ন। আবার দেশে কোন বড় জমিদার না থাকায় প্রজাবর্গের মধ্যে স্বাধীনতার ভাব প্রবল, ক্ষুদ্র তালুকদারদিগের ভয়ে তাহারা ভীত নহে।

বিক্রমপুরের আর একটি বিশেষত্ব এই যে এখানকার ভদ্রলোকগণ যেরূপ চাকরীগতপ্রাণ, বঙ্গদেশের অন্য কোথায়ও এরূপ নহে। বড়লাট কর্জ্জন

বাহাদুর বঙ্গবিচ্ছেদের প্রাক্কালে এবিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্ববঙ্গের আদমসুমারীর বিবরণীতেও ইহার উল্লেখ আছে। ডাকঘরের যোগে যত টাকা বিদেশে প্রেরিত হয় এবং বিদেশ হইতে বিক্রমপুরে আগত হয়, এতদুভয়ের মধ্যে এত প্রভেদ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জোতখামার প্রায় কাহারও নাই, জমিদার শ্রেণীরও একান্ত অভাব। বৎসর পঞ্চশত মুদ্রা আয়ের ভূসম্পত্তি অল্প লোকেরই আছে। ইহা যদিও এক হিসাবে বিক্রমপুরবাসীর ধীশক্তির তীক্ষ্ণতা-বৃদ্ধির হেতু, অন্য হিসাবে আবার ইহা বিক্রমপুরসমাজকে একটি বৃহৎ প্রবাসী সমাজ করিয়া তুলিয়াছে। খাঁটি গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোক বিরল হইয়া উঠিয়াছে। গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ প্রথার উন্নতিকল্পে সরকার বাহাদুরের চেষ্টা সফল হওয়ায় ইহা এক বিশেষ অন্তরায় স্বরূপে দাঁড়াইয়াছে। নবীনচন্দ্র সেনের আত্মজীবনী পাঠে দেখা যায় বিখ্যাত নবদ্বীপসমাজ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রবাসী হইয়া দেশের উন্নতির কি ঘোরতর ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছে। বিক্রমপুরসমাজ অর্থনৈতিক কারণ প্রভাবে সেইরূপ ভিন্নদেশবাসী হইয়া হীনবল হইয়া পড়িতেছে, কারণ দেশের প্রতি লোকের মমত্ব কমিতেছে এবং দেশের উন্নতিকল্পে সম্মিলিত চেষ্টার বিঘ্ন ঘটিয়াছে।

বিক্রমপুরবাসিগণ বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশের ভাষাকে উপহাস করেন বটে, কিন্তু আমি দেখিয়াছি ঐ সকল দেশবাসী ভদ্রলোকগণ আমাদের অপেক্ষা সহজে শান্তিপুর অথবা কলিকাতার প্রচলিত ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন। বস্তুতঃ বিক্রমপুরের কথিত ভাষা অতি শ্রুতিকটু, ইহা আমাদিগকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেই হইবে। টেলার সাহেবের গ্রন্থে দেখা যায় তাঁহার সময়েও ঢাকার বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলী কলিকাতার ভাষার অনুকরণ করিতেন। আমাদিগকে 'বাঙ্গাল' বলিলে আমরা আত্মসমর্থনের জন্য বলি যে, আমাদের কথোপকথনের ভাষা পশ্চিমবঙ্গের প্রচলিত ভাষা অপেক্ষা লিখিত সাধুভাষার অধিকতর অনুগামী। ইহা সামান্য পরিমাণে সত্য হইলেও, শিক্ষিত বিক্রমপুরবাসীর কথোপকথনের ভাষার উন্নতিসাধনের প্রয়াস করা সঙ্গত। বঙ্গবিচ্ছেদ রহিত হওয়ায় পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং এখন এ বিষয়ে সুযোগের অভাব নাই। আমাদের ভাষার প্রাদেশিকতার একটি গৌণফল এই যে, বিক্রমপুরবাসী কেহ ভাল ঔপন্যাসিক হইতে পারেন

না। কারণ dialogue বা কথোপকথন উপন্যাসের প্রাণ, কিন্তু আমাদের পক্ষে নভেলের কথোপকথনের ভাষাও সাধুভাষার ন্যায় কৃত্রিম অর্থাৎ আয়াসলব্ধ বলিয়া dialogue জমিয়া আসে না। স্কট ও বার্ণসের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন লেখক প্রাদেশিক ভাষাকে ক্ষণিক অমরত্ব দিতে পারেন বটে, কিন্তু স্কটলণ্ডে এবং ইংলণ্ডে ভদ্রলোকের কথোপকথনের ভাষা একই। আমাদেরও সর্ব্বত্র ভদ্রলোকের কথোপকথনের ভাষা এক হওয়া সঙ্গত।

বিক্রমপুর এক সময়ে বঙ্গীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সভ্যতা বিক্রমপুর ছাইয়া ফেলিয়াছিল। বিক্রমপুর বর্ম্ম ও সেনরাজগণের রাজধানী ছিল। বৈবাহিক আদান প্রদান সূত্রে বিক্রমপুর ও ব্রহ্মরাজ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। অতীষ দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান, হলায়ুধ প্রভৃতি মনীষিগণের জন্মস্থান বিক্রমপুর। সুতরাং বিক্রমপুর যে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চ্চার জন্য খ্যাতিলাভ করিবে তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু যাঁহার জন্ম দ্বারা লেখকের স্বগ্রাম গৌরবান্বিত হইয়াছে, সেই দেশবিশ্রুত পণ্ডিত কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম মহাশয়ের লোকান্তর হওয়ার পর তাদৃশ বড় পণ্ডিত বিক্রমপুরে জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই। যে কয়েকটি টোল আছে, তাহাদের অবস্থা ভাল নহে এবং তাহাদের আদর্শও প্রাচীন টোলের আদর্শের তুলনায় হীন।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত ও বহির্ভূত অনেক স্থানে নানা জেলাবাসী বাঙ্গালীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া এবং তাহাদের আলাপ ব্যবহার রীতিনীতি লক্ষ্য করিয়া আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গবাসিগণ—অর্থাৎ অনুগঙ্গ প্রদেশবাসী বাঙ্গালীগণ—বিনয়, সৌজন্য, আত্মনির্ভরতা, দূরদর্শিতা, মিতব্যয়িতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি কতকগুলি গুণসম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পোষাক পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা, বাক্যবিন্যাসপটুতা প্রভৃতি বিষয়েও তাহাদের মধ্যে একটি সুসঙ্গত, শোভনশীলতা ও সুরুচির আভাস পাওয়া যায় যাহা এতদ্দেশে খুব সুলভ নহে। জনৈক বহুদর্শী পরিব্রাজকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা চিরকালই ভাগীরথীর তটানুগামী। অবশ্য একটি সমগ্র পরগণা সম্বন্ধে এরূপ একটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে গেলে তাহার বহুতর ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মোটের উপর আমার ধারণা এই যে, culture বা সভ্যতার

বাহ্যিক অঙ্গ পশ্চিমবঙ্গীয়েরা আমাদের অপেক্ষা অধিকতর আয়ত্ত করিয়াছে। প্রত্যুত্তরে অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে, তাহাদের আন্তরিকতা, সহৃদয়তা, সত্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা ও উদ্যমশীলতা আমাদের অপেক্ষা কম। ত্যাগপরায়ণতা ও পরার্থপরতা প্রভৃতি উন্নত গুণগ্রাম যে আমাদের অপেক্ষা তাহাদের কম ইহার কোন লক্ষণ আমি দেখিতে পাই না। পশ্চিমবঙ্গে আমি এবং আমার বন্ধুবর্গ সহৃদয়তার এত নিদর্শন পাইয়াছি যে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি তদ্দেশবাসীদের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারা তাহাদিগকে হৃদয়হীন বলিতে নিশ্চয়ই দ্বিধা করিবেন। পশ্চিমবঙ্গে ভদ্রমহিলাদের সাড়ী-পরিধান প্রণালী অবশ্য নিন্দনীয়, কিন্তু তথায় এখন সেমিজ কামিজ পরিধান-প্রথা আমাদের দেশ অপেক্ষা অধিকতর প্রচলিত। সভ্যতার 'বাহিক্য অঙ্গ' বলিতে আমি এই বুঝাইতে চাহিনা যে তাহা অনাবশ্যক অথবা বিশেষ প্রশংসার্হ নহে। কতকগুলি মানসিক বৃত্তি আছে যাহা অবশ্যই সর্ব্বোপরি স্থান পাওয়ার যোগ্য, কিন্তু আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে যাহা তাহাদের নিম্নেই প্রতিষ্ঠিত, এবং জীবনযাত্রার হিসাবে তাহাদের মূল্য ও আবশ্যকতা কম নহে। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং,' 'cleanliness is next to godliness' এ কথাগুলি অর্থশূন্য প্রবাদ বাক্য নহে। আজকাল সমগ্র দেশে স্বাস্থ্যনীতি (sanitation) লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এখনকার দিনে পরিচ্ছন্নতাকে বাবুগিরি বলিয়া বুঝিলে চলিবে না, পৌরুষপ্রকৃতিকে সৎসাহস, স্বাভাবিকতা বা সরলতার নামান্তর বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। যেমন আকরস্থ হীরকখণ্ড কৃত্রিম উপায়ে ভাস্বর ও ব্যবহারযোগ্য করিয়া লইতে হয়, স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতিকেও সেইরূপ কৃত্রিম উপায়ে শোধিত করিয়া সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের যোগ্য করিয়া লইতে হয়।

কোন দেশবিশেষের উন্নতির দুটি মাপকাঠি আছে, তাহাদের একটি সাধারণশিক্ষার বিস্তার, অপরটি উচ্চ শিক্ষার বিস্তার। আমেরিকা ও জাপানের উন্নতির মূলে সাধারণ শিক্ষার প্রসার, আবার জর্ম্মণির উন্নতির কারণ উচ্চশিক্ষাব সমধিক বিস্তার। মোটের উপর বলিতে গেলে কোন দেশে জ্ঞান বিজ্ঞান ধর্ম্ম সাহিত্য ললিতকলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে কতগুলি বড় বড় লোক আছেন, তাহাই তদ্দেশের সভ্যতা ও উন্নতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

পাশ্চাত্যজাতিসমূহের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সহিত একাসনে বসিতে পারেন এরূপ এখন কেবল একজন বিক্রমপুরবাসীর নাম করা যাইতে পারে—অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু। ব্যবহারশাস্ত্রানুশীলনে স্যার্ চন্দ্রমাধব ঘোষ ও মনোমোহন ঘোষ, বাগ্মিতায় লালমোহন ঘোষ, পাশ্চাত্য জগতের তত্তৎ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ মনীষিদিগের সহিত তুলনীয়।* বিক্রমপুরে এপর্য্যন্ত একজনও সিবিলিয়ান হন নাই, ইহা আমাদের উদ্যম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পক্ষে প্রশংসনীয় নহে। অধুনা শ্রীযুত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে কতিপয় বিক্রমপুরবাসী যুবক পৃথিবীর নানাদেশে গমন করিয়া জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা আশার কথা বটে, কিন্তু বিক্রমপুরের শিক্ষিত লোকের অনুপাতে এই শ্রেণীর যুবকের সংখ্যা আরও অধিক হওয়া উচিত। বিক্রমপুরে একজন কবিও অদ্য পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। অনুশীলনদ্বারা কবি হওয়া যায় না সত্য, তবে শিক্ষিত লোকদিগের মনে কতকগুলি সূক্ষ্ম ও সুকুমার ভাব খেলিতে থাকিলে তাহাদেরই মধ্যে কোন কল্পনাপ্রিয় চিত্তে সেগুলি অঙ্কুরিত হইয়া এক সুন্দর ও উন্নত ভাবরাজ্য সৃষ্টি করে—অর্থাৎ কবিতার বিকাশ হয়। Sentiment বলিয়া কেহ যেন সেই ভাবগুলি উপেক্ষা না করেন, কারণ যেখানে মহৎ ভাবগুলি আদৃত না হয় সেখানে মহৎ লোক জন্মিবার সম্ভাবনা কম। পূর্ব্ববঙ্গে প্রকৃতির লীলাকানন চট্টলভূমিই একমাত্র কবিপ্রসবিনী বলিয়া বোধ হয়। এই কারণবশতঃই আবার এপর্য্যন্ত বিক্রমপুরে কোন চিত্রকরের আবির্ভাব হয় নাই, যদিও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জেলার কোন কোন যুবক শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্ত্তিত প্রাচ্যপন্থার চিত্রাঙ্কণে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। উচ্চভাবের একটি আবহাওয়া না থাকিলে বোধ হয় কোন বড় সাহিত্যিকের বিকাশও অসম্ভব। বিক্রমপুরে কোন বড় সাহিত্যিক নাই। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ একমাত্র সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁহার লেখায় ভাষার যত আড়ম্বর ভাবের তত সূক্ষ্মতা বা প্রগাঢ়তা নাই। আমার মতে কালে তিনি বড় সাহিত্যিকস্বরূপ

---

* রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রভৃতি কোন ধর্ম্মবীরই বিক্রমপুরবাসী ছিলেন না।

পরিগণিত না হইয়া একজন বড় scholar বা পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইবেন। বিদ্যার প্রতি তাঁহার যে গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা, জ্ঞানার্জ্জনে তাঁহার যে প্রবল স্পৃহা এবং তজ্জন্য তাঁহার যে সাধনা, সংস্কৃত, ইংরাজী ও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা এজীবনে বিস্মৃত হইব না। ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, অকালমৃত ডাক্তার প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি কয়েকজন Scholarএর নামও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেবল প্রিয়নাথ সেনই (হিন্দু আইন সম্বন্ধে) ফলগর্ভ অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর কয়জনের বিদ্যা জগতের কোন বিশেষ কার্য্যে আসে নাই। আমরা আপনাদিগকে বঙ্গদেশের Scotchmen বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি—আমরা তাহাদেরই ন্যায় সাহসী, উদ্যমশীল, পরিশ্রমপটু, একাগ্র, এবং তাহাদেরই ন্যায় সুকুমার সাহিত্য অপেক্ষা চিন্তাশীলতার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত, এই কথাটি অনেকের নিকট শুনিয়াছি। কিন্তু আক্ষেপের সহিত বলিতে হইতেছে, বঙ্গদেশে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যে কয়েকজন দার্শনিক আছেন, তাঁহাদের কেহই বিক্রমপুরবাসী নহেন। স্কটলণ্ডবাসীদের ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে, সৌভাগ্যের বিষয় বন্ধুবর রমাপ্রসাদ-চন্দ, বিক্রমপুরসম্পাদক প্রভৃতি মহাশয়দিগের কল্যাণে বিক্রমপুরও ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব ক্ষেত্রে যশের ভাগী হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্করের অকাল মৃত্যুতে বিক্রমপুর একজন প্রতিভাবান প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হারাইয়াছে। অপর এক শ্রেণীর লোকেরও আবশ্যক আছে, যাহারা কিছু কিছু পড়ে, ভাবে ও আলোচনার দ্বারা ভাবপ্রবাহের বিস্তৃতির সাহায্য করে। ইহারা স্বয়ং স্থায়ী কোন কার্য্য করিতে অক্ষম, কিন্তু এই শ্রেণীর লোক সংখ্যায় বহুল হইলে প্রতিভাবান ব্যক্তির বিকাশে সাহায্য করিতে পারে। ইংরেজীতে যাহাকে spirit of adventure ও enterprise বলে, সেইভাবটিরও নিতান্ত প্রয়োজন। দেশকে সজাগ করিতে হইলে, জীর্ণ সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইলে, দেশের উন্নতির জন্য নব নব পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইলে, এই শ্রেণীর পথপ্রদর্শকের আবশ্যক। শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় যে যুগে লাহোর গিয়া তেজের সহিত 'ট্রাইবিউন' পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া-ছেন, সে যুগে সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁহার মত লোক বিরল ছিল। এমন দিন

ছিল যখন ৺ গুরু প্রসাদ সেনের ন্যায় খ্যাতনামা ব্যক্তি পাটনা সহরে কেহ ছিল না। তাঁহার Introduction to the study of Hinduism পুস্তকখানি অদ্যাবধি তাঁহার যোগ্যতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে। শ্যামা-কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যেরূপ নির্ভীকতার সহিত নূতন প্রণালীতে ব্যাঘ্র বশ করিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ যোগ্য। যাঁহারা নূতন দেশে গিয়া উন্নতির নূতন ক্ষেত্র উদ্ভাবন করিয়া লইতে পারেন, এই শ্রেণীর লোক বিক্রমপুরবাসীদের মধ্যে বিরল হইয়া আসিতেছে বোধ হয়। বিক্রমপুরে কয়জন লোকের মাথায় নূতন ভাব খেলিয়া থাকে? অনেকেই গড্ডালিকা প্রবাহবৎ গতানুগতিক। বিক্রমপুরে ধনকুবের কয়েকজন আছেন, কিন্তু কয়জনের মস্তিষ্কে বিশাল পদ্মানদীর স্রোতবেগ কার্য্যকরী শক্তিতে পরিণত করিবার কল্পনা উদ্ভূত হইয়াছে? শ্রীযুত অম্বিকাচরণ উকীল ব্যতীত আর কাহারও নেত্রে অর্থোপার্জ্জনের পরিচিত পথগুলি ব্যতীত কোন অভিনব পন্থা প্রতিভাত হয় নাই। চিকিৎসালয়স্থাপন, বস্ত্র নির্ম্মাণ, শিক্ষার উন্নতিকল্পে দান,—দেশের বহু লোকের মধ্যে সাধারণ হিতৈষণার ভাবটি বদ্ধমূল না হইলে এসব বড় দেখা যায় না। বাস্তবিক এসকল বিষয়েও আমরা পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পশ্চাদ্‌পদ। বিক্রমপুরের বড় বড় ব্যবসায়িগণ ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া জমিদার বলিয়া পরিগণিত হওয়ার জন্য যত্নপর, কিন্তু বিদেশীদ্রব্য আমদানিজাত লাভের দিকে না চাহিয়া পাটের ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইয়া ধনোপার্জ্জনের প্রতি কয়জনের লক্ষ্য আছে? বস্তুতঃ ধনাগমের নূতন পন্থা আবিষ্কারের জন্য যে শিক্ষা, ভূয়োদর্শন ও সভ্যতার আদর্শের প্রয়োজন, তাহা আমাদের বিক্রম-পুরস্থ ধনিবর্গের মধ্যে এখনও প্রসার লাভ করে নাই এবং তাহার ফলে এই শ্রেণীর অর্থশালী ব্যক্তিদের ব্যয় দ্বারা দেশের কোন স্থায়ী উন্নতি সাধিত হইতেছে না।

সর্ব্বশেষ স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। অধিকাংশ বিক্রমপুরবাসী ভদ্রলোকই বিদেশে যাতায়াত করিয়া থাকেন, সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা আপনা হইতেই কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, কিন্তু ইহাকে কোন ক্রমেই যথেষ্ট বলা যায় না। অশিক্ষিতা ভার্য্যাদ্বারা কতরূপ অসুবিধা ভোগ করিতেছি, কিন্তু কন্যাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তদ্রূপ চেষ্টা

করিতেছি কৈ? এ বিষয়ে সম্মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন, এবং তজ্জন্য উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক।

বিক্রমপুরবাসীর গুণাবলীকীর্ত্তনে কোন বিক্রমপুরবাসীই কার্পণ্য করিবেন না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে পরের নেত্রসাহায্যে নিজেদের দিকে দৃষ্টিপাত করায় লাভ আছে। আমি যে ত্রুটিগুলি দেখাইবার চেষ্টা করিলাম, তাহার অনেকগুলি অল্লাধিক পরিমাণে সমগ্র বঙ্গজাতিসম্বন্ধে প্রযুজ্য। অল্প কয়েকটি বিক্রমপুরবাসীর বিশেষত্ব হইতে পারে। চিন্তাশীল পাঠক আরও অনেক বিষয়ে বিক্রমপুরের অভাব লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আমার মতে সেগুলির বিশদ আলোচনা—কেবল বিনাশমূলক সমালোচনা নহে, নূতন কিছু গড়িয়া তুলিবার সহায়ক তথ্য ও উপদেশপূর্ণ সারগর্ভ আলোচনা—'বিক্রমপুর' পত্রিকার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়া সঙ্গত। অলমতিবিস্তরেণ। *

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* 'বিক্রমপুর প্রসঙ্গ' ছাপিতে দেওয়ার পর জানিতে পারিলাম যে কোচিন রাজ্যের কৃতি দেওয়ান সিবিলিয়ান আলবিয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা স্বনামধন্য শ্রীযুত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিক্রমপুরস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামবাসী ছিলেন, কর্ম্মোপলক্ষ্যে বরাহনগর গিয়া তথায় স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। পরলোকগত বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের পুত্র মহীমোহন ঘোষও একজন সিবিলিয়ান, ইঁহাকে বিক্রমপুরবাসী সিবিলিয়ান বলিয়া গর্ব্ব করিলে বোধ হয় দোষণীয় হয় না। সিবিলিয়ান বলিতে ইঁহারা ব্যতীত দেখাইবার আর কেহ নাই, বিক্রমপুরের পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয় নহে। শ্রীযুত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ী বিক্রমপুরের নিকটবর্ত্তী সোণারগাঁ পরগনায়, বিক্রমপুরে নহে। ইহা পশ্চিমবঙ্গের অনেকে হয় ত জানেন না।

সম্প্রতি অবগত হইলাম যে বিক্রমপুরবাসী শ্রীযুত মুকুলচন্দ্র দে প্রাচ্য পন্থার চিত্রাঙ্কণে নিপুণতার আভাস দিয়াছেন। বিক্রমপুরের শিক্ষিত সমাজের পক্ষে এরূপ একজন চিত্রকর কিছুতেই যথেষ্ট বলা যায় না, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

উত্তরপশ্চিম ভারতে স্থপতিকলার স্থায়ী ও বিরাট নিদর্শনগুলির সহিত তুলনা করিয়া বিক্রমপুরে স্থাপত্যকীর্ত্তির দৈন্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম। এ বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে (এক প্রাচীন গৌড় ব্যতীত) কোন প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

সম্পাদকের নিবেদন।

অনেকেই 'বিক্রমপুরকে' মাসিকপত্ররূপে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছেন—তাহাদের ঐরূপ অনুরোধের কারণ—বাঙ্গলা সাহিত্যে ত্রৈমাসিকের আদর হইবে না, বিশেষ তিন মাস পরে একখানা কাগজ পরিয়া তৃপ্তি হয় না। কতকাংশে এই কথা প্রকৃত হইলেও এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। কোন কাগজেরই প্রথম সংখ্যা আশানুরূপ হয় না, বিশেষ

বিক্রমপুরে যে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আছে তাহা 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রণেতা প্রচুররূপে দেখাইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে সভ্যতাবিস্তারের একটি সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ইংরেজী আমলে ভারতবর্ষের রাজধানী এ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল, এবং তাহার প্রভাব তদ্দেশীয় বঙ্গবাসীদের মধ্যে বিশেষরূপে লক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। ঢাকা নগরী বিক্রমপুরের অতি সন্নিকটে; ঢাকায় এখন বঙ্গদেশের অন্যতর রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় বিক্রমপুরবাসীদিগের উন্নতি দ্রুততর হইবে এরূপ আশা করা যায়। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে সেই উন্নতির স্রোত আরও প্রবল ও সর্ব্বতোমুখী হইবে, ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

বিক্রমপুরের প্রাচীনসভ্যতা-প্রসঙ্গে নবাবী আমলে ঢাকার রাজনৈতিক প্রাধান্য এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কেদাররায় ও চাঁদরায়ের অপেক্ষাকৃত অধুনাতন যুগের কথাও একেবারে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। তাঁহারা যে বঙ্গীয় স্বাধীনতার নির্ব্বাণোন্মুখ দীপকে ক্ষণকালের জন্য উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা এখন সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহাদের স্থাপিত দেবীপ্রতিমা এখন সুদূর অম্বরে পূজিত হইতেছেন, কিন্তু বিক্রমপুর ও জয়পুর উভয়ের গৌরবই এখন পরিম্লান।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত 'ঢাকার ইতিহাস' সমালোচনাকল্পে শ্রাবণের 'প্রবাসী' পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় আমাদিগকে "সুস্থ-দেহ, নির্ভীক, স্বাধীনমনা, প্রবাস-প্রিয়, অক্লান্তপরিশ্রমী, "কাজের লোক," কিন্তু অনুকরণ-দক্ষ, কল্পনাশূন্য, ভাবপ্রবণতাবিহীন, "বাংগাল" জাতি" বলিয়াছেন। পরিশ্রম-স্বীকারের অশেষ ক্ষমতাকে কারলাইল প্রতিভার নামান্তর বলিয়াছেন। সরকার মহাশয় স্বয়ং তাদৃশ পরিশ্রমস্বীকারের

কোনও প্রাদেশিক পত্রের। 'বিক্রমপুর' বিক্রমপুরবাসীর, পরে সমগ্র বঙ্গের। জনসাধারণের সহানুভূতি ব্যতীত এইরূপ কাগজ পরিচালনা অসম্ভব। বিক্রমপুরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক-চতুর্থাংশও যদি দেশের এই কাগজ খানার গ্রাহক হ'ন, তাহা হইলে আমরা ইহাকে অতি উচ্চ শ্রেণীর কাগজে পরিণত করিতে পারি। বিলাতের বহু ত্রৈমাসিক পত্র সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। চিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধাবলী আজকালকার মাসিকে একরূপ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। শুধু গল্পে আর কবিতায় এখন চলিবে না। 'জমিতে শুধু বীজ বপন করিলে চলে না। জমির চাষের দরকার, অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া জমিতে সার—লাঙ্গল দিতে হয়, মাথার ঘাম পায়ে না ফেলিলে চাষী ফসল পায় না। সেরূপ দেশকে তুলিতে হইলে বক্তৃতা দ্বারা কতকগুলি ভাল কথা প্রচার করিয়া চুপ

যে নমুনা দেখাইয়াছেন, এ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের কেহ তাহা পারেন নাই, তাঁহার প্রশংসায় বিমুগ্ধ হইয়া ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত জনৈক পশ্চিমবঙ্গবাসী সিবিলিয়ানকে বিক্রমপুর ভ্রমণের পর বিক্রমপুরবাসীদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীদের ন্যায় ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত নহি, ইহাই বোধ হয় তাঁহাদের মতে আমাদের সুস্থদেহের প্রমাণ। কলিকাতার অধিবাসিগণ ভেজাল দ্রব্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেন,মৎস্য অপেক্ষা মিষ্টান্ন রন্ধন ও ভোজনে অধিকতর পটু, ইহাও তাঁহাদের স্বাস্থ্যনাশের এবং অতিরিক্ত মেদবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। কিন্তু অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন কলিকাতাঅঞ্চলবাসীদের বর্ণ সাধারণতঃ এতদ্দেশ অপেক্ষা গৌর। মোটের উপর পশ্চিমবঙ্গের নরনারীর মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা সুন্দর সুন্দরীর সংখ্যা বেশী ইহা অনেককে বলিতে শুনিয়াছি। অধ্যাপক সরকার মহাশয় আমাদের চরিত্রে যে সকল ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছেন মোটের উপর তাহা আমার নিকট সত্য বলিয়াই মনে হয়।

বঙ্গের শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেল সে দিন বিক্রমপুরের মহকুমা মুন্সীগঞ্জ পরিভ্রমণে আসিয়া আমাদের সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। তিনি স্বয়ং স্কচজাতীয়, এবং আমাদিগকে স্কটলণ্ডবাসীদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনাটি যে নূতন নহে মূল প্রবন্ধেই তাহা বলা হইয়াছে। বিক্রমপুরের বিখ্যাত লোকদের মধ্যে ভাগ্যকুলের ধনকুবেরগণের নাম উল্লেখ সঙ্গতই হইয়াছে, কিন্তু সমগ্র বিক্রমপুর তাঁহাদের নিকট সেই অতুলধনের যে স্থায়ী সদ্ব্যবহার প্রত্যাশা করে একটি ছোট জলের কল বা হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠাদ্বারা তাহার সফলতার সম্ভাবনা নাই। পাশ্চাত্য জগতে কার্ণেজীপ্রমুখ ধনকুবেরগণের কথা ভাবিয়া দেখিলেই দেশের লোকের আশা সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা তাঁহারা

করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।' আমরা বিক্রমপুরবাসী বাঙ্গালার গৌরব, দেশের গৌরব ইত্যাদি বড় বড় কথা বলি বটে, কিন্তু কে কতটুকু কাজ করি? 'বিক্রমপুর' বিক্রমপুরবাসীর মধ্যে কর্ম্মব্যাকুলতা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাতে আমাদের দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রীতি, একতা বর্দ্ধিত এবং সামাজিক ত্রুটী বিচ্যুতি দূরীভূত হয়, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের উপায় নির্দ্দিষ্ট হয়, এ উদ্দেশ্যেই ইহার অভ্যুদয়। ইহা একার কাজ নহে, দশ জনের। 'বিক্রমপুর' প্রচার করিয়া লাভবান্ হইবার আশা আমার নাই—তবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার অর্থ সামর্থ্যও আমার নাই—কাজেই দশজনের সহানুভূতি ভিক্ষা করিতেছি।

বুঝিতে পারিবেন। অবশ্য পাশ্চাত্য ধনীদিগের সহিত ইঁহাদের তুলনা হয় না তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এই দরিদ্র দেশের পক্ষে তাঁহারা কম নহেন। তাতা, ওয়াডিয়া, প্রেমচাঁদ প্রভৃতি পার্শি ও গুজরাতি বণিকদিগের সদৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে সক্ষম এরূপ ব্যক্তি বঙ্গদেশে যে কয়েক জন আছেন, তন্মধ্যে ইঁহারা যে অগ্রগণ্য তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(লেখক)

THE GOVERNOR AT MUNSHIGANJ.

HIS EXCELLENCY'S REPLY.

His Excellency gave the following reply to the address of Members of the Local Board Munshiganj :—

I have been welcomed on many occasions by the Chairman and Members of District Boards, but I think this is the first occasion on which I have had the pleasure of being welcomed by the members of a Local Board ; and I am glad that the first Local Board to welcome me should be one which has taken so keen an interest in Local Self-Government.

I have heard and read much of the ancient glories of Bikrampur. Many of those with whom I have come in contact told me that their homes are in this pargana ; I may mention the names of Raja Sree Nath Roy and his two brothers, the great scientist Dr. J. C. Bose and also my old friend Sir Chandra Madhab Ghosh. In olden times your pargana

'বিক্রমপুরের' উন্নতি বিক্রমপুরবাসীকেই করিতে হইবে। সমগ্র বঙ্গের এক-চতুর্থাংশ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদ বিক্রমপুরবাসীদের দ্বারা অধিকৃত, বাঙ্গালার এমন জেলা নাই, এমন গ্রাম অতি বিরল যেখানে কোন না কোন বিক্রমপুরবাসী না আছেন, ভারতবর্ষের কেন জগতের সর্ব্বত্রই একজন না একজন বিক্রমপুরের

was the outpost of the Emperor of Delhi, when there were powerful kingdoms in Assam, in Tripura and in Arracan, and the warrior Mir Jumla appreciated this when he erected at Idarkpur the fort which I hope to visit to-day. When the kingdoms of Assam and Arracan ceased to exist and that of Tripura became less warlike, the strategic importance of Bikrampur declined, but the interest of the people in the administration of the affairs of this part of the world did not cease. **Bikrampur seems to me to resemble in some ways my native land of Scotland though hardly in physical features! For many of the best of her sons seek employment far beyond her borders and indeed like Scotsmen in the British Empire take a large share in the administration of the affairs of this province; and like Scotsmen they are always proud of the land from which they came, and their children's children are proud to claim their connection with the home of their fathers.**

As you may have heard I was much interested in the valuable archaeological finds lately made with the assistance of Pandit Pareshnath Mahalanabis of Panchsar and in February last I went with my friend Khan Bahadur Aulad Husain to inspect them in the Dacca Kutchery. It seems probable that from the interesting finds which are being made at present in this district, we may be able to rescue from oblivion a part at least of the history of the ancient glory of Bikrampur and I hope the establishment of an Archaeological museum at Dacca may be of some assistance in this.

I am glad to have this opportunity of hearing about local wants and I hope I may be able to help you in attaining some of your desires. I see you owe much to the public spirit and generosity of the great Bhagyakul family, and especially to Raja Sree Nath Roy and the two Rai Bahadurs, his brothers. They have helped you to provide for Munshiganj a good water-supply, medical relief for the poor and recreation for the young.

অধিবাসী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে—এরূপস্থলে এক বৎসরের মধ্যে আমরা বিক্রমপুরের সহস্র গ্রাহক চাই—বোধ হয় আমাদের এ আশা দুরাশা নহে। গ্রাহক সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা কাগজেরও ক্রমশঃ উন্নতি করিতে পারিব। অতএব আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, প্রত্যেক শিক্ষিত বিক্রমপুরবাসী ইহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হউন। ইহার উন্নতির জন্য প্রতিজ্ঞা করুন। প্রতি সংখ্যা যাহাতে ১০০ এক শত পৃষ্ঠা করিয়া প্রকাশ করিতে পারি এবং বিলাতী ত্রৈমাসিক পত্রের আদর্শে নানাবিধ দেশের ও দশের কল্যাণজনক বিষয়ের

Your Collector, Mr. Birley, tells me that the question of maintaining the efficiency of the present water-supply of Munshiganj is having his attention. I have asked him to let me know as soon as the rains are over, how the course of the river has affected the situation, and how he thinks I may be best able to assist you.

If time permits I am to have the pleasure this morning of seeing the hospital to which you refer. Mr. Birley has told me of the great local interest manifested in this institution and in bringing medical relief generally within the reach of the poor. I hope that my visit to your hospital will stimulate you to fresh efforts in this direction.

I must honestly tell you that if I were you I would abandon altogether the idea of founding a college at Munshiganj. It may be true that it is difficult for your sons to gain admittance to the colleges at Dacca and Calcutta and it may be true that a college at your own doors would bear convenience but I cannot honestly say that I think you could ever support a first-rate institution and it was not in second-rate institutions that the men who have made Bikrampur famous in modern times were educated It is probable that in the near future the facilities for collegiate education in Dacca will be greatly increased and I would advise you to wait and send your sons to Dacca. With your aspiration to have a first-class school I have more sympathy I had not heard of the project, but provided you can raise locally the share of the expenditure which is usual on such occasions, I will do my best to assist you. You speak too in your address of your endeavours to raise money for a Mahomedan hostel. I understand that under the rules one-third should be raised locally and that local subscriptions have fallen short of this amount. I am always averse to breaking rules which are no doubt based on very good reasons but at the

অবতারণা করিতে পারি—আমরা সে লক্ষ্য লইয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছি। আশা করি আমাদের এ নিবেদন প্রত্যেক বিক্রমপুরবাসীর হৃদয়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে।

---

same time I am anxious to do something to show you that I appreciate the welcome you have given me here to-day. I will ask Mr. Lyon, who is the Member in charge of Education, whether as the amount still wanting in local subscriptions is not great, the balance cannot be found by Government and the hostel commenced with delay.

Babu Gobinda Chandra Bhowal who was a member of the Conference in rural water-supply which I summoned to Darjeeling, told me in conversation that the people of Munshiganj had done much to solve the problem in this part of the country by close personal attention to their tanks. This is as it should be, though perhaps not as it always is! It shows what can be done by the people themselves where education has spread. As you no doubt have heard, Government has agreed to hand over to the District Board the whole of the Public Works Cess, and I hope that this will enable the District Board to provide funds for dealing with the question of rural water-supply on practical lines. I hope that the District Boards will in the same way be enabled to help you to improve your road communications and to substitute good permanent bridges for those wooden structures which year by year require repairs to make them passable.

I do not wonder when I have so many evidences of the interest you take in Local Self-Government that you should desire to have Union Committee in Munshiganj. Your aspirations have the sympathy of my officers and as soon as matters can be arranged the committee will be constituted and I hope that when I return to Munshiganj I shall have the pleasure of shaking hands with the members of the Union Committee as well as members of the Local Board.

Gentlemen, I thank you for your welcome to Lady Carmichael and to me on this our first visit to Bikrampur.

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস

বিক্রমপুর

প্রথম বর্ষ	কার্ত্তিক ; ১৩২০	৩য় সংখ্যা

মিরকাদিমের খাল।

উত্তরবিক্রমপুরবাসী মাত্রই এই লোক-প্রসিদ্ধ জলপ্রণালীটির নাম অবগত আছেন। বিক্রমপুরে দুইটি প্রধান কৃত্রিম জল-প্রণালী, একটি মিরকাদিমের খাল, অপরটি তালতলার খাল। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি আজ আমাদের আলোচনার বিষয়। মিরকাদিমের খাল বর্ত্তমান রেকাবীবাজারের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ধলেশ্বরী নদী* হইতে উৎপন্ন হইয়া মোকামখোলা নামক স্থানে মাকুহাটির খালের সহিত মিশিয়াছে।

মিরকাদিমের খাল কে কাটাইল? কতদিন হইতে ইহা বিক্রমপুরের ভূপৃষ্ঠকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছে? উত্তর দেওয়া কঠিন, কারণ এ বিষয়ের ক্ষীণতম প্রবাদ পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং এই যে প্রবাদ পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ইহা হইতেই বুঝা যায়, যে খালের অনেক বয়স হইয়াছে।

* প্রাচীনকালে ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণে ইছামতী নদী প্রবাহিত ছিল, এবং ইছামতী হইতেই খাল বাহির হইয়াছিল। এখন ইছামতী ধলেশ্বরীর অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। লেখক—

তালতলার খালের সম্বন্ধে তবু একটা প্রবাদ আছে যে ইহা রাজবল্লভের কীর্ত্তি। প্রবাদটি যে সত্য নহে তাহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়, কিন্তু এই প্রবাদ হইতেই বুঝা যায় যে ইহাতে একবার রাজবল্লভের হাত পড়িয়াছিল। কিন্তু মিরকাদিমের খাল সম্বন্ধে জনরব পর্য্যন্ত নীরব। ছেলেবেলায় জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসে পূর্ণাঙ্গ খালের তীরে ছায়াময় গাছতলায় বসিয়া শীতল বাতাসে অঙ্গ জুড়াইতে জুড়াইতে চলন্ত নৌকাশ্রেণীর সাবলীল গতির দিকে চাহিয়া থাকিতাম আর দূর অতীতে যে সকল কার্য্যকুশল হস্ত এই সুদীর্ঘ খাল খনন করিয়াছিল তাহাদের কথা ভাবিতাম,—মন এক সুমিষ্ট অসীম বিষাদে আপ্লুত হইয়া যাইত! যাক্, এ গেল উচ্ছ্বাস, ইতিহাসের কথা বলি।

কোন ঐতিহাসিক কীর্ত্তির বয়স নির্ণয় করিতে হইলে সমসাময়িক খোদিত লিপির প্রমাণ সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য। কিন্তু এই খাল সম্বন্ধে সেই রকম প্রমাণের একান্ত অভাব, থাকাও অসম্ভব। প্রকাণ্ড জলাশয় সকল খনন করিয়া তাহাতে ঘাট বাঁধাইয়া, বাঁধা ঘাটের গায়ে জলাশয় খননের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া যাওয়ার কথা বিরল নহে, মহীপাল দীঘির অধুনা অদৃশ্য প্রস্তরলিপি তাহার উদাহরণ। কিন্তু যে নিঃস্বার্থ মহানুভব ব্যক্তি সুদীর্ঘ খালের জলে আপনার কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, জলপানতৃপ্ত অকৃতজ্ঞ ভবিষ্যৎবংশীয়েরা তাঁহার নাম মনে রাখে নাই! যাহা হউক, তবু খালের একটা মোটামোটি বয়স নির্দ্দেশ অসম্ভব নহে,—আমরা তাহারই চেষ্টা করিতেছি। এজন্য খালের ধলেশ্বরী হইতে মোকামখোলা পর্য্যন্ত চারি মাইল দীর্ঘ অঙ্গ আমাদিগকে সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। এই চারি মাইল ব্যাপী স্থানের আশে পাশে হিন্দু আমলের কীর্ত্তিচিহ্নের অভাব নাই। এখন আমাদের বিচার্য্য এই যে ঐ সকল কীর্ত্তিচিহ্নের মধ্যে কোন্‌গুলি খালকে মানিয়া চলিয়াছে, এবং খাল কোন্‌গুলিকে মানিয়া চলিয়াছে। কীর্ত্তিচিহ্নগুলিকে এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারিলে এবং এই দুই শ্রেণীর কীর্ত্তিচিহ্নের মোটামোটি বয়স ঠিক হইলেই, খালের বয়স টের পাওয়া যাইবে, কারণ খালের জন্ম ঐ দুই কালের মাঝামাঝি সময়ে হইয়াছিল ধরিতে হইবে।

খালের উপরের প্রধান কীর্ত্তি, একটি হিন্দু আমলের তিন খিলানযুক্ত প্রকাণ্ড ইটের পুল। জনপ্রবাদ বলে যে, পুলটি বল্লালসেনের নির্ম্মিত। পাইকপাড়া ও

আবদুল্লাপুর গ্রামের ঠিক সীমায় পুলটি উত্তরদক্ষিণেদীর্ঘ খালকে পূর্ব্বপশ্চিমে-দীর্ঘ হইয়া অতিক্রম করিয়াছে। পুলটি যে রাস্তাকে স্বীয় দেহের উপর দিয়া এইভাবে খাল অতিক্রম করাইয়া লইয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা মিরকাদিমের খালের

তিন মাইল দূরে সমান্তরালে অবস্থিত তালতলার খালও অতিক্রম করিয়াছে, এবং তথায়ও ঠিক এইরূপ আর একটি ইটের পুল আছে। এই পুল দুটির নির্ম্মাতা কে? এই বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণই নাই। পুল দুটি যে অতি প্রাচীন, দেখিবা মাত্রই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। গাথনী আগাগোড়া ইটের,

কোথাও পাথর ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু ইটের গাথনীই বজ্রের মত দৃঢ়; ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত ভূমিকম্পে ইহার বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। যাঁহারা মিরকাদিমের খালের উপরের পুলটির নীচ দিয়া যাতায়াত করিয়াছেন তাঁহারাই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে মধ্যবর্ত্তী প্রধান খিলানটির দুই ধারে, বর্ষার জলরেখার প্রায় পাঁচ ছয় হাত উঁচুতে, দুইটি এক হাত গভীর খাত সমান্তরাল ভাবে কর্ত্তিত। বলিতে লজ্জিত হইতেছি,—খাত দুইটি বর্ত্তমান লেখকেরই এক পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল। আমাদের অঞ্চলের সমস্ত দুর্গা প্রতিমা বিজয়া দশমীর দিন ধলেশ্বরীতে নিয়া ডুবান হয়। একবার আমাদের বাড়ীর প্রতিমা অত্যন্ত বড় করিয়া তৈয়ারী হইয়াছিল। পুলের নীচ দিয়া প্রতিমা যাইবার সময় দুই দিকের কার্ত্তিকেয় ও গণেশের হাত পুলে ঠেকিয়া যায়। কর্ত্তাদের তখন প্রবল প্রতাপ ছিল, আদেশ হইল পুল কাটিয়া প্রতিমা বাহির করিতে হইবে। শতাধিক লোককে পুলকর্ত্তনে নিযুক্ত করা হয়, শতাধিক কুঠার সর্ব্বজনহিতকর প্রাচীন কীর্ত্তিটির গায়ে আঘাত করিতে থাকে। পাঁচ ছয় ঘণ্টার পরিশ্রমে দুইটি সমান্তরাল খাত করিয়া প্রতিমা নদীর দিকে নেওয়া হয়। যাহারা পুল কাটিতে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে দুই একজন এই সেই দিনও জীবিত ছিল। তাহাদের মুখে শুনিয়াছি যে পুল কাটিতে শতখানি কুড়াল একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল এবং প্রত্যেক কোপেই নাকি প্রবল অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নির্গত হইয়াছিল। ইহা হইতেই পুলের গাথনী কত দৃঢ় তাহার একটা ধারণা পাওয়া যাইতে পারে। গাথনীর দৃঢ়তার আর একটি পরিচয়,—নিম্নে একহাত গভীর দুইটি সমান্তরাল খাত সত্ত্বেও খিলানটি এখনও অটুট আছে।

জনরব এই ক্ষেত্রে সত্য কথাই বলিতেছে বলিয়া যদি মনে করা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে পুল দুইটি বল্লালসেনের না হউক, সেনবংশের নির্ম্মিত। বিজয়সেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে মহারাজ বিজয় সেনের আমলেই প্রথম বিক্রমপুর সেনবংশের হস্তগত হয়। তাঁহার পুত্র বল্লাল-সেন, পৌত্র লক্ষ্মণসেন ও প্রপৌত্র মাধব, কেশব, বিশ্বরূপ ইত্যাদির আমলে বিক্রমপুরই সেনবংশের প্রধান রাজধানী ছিল, সেনবংশের, (এমন কি বিজয়-সেনেরও) প্রায় সমস্ত তাম্রশাসনই বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে

যে প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাই ইহার প্রমাণ। রাজধানী হইতে সোজা পশ্চিমদিকে বিস্তৃত একটি প্রধান পথের উপর তাঁহারা যে দুইটি পুল নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। তাহা হইলেই দেখা গেল যে পুল নির্ম্মিত হইবার কালে খাল বর্ত্তমান ছিল। এখন দেখা যাউক, যে রামপাল হইতে যে রাস্তা বাহির হইয়া পুল দুটির উপর দিয়া সোজা পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় কি না।

বিক্রমপুরে সেনবংশের পূর্ব্বে বর্ম্মবংশের রাজত্ব ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে চন্দ্রনামক বৌদ্ধরাজার রাজধানীও বিক্রমপুরেই অবস্থিত ছিল বলিয়া অবগত হওয়া গিয়াছে। রাজা চন্দ্রের একখানা তাম্রশাসন ইদিলপুরের কোন ভদ্র-লোকের বাড়ীতে আছে *। পরলোকগত গঙ্গামোহন লস্কর এম, এ, মহাশয় তাহা দেখিয়া ছাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পাঠও করিয়াছিলেন। সেই ছাপ ও পাঠ কোথায় গেল, বহু অনুসন্ধানেও তাহা অবগত হইতে পারি নাই। সৌভাগ্য-ক্রমে লস্কর মহাশয় তাম্রশাসনের মর্ম্ম র‍্যাঙ্কিন সাহেবকে পত্রযোগে অবগত করাইয়াছিলেন, সহৃদয় র‍্যাঙ্কিন সাহেব তাহা গতবৎসরের ঢাকা রিভিউ পত্রিকার এক সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে রাজা চন্দ্রের পিতার নাম ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও পিতামহের নাম সুবর্ণচন্দ্র। চন্দ্রবংশের রাজত্বকাল কিছুই স্থির হয় নাই, তবে আমার নানা কারণে মনে হয়, চন্দ্রবংশ সেন ও বর্ম্মরাজগণের পূর্ব্ববর্ত্তী। আমার এই বিশ্বাসের কারণ শীঘ্রই দিতে

---

* যে বাড়ীতে তাম্রশাসন খানা আছে, সে বাড়ীতে উচ্চশিক্ষিত লোকের অভাব নাই। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে কুসংস্কারের নিকট উচ্চশিক্ষিত, অশিক্ষিত সমস্ত সমান। সমস্ত যন্ত্রণা এড়াইবার জন্য এখন তাহারা প্রচার করিতেছেন যে তাম্রশাসনখণ্ড হারাইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বিশ্বাস তাহা কাহাকেও দেখাইলেই তাহাদের ঘরের লক্ষ্মী দ্রুতপদে পলায়ন করিবেন! দেশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের উপায় একটি দরকারী দলিলকে এভাবে গোপন করিয়া তাঁহারা যে কি ঘোরতর অন্যায় করিতেছেন, ইহা যদি তাঁহারা নিজ হইতে না বোঝেন তবে বুঝান অসম্ভব; এমন একটি গৌরবময় অতীতের সাক্ষী তাহাদের পরিবারে আছে, ইহা তাহাদের গৌরবের বিষয়, তাহাদের অধিকার হইতে ইহাকে কাড়িয়া লইতে এমন কি গভর্মেণ্টেরও ক্ষমতা নাই। কিন্তু ইহা গোপন করিয়া তাঁহারা অপরাধী হইতেছেন, উহাতে কি লেখা আছে তাহা জানিবার অধিকার প্রত্যেক বাঙ্গালীরই আছে।

পারিব বলিয়া আশা করি। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ, মহাশয় বিক্রমপুরে পঞ্চসার গ্রামে রাজা চন্দ্রের আর একখানি তাম্রশাসন পাইয়াছেন, তাহার পাঠ এখনও প্রকাশিত হয় নাই; প্রকাশিত হইলে চন্দ্র বংশের বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

চন্দ্রবংশ বৌদ্ধ ছিল,—চন্দ্রবংশের রাজগণ বিশেষ প্রতাপশালী ছিলেন বলিয়া বোধ হইতেছে না। চন্দ্রবংশের শেষ রাজার হাত হইতেই বোধ হয় বর্ম্মবংশের প্রথম রাজা বিক্রমপুর কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সে যাহাই হউক বিক্রমপুরের কীর্ত্তিনিচয়ের জন্য সেন ও বর্ম্ম বংশের ইতিহাস অনুসন্ধান করাই শ্রেয়।

ভোজবর্ম্মের নবাবিষ্কৃত বেলাবশাসন হইতেই প্রথম বর্ম্মবংশের কিছু কিছু সঠিক ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে বর্ম্মবংশের ইতিহাস উদ্ধারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তৎকালে উপকরণের অপ্রাচুর্য্য বশতঃ ও কুলগ্রন্থের উপর অতিরিক্ত পরিমাণে নির্ভর করায় তাঁহার সঙ্কলিত বিবরণে অনেক ভ্রমপ্রমাদ আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ম্মবংশের এ পর্য্যন্ত তিনখানা মাত্র সমসাময়িক খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে,—হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন, ভবদেব ভট্টের ভুবনেশ্বর প্রশস্তি ও নবাবিষ্কৃত ভোজবর্ম্মের বেলাবশাসন। ইহা ছাড়া নগেন্দ্র বাবু বর্ম্মবংশের ইতিহাস আলোচনায় যত কুলগ্রন্থের প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের ভবভূমিবার্ত্তাকে কতকটা ইতিহাসের মর্য্যাদা দেওয়া যায়, কারণ তাহার কোন কোন কথা সমসাময়িক লিপিদ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে।

গ্রন্থ প্রারম্ভেই কবিশেখর লিখিয়াছেন,—(অনুবাদ) "যিনি নরপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন,—যাঁহার প্রচণ্ড ভুজদণ্ডালঙ্কৃত করাল করবাল ভয়ে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত বহু সংখ্যক শত্রুরাজগণ প্রকম্পিত হইত,—জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিধর্ম্মীগণের যিনি শান্তিসুখ বিদূরিত করিয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে সমস্তরাজন্যবর্গের গর্ব্ব ও গৌরব খর্ব্ব হইয়াছিল, যিনি নগেন্দ্রপত্তন প্রভৃতি নানা দেশ জয় করিয়া অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন,—যিনি একাম্রকাননে হরিহর, ব্রহ্মা, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতি অষ্টোত্তরশত দেব বিগ্রহ এবং

চারিদিকে অপূর্ব্ব পতাকা-পরিশোভিত সুরভি কুসুমসমূহাদির সৌন্দর্য্যে নন্দন-কানন অপেক্ষা মনোহর অত্যুত্তম আমোদময় উত্থানসমূহে পরিবেষ্টিত অত্যুচ্চ সুন্দর মন্দির সকল এবং মন্দাকিনীর ন্যায় স্বচ্ছতোয়, কমল কহ্লার ইন্দীবর ও কোকনদবৃন্দে সমুদ্ভাসিত বিস্তৃত সরোবরসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যিনি নানা শাস্ত্র ও অস্ত্রবিত্থায় বিলক্ষণ সুদক্ষ, অসাধারণ বিচক্ষণতা সম্পন্ন বালভট্ট, গর্গ, ভট্টাচার্য্য ও বাচস্পতিপ্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সাতজন সচিবের সাহায্যে স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন,—যিনি নিজ জননীর বারাণসীশ্বর বিশ্বেশ্বরের পদারবিন্দদর্শনে যাইবার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার স্বচ্ছন্দ গমনের জন্য নূতন একটি প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন * * * অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে যাঁহার অদ্ভুত কীর্ত্তিকাহিনী বিঘোষিত হইয়াছিল * * * যিনি ব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি দান করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন সেই নৃপকুলশিরোমণি রাজাধিরাজ শ্রীহরিবর্ম্ম দেবের জয় হউক”। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—পাশ্চাত্য বিবরণ ৩য় অংশ ভূমিকা, ৬৵০ পৃষ্ঠা)

বর্ম্মবংশের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিবেন যে রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের হাতে এমন সব দলিল ছিল যাহা হইতে তিনি প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য চয়ন করিতে পারিয়াছিলেন এবং যাহা আমাদের সময় পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে নাই। নচেৎ বর্ম্মবংশের সংশ্রবে একাম্রকানন অর্থাৎ ভুবনেশ্বরে যে মন্দির ও সরোবর-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, হরিবর্ম্মের যে বালভট্ট ও বাচস্পতি মিশ্র নামে মন্ত্রী ছিল, হরিবর্ম্মের সময়ে যে জৈন ও বৌদ্ধদলন বিশেষভাবে হইয়াছিল তাহা রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের জানিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না অথচ এই সমস্তই ঐতিহাসিক সত্য। রাঘবেন্দ্রের এতগুলি কথা যখন বালভট্টের ভুবনেশ্বর প্রশস্তির প্রমাণে সমূলক বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে, তখন বাকী কথাটা,—তিনি যে মার পদব্রজে কাশী যাওয়ার জন্য নূতন রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন,—তাহাও সত্য বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। রাস্তা রাজধানী হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল তাহাও অনুমান করা অন্যায় নহে। বর্ম্মরাজদের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল এবিষয়ে বোধ হয় দুই মত নাই। বিক্রমপুরে, একটা প্রকাণ্ড রাজ্যের রাজধানী হইতে পারে এমন চিহ্ন রামপাল ভিন্ন অন্য কোথাও বড় দেখা যায় না, কাজেই

রামপালের কোন অংশেই * বর্ম্মবংশের রাজধানী ছিল। রামপাল হইতে সোজা পশ্চিমদিকে যাইবার প্রধান রাস্তা মাত্র একটি সেটিই ইটের পুল ছুটির উপর দিয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে। পশ্চিমদিগ্‌গামী প্রধান বাঁধান প্রাচীন রাস্তা বিক্রমপুরে আর একটিও নাই। কাজেই ইহাই যে হরিবর্ম্ম নির্ম্মিত রাস্তা সেই বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না।

এখন প্রশ্ন এই যে রাস্তা কি খাল মানিয়াছিল, না রাস্তা কাটিয়া খাল নিয়া রাস্তার উপর পুল নির্ম্মিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর শুধু রাস্তা ও খালের দিকে চাহিয়া দেওয়া অসম্ভব। খালের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

খাল দিয়া যতবার যাতায়াত করিয়াছি ততবারই চারিদিকে চাহিয়া বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গিয়াছি, এবং প্রত্যেকবারই নূতন জিনিস চোখে পড়িয়াছে। ধলেশ্বরী হইতে খাল উঠিয়া খাল বরাবর দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু নাটেশ্বরের দেউলের কাছে আসিয়া খাল সহসা বাঁকিয়া দেউলের পশ্চিম ধার প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। (মানচিত্র দ্রষ্টব্য।) খাল প্রায় দুই মাইল সোজা আসিয়া সহসা বাঁকিয়া যাইবার অর্থ কি? নিশ্চয়ই নাটেশ্বরের দেউলে বাধা পাইয়া খাল বাঁকিয়া গিয়াছে। তর্কস্থলে বলা যাইতে পারে যে তাহা নাও হইতে পারে। খাল অন্য কোনও অজ্ঞাত কারণে বাঁকাইয়া নেওয়া হইয়াছিল পরে বাঁকের উপর দেউল নির্ম্মিত হয়। মানচিত্রের দিকে চাহিলে দেখা যাইবে যে মৈষাঘাটার দেউলে বাধা প্রাপ্ত হইয়াও খাল বাঁকিয়া গিয়াছে, এবং পরে সোণারঙ্গ স্কুলের বিপরীত দিকস্থ প্রকাণ্ড দেউলের পদ ধৌত করিয়া আবার সোজা দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। দুইটি দেউলের কাছে আসিয়াই যে খাল বাঁকিয়া তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেল ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে? উভয়ত্রই কি কোন "অজ্ঞাত" কারণে খাল বাঁকিয়া গিয়াছিল? বিক্রমপুরের সাধারণ উচ্চতা অত্যন্ত কম। রামপালের চতুর্দ্দিকের ভূমিই কিছু উচ্চ আর প্রায় সমস্তটাই নিম্ন জলাভূমি। প্রাচীন রামপালের

* দিল্লী যেমন ভারতের রাজবংশগুলির মহাশ্মশান, রামপাল সেইরূপ বিক্রমপুরের রাজবংশগুলির মহাশ্মশান। এই প্রায় ২৫ বর্গমাইল ব্যাপী স্থানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রাজবংশের রাজধানী ছিল।

সহরতলিতে স্থিত আবদুল্লাপুর, পাইকপাড়া, পানাম, পানহাটা প্রভৃতি গ্রাম অপেক্ষাকৃত উচ্চ। সেই উচ্চ গ্রামগুলি ভেদ করিয়া খাল সোজা আসিল, আর

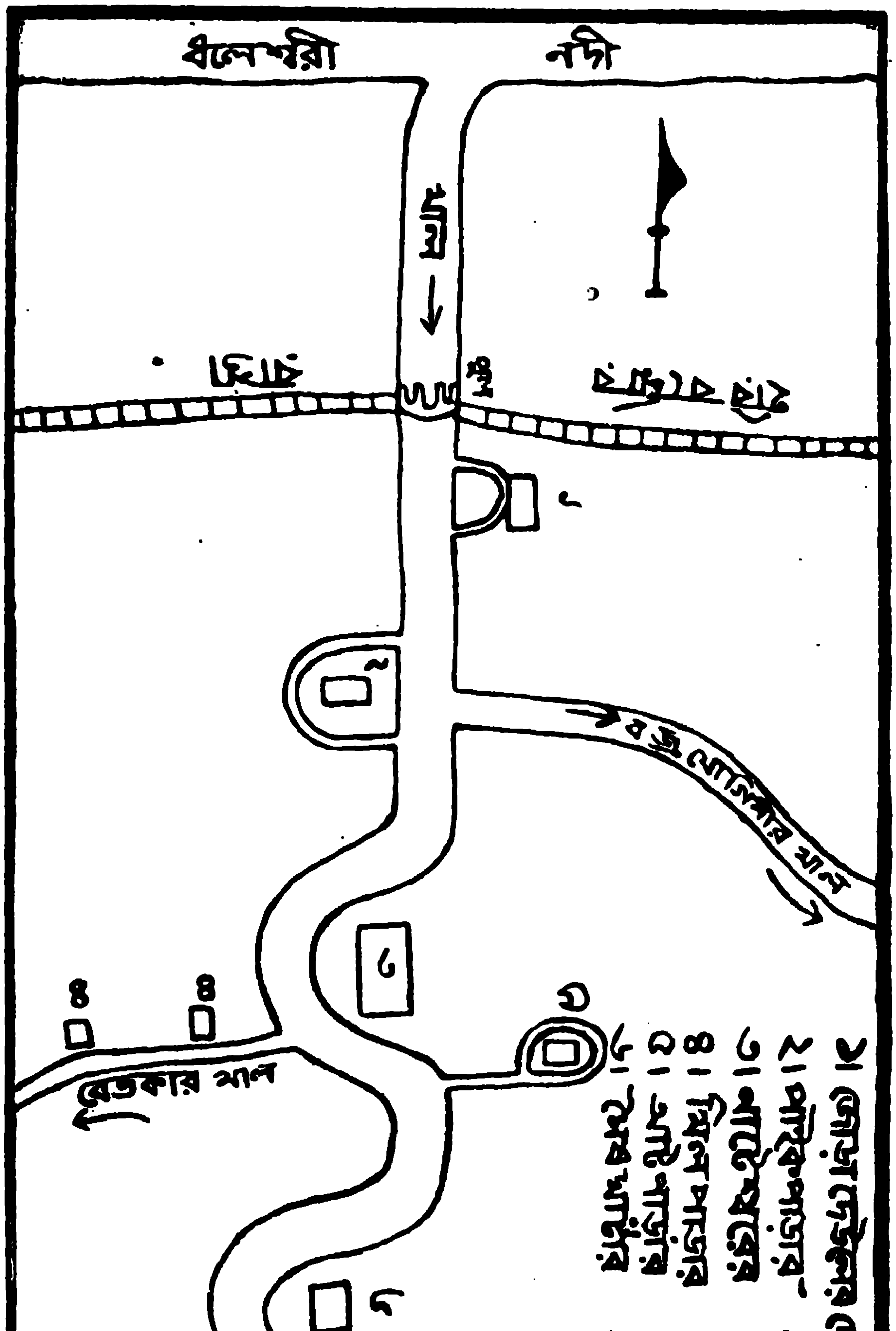

খিলপাড়া, নাটেশ্বর, সোণারঙ্গের নিম্নভূমিতে আসিয়া খাল অজ্ঞাত কারণে বাঁকিয়া গেল, ইহা শ্রদ্ধেয় কথা নহে। তাই এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে দেউলে বাধা পাইয়াই খাল বাঁকিয়া গিয়াছে।

রামপালের নিকটস্থ দেউলগুলির সহিত যে খালের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল এমন

মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মানচিত্রের দিকে চাহিলেই দেখা যাইবে যে খালের দুইধারের প্রত্যেক দেউল ক্ষুদ্রতর খাল দিয়া বড় খালের সহিত সংযুক্ত। বেতকার খাল অনেকগুলি দেউলের পদ ধৌত করিয়া তালতলার খালের সঙ্গে যাইয়া মিশিয়াছে। বজ্রযোগিনীর খাল বেশ প্রশস্ত,—বিখ্যাত বৌদ্ধস্থান বজ্রযোগিনী গ্রামের প্রধান প্রধান প্রাচীন ধর্ম্মস্থলীগুলিকে তাহা বড় খালের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। জোড়াদেউলের দেউল, পাইকপাড়ার দেউল, আটপাড়ার দেউল ক্ষুদ্রতর জলপ্রণালী দিয়া বড় খালের সহিত সংযুক্ত। এই সকল দেখিয়া মনে হয় যেন দেউলগুলিকে সংযুক্ত করাই খাল কাটাইবার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীনকালে দেউলের চতুর্দ্দিকেই যে প্রজামণ্ডলীর বাসস্থান ছিল তাহার চিহ্ন এখনও আছে। একটি ভাল যায়গা বাছিয়া চারিদিক হইতে মাটি উঠাইয়া প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত উঁচু করিয়া তাহার উপর দেউল প্রতিষ্ঠিত হইত এবং দেউলকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি ছোট-খাট উপনিবেশ স্থাপিত হইত। বিক্রমপুরের জলাভূমি এইরূপেই ক্রমে অধ্যুষিত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই দেউলগুলির চারিদিকে প্রাচীন বসতভিটার চিহ্ন অনেকদূর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কাজেই দেউলগুলিকে খালদ্বারা সংযুক্ত অনর্থক করা হয় নাই।

জোড়াদেউলের দেউল, পাইকপাড়ার দেউল, আটপাড়ার দেউল ইত্যাদি খালের পূর্ব্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী তাহার মীমাংসা সহজ নহে। হয়ত এগুলি পূর্ব্ব হইতেই ছিল, খাল কাটা হইলে পর বড় খালের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ক্ষুদ্রতর খালদ্বারা সংযুক্ত হয়। অথবা হয়ত তাহারা পরে নির্ম্মিত হইয়াও বড় খালের সহিত যুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু যে দুইটি দেউল খালের গতি পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য করিয়াছিল তাহারা যে পূর্ব্ব হইতেই ছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহারা খালের পূর্ব্ববর্ত্তী, খাল তাহাদিগকে মানিয়া চলিয়াছে।

এই দেউল দুইটি কাঁহার নির্ম্মিত? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে দেউল হইতে কি কি পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে। ৩নং দেউলটির নাম নাটেশ্বরের দেউল, নামটি শুনিয়াই বুঝা যায়, ইহা একটি শৈব দেউল ছিল এবং এখানে নটেশ শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিক্রমপুরের নানাস্থানে এই

নটেশমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাল গ্রামে একখানা নটেশ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া তাহার খোঁজ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়কে দিয়াছিলাম। তিনি তথা হইতে মূর্ত্তিটি সংগ্রহ করিয়া নিয়া আসিয়া মূর্ত্তিটির ফটোগ্রাফসহ ঐ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ঢাকা রিভিউতে প্রকাশিত করেন। আর একখানি নটেশমূর্ত্তি রামপালে পাওয়া যায়, তাহা স্থানীয় জমীদার রায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র গুহ বাহাদুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে—বোধ হয় কোন সাধারণ সংগ্রহাগারে প্রদত্ত হইবে।

সেনরাজ বংশ বিখ্যাত শৈব বংশ ছিল। বল্লালসেনের কাটোয়াশাসনে হেমন্ত সেন "বৃষধ্বজচরণাম্বুজষট্‌পদ গুণাভরণ" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। বিজয়সেন বরেন্দ্র হরিহরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের অর্দ্ধনারীশ্বর ভক্তি তাহার শাসনের প্রথম শ্লোকেই প্রকাশিত। লক্ষ্মণসেন শেষ বয়সে শান্তরসাশ্রিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও তাঁহার রাজত্বের প্রথমাংশের তাম্রশাসনগুলির আরম্ভ শিবকে বন্দনা করিয়াই করিয়াছেন। কাজেই নাটেশ্বরের দেউল প্রথম দৃষ্টিতে সেনবংশেরই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বোধ হইতে পারে।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নাটেশ্বরের দেউলে একখানিও শৈবমূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। যত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে সমস্তই বৈষ্ণব মূর্ত্তি। সেনদের পূর্ব্বে বর্ম্মরাজগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিখ্যাত বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহাদের শাসনাবলিতে তাহার প্রমাণ আছে। তাহাদের প্রত্যেকটিই "নমোনারায়ণায়" বলিয়া আরম্ভ। নাটেশ্বরের দেউলের শৈব নাম ও বৈষ্ণব কীর্ত্তি-চিহ্ন আবিষ্কার হইতে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে চাই যে দেউলটি বর্ম্মবংশের প্রতিষ্ঠিত, পরে সেনবংশের সময় ইহা শৈব দেউলে পরিণত হয়।

খালকে যখন বর্ম্মবংশের প্রতিষ্ঠিত দেউল মানিয়া চলিতে হইয়াছিল, তখন এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে হরিবর্ম্মের রাস্তাও খালের পূর্ব্ববর্ত্তী। রাস্তা কাটিয়া খাল নিয়া পরে তাহার উপর পুল দেওয়া হইয়াছিল।

আর একটি বিপুল প্রাচীনকীর্ত্তি খালকে মানিয়া চলিয়াছিল। তাহা প্রাচীন রামপালনগরী। পূর্ব্বে একস্থানে উল্লেখ করিয়াছি যে প্রাচীন রামপাল নগরী এক সময় ২৫ বর্গমাইলের অধিক জমী ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। যাহারা এই

২৫ বর্গমাইল স্থান তীক্ষ্ণ নয়নে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন তাঁহাদেরই একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার চোখে পড়িবে। প্রাচীন রামপাল কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা অতি সহজেই ঠিক করা যায়। প্রাচীন কালে বাস্তুভিটার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই সীমান্ত রেখায় পরিখা কাটিয়া মাটি উঠাইয়া সেই মাটি ফেলিয়া সমস্ত প্রাঙ্গনটি উচু করা হইত এবং ঘরের ভিটি বাঁধান হইত। বাড়ী হইতে বাহির হইবার জন্য মাত্র একটি দ্বার রাখা হইত আর চারিদিকে পরিখা থাকিত। সুবিধা থাকিলে নদীর সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়া পরিখা জলপূর্ণ রাখা হইত। রামপালের বল্লাল বাড়ীর চারিদিকে এরূপ পরিখাবেষ্টিত এক দ্বার সমন্বিত উচু ভিটির অভাব নাই। তাহাদের অধিকাংশের পরিখাই খাল বা নদীর সহিত সংযুক্ত। এই সুরক্ষিত বাড়ীগুলি দেখিয়াই অনুমান হয় যে এগুলি প্রাচীন কালে সমৃদ্ধিশালী নাগরিকগণের আবাসস্থল ছিল। কিন্তু এরূপ পরিখা সমন্বিত উচু ভিটি খালের পারে আসিয়া সহসা থামিয়া গিয়াছে! খালের পশ্চিম পারে এরূপ সুরক্ষিত বসত বাটির চিহ্ন খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ইঙ্গিত কি এই নহে যে প্রাচীন রামপালনগরীর পশ্চিম সীমা খাল ছিল? সেনবংশের অভ্যুদয় বিজয় সেনের রাজত্বের সহিতই আরম্ভ হয়। বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের সময়ে তাহা চরমে উঠিয়াছিল। সেই সময়েই তাহাদের রাজধানী বিস্তৃত হইতে হইতে আসিয়া খালে ঠেকিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়।

এতক্ষণ যাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম তাহার সারাংশ এই।

১। বল্লালসেনের পুল খাল মানিয়া চলিয়াছে।

২। সেন বংশের রাজধানী খাল মানিয়া চলিয়াছে।

আবার—

৩। খাল বর্ম্মবংশের রাস্তাকে মানিয়া চলিয়াছে।

৪। খাল বর্ম্মবংশের দেউলকে মানিয়া চলিয়াছে।

খাল কাহাদ্বারা খনিত হওয়া সম্ভব? হয়—(১) বর্ম্মবংশের শেষ দিকের কোন রাজা, অথবা (২) সেনবংশের প্রথম দিকের কোন রাজা। বর্ম্মবংশের জাতবর্ম্মা কৈবর্ত্ত রাজাদিগের সমসাময়িক, এবং ভোজবর্ম্মা পালবংশের রামপালের সমসাময়িক! তাহাদের রাজত্বকাল মোটামুটি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। এদিকে সেনবংশের অভ্যুদয়ের কাল মোটামুটি খৃষ্টীয় একাদশ

শতাব্দীর শেষভাগ। কাজেই ১০৭৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন বৎসরে মিরকাদিমের খাল খনিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে। এই হিসাবে দেখা গেল যে প্রায় সোয়া অষ্টশত বৎসর হয় খাল খনিত হইয়াছিল।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

নিবেদন.

লহ নাথ লহ তুলিয়া!
পূরিত আমার ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার,
নাহি মলিনতা নাহি দাগ তার,
স্বচ্ছ রতনে উজলি আঁধার,
তোমারে দিতেছি সঁপিয়া।
লহ তুমি ওগো আছি দাঁড়াইয়া,
ভকতির ডোরে যতনে গাঁথিয়া,
গর্ব্ব, কামনা, পিপাসা মাথিয়া
প্রেমের অঞ্জলি ধরিয়া।
সব নাও, ওগো, রেখোনাকো আর,
পারি না বহিতে এ কঠিন ভার,
বক্ষ বিদারি মুক্ত কর দ্বার,
সময় যেতেছে বহিয়া।

শ্রীমতী প্রতিভাময়ী দেবী।

গ্রাম্য পাঠাগারের উপকারিতা

জ্ঞান জগদীশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান। মানুষের মনুষ্যত্ব শুধু এই জ্ঞান লইয়া। একদিন ভারতবর্ষ যে জ্ঞানবলে, জগতের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিল আমাদিগকেও সেই মহৎ জ্ঞানলাভের জন্য সাধনা করিতে হইবে। সমগ্র ভারতবর্ষের বিরাট জ্ঞান-সাগরের গভীর আন্দোলনের কথা লইয়া নাড়া চাড়া করিবার শক্তি যাঁহাদের আছে তাঁহারা তাহা লইয়া আন্দোলন করুন—আমাদের এ আন্দোলন, আমাদের এ আশা, উৎসাহ শুধু পল্লীগ্রামের উন্নতিকল্পেই নিয়োজিত হউক। যাহার যতটুকু শক্তি তাহার ঠিক্ ততটুকু কর্ম্ম-কেন্দ্র বাছিয়া লওয়া উচিত। আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র—আশা অল্প। ক্ষুদ্র নদীর ক্ষুদ্র ঢেউ পল্লীগ্রামের শ্যামল বনশ্রেণীর প্রান্ত দিয়া বহিয়া চলুক, তাহার ক্ষীণ-ধারায় যদি সামান্য ভূখণ্ডও উর্ব্বরতা শক্তি লাভ করে তাহাই আমাদের পরম লাভ। পল্লীসমাজ এখন পরিত্যক্ত। শিক্ষিত বলিয়া যাহারা গর্ব্ব করেন তাহারা স্বীয় মাতৃভূমির কথা ভুলেও স্মরণ করেন না। তাহাদের আপত্তি পল্লীসমাজ জঘন্য, পল্লী-গ্রাম ম্যালেরিয়া-বিসূচিকা-বসন্ত ইত্যাদি ব্যাধিপূর্ণ—দিনরাত দলাদলি মারামারি করিয়াই পল্লীগ্রামের জনসাধারণ সময় কাটাইয়া দেয়—এমন নীচ সমাজে জঘন্য স্থানে শিক্ষিত লোক কেমন করিয়া দিন কাটাইবে? আমরা ইহাদের সব কথা মানিয়া লইলাম। কিন্তু ভাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কে কতটুকু নিজ বাসপল্লীর জন্য খাটিয়াছ? নিজ নিজ বিলাস-ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া কে কয়টি টাকা পল্লীগ্রামের কোন্ হিতানুষ্ঠানে অর্পণ করিয়াছ? রোগ-যন্ত্রণানিপীড়িত পল্লীগ্রামবাসী দরিদ্র ভ্রাতাগণের সেবার জন্য কে ভাই, অগ্রসর হইয়াছ? কে একবার আত্মমানসম্ভ্রম ভুলিয়া গিয়া—বিদ্যার উজ্জ্বল আলোক-প্রভায় তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে প্রয়াস পাইয়াছ? তোমার অর্থ আছে—শক্তি সামর্থ্য আছে, পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া গেলে, তুমি শিক্ষিত, তুমি পল্লীবাসী অশিক্ষিত ভাইবন্ধুকে ঘৃণা করিলে তবে কেমন করিয়া পল্লী জাগিবে? কেমন করিয়া দেশ উন্নত হইবে? পল্লীসমাজকে সুগঠিত ও উন্নত করিতে না পারিলে

আমাদের কোন রূপেই উন্নতি নাই—আমরা মানুষ হইব না, যেদিন এ বিশ্বাস আমাদের দৃঢ়রূপে দেহ ও মনের উপর কাজ করিবে সেদিন আমরা মানুষ হইব তাহার পূর্ব্বে নয়।

পল্লীগ্রামের জনসাধারণকে শিক্ষিত ও উন্নত করিতে না পারিলে আমাদের কোনরূপেই রক্ষা নাই। শিক্ষা ব্যতীত আমরা মানুষ হইব না, রোগ জ্বালা দূর হইবে না। পাশ্চাত্য জাতি উন্নত—তাহাদের নরনারী আমাদের অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত বলিয়া। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যহানি দলাদলি মাম্‌লা মোকদ্দমা প্রভৃতি অশান্তির প্রধান কারণ—শিক্ষার অভাব। গ্রাম্য নরনারীর মধ্যে ধীরে ধীরে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে প্রতি গ্রামে একটী পাঠাগার স্থাপন করা কর্ত্তব্য। পাঠাগার বা লাইব্রেরীর দ্বারা গ্রামের যে কত দূর উন্নতি সংসাধিত হয় তাহা আর ভাষায় বলিয়া বুঝান যায় না। বিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য এবং পাঠাগার-স্থাপনের জন্য অর্থব্যয়ের ন্যায় আর সৎব্যয় নাই। পল্লীগ্রামের অর্দ্ধশিক্ষিত নরনারীর মধ্যে অনেকরই বেশ পড়িবার এবং কোন নূতন বিষয় জানিবার আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সময় অর্থাভাবে এবং সুযোগের অভাবে তাহাদের সে সকল আকাঙ্ক্ষা অল্প সময়ের মধ্যেই লোপ পায়। সৎপ্রবৃত্তির ঝোঁকটা হারাইয়া শেষটায় মন আপনা হইতেই কুপথে ধাবিত হয়, পরে পাপের মোহকরী প্রলোভনের যাদু এড়াইতে না পারিয়া আপনাকে দিন দিন পাপের গভীরতম গহ্বরে নিক্ষেপ করে, এমনি করিয়া সুযোগ ও অর্থের অভাবে কত মহৎ প্রাণ যে পাপের দারুণ কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায় ক'জনে তাহার সন্ধান লয়?

বর্ত্তমান সময়ে দেশ নাটক-নভেলে প্লাবিত। রোমান্স রোমান্স করিয়াই ছেলে বুড়ো পাগল। মাসিক কাগজ খুলিয়া শতকরা নিরনব্বই জন পাঠকই গল্প পড়েন—গল্প পড়া হইয়া গেলে কাগজ খানার আর আদর থাকে না। যে কাগজে যত বেশী গল্প—তাহারই আদর বেশী। সার-কথা কেহ পড়িতে চাহে না। ধীরে ধীরে এইরূপ পাঠক-সংখ্যা যাহাতে হ্রাস পায় আমাদিগকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। গ্রাম্য-পাঠাগারের সাহায্যে যাহাতে গ্রাম গঠিত হইতে পারে, গ্রাম্য নর-নারীর পড়িবার ইচ্ছা সাধু ও সংযতভাবে অগ্রসর হয়, তৎপ্রতি মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। একবার কোনও পল্লীগ্রামের পাঠাগার দেখিতে যাইয়া দেখিতে

পাইলাম—পাঁচটি আলমারার মধ্যে চারিটিই নাটক, নভেল, ইত্যাদি চুট্‌কী সাহিত্যে পরিপূর্ণ—ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, স্বাস্থ্য-নীতি সম্পর্কিত গ্রন্থের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় লাইব্রেরীর সম্পাদক মহাশয় রসিদ বহি বাহির করিয়া দেখাইলেন যে গ্রাম্য নরনারীদের মধ্যে কেহই বড় একটা ইতিহাস, জীবনচরিত, কৃষি, স্বাস্থ্য-নীতি ইত্যাদি সম্পর্কিত গ্রন্থ লইয়া পড়িতে চাহেন না—তাঁহারা চাহেন শুধু ডিটেক্‌টিভ নভেল, ছোট গল্পের বহি ও নাটক। এই শ্রেণীর পাঠকের প্রতি গ্রাম্য পাঠাগারের কর্ত্তৃপক্ষগণের রূঢ় হওয়া একান্ত আবশ্যক। নচেৎ চলিবে না। এখন আর স্বপ্নের দিন নাই। পুরুষকে পুরুষোচিত দৃঢ়তায় এবং নারীকে পুনরায় নারীজনোচিত কোমলতায়, সহিষ্ণুতায়, দৃঢ়তায়, গার্হস্থ্যনিপুণতায় গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। যে রমণী গৃহস্থালী জানেন না—রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে শিখেন নাই, সন্তান-পালন করিতে অনভিজ্ঞা, সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হইতে কেমন করিয়া স্বীয় আত্মীয় স্বজনকে, সন্তানকে রক্ষা করিতে হয় তাহা জানেন না, অথচ শুধু সাজ-সজ্জা আর নাটক নভেল আওড়াইতেই পারেন তাহাকে আমরা কি বলিয়া অভিনন্দিত করিব? পল্লীগ্রামে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তারের প্রধান কারণ নারীগণের অনভিজ্ঞতা। গ্রামে কলেরা লাগিয়াছে তাহাদের সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, যে পুকুরে রোগীর ময়লা বস্ত্র ইত্যাদি ধৌত হইতেছে হয়ত সেখান হইতেই প্রিয়-পরিজনের পানীয় জল আহরণ করিয়া লইয়া গেলেন, হাতে হাতে ফল ফলিল! এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়াছি, তাই একথা কয়টি অবান্তর হইলেও না বলিয়া পারিলাম না।

পল্লীগ্রামের পাঠাগারে পল্লীবাসীর উপকার হয় এইরূপ সৎগ্রন্থসমূহ থাকা কর্ত্তব্য। পল্লীর শ্মশানে কাব্যনাটকের আনাগোনা বা অসার প্রণয়কাহিনী পূর্ণ গ্রন্থসমূহের হ্রাস হইলে কোনও ক্ষতি নাই। আমরা স্বাস্থ্যহীন সুখহীন নিরন্ন হতভাগা, আমাদিগকে শুধু পরের উভর নির্ভর করিলে চলিবে কেন? কেমন করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কেমন করিয়া জলাশয়ের পঙ্কো-দ্ধার হইয়া নূতন দীঘি পুষ্করিণী খনিত হইবার উপায় নির্দ্ধারিত হইতে পারে, কেমন করিয়া নারী-সমাজ উন্নত হয়, কেমন করিয়া গ্রামে, ছোট বড় সকলের মধ্যে একতা বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পরের সহযোগিতায় গ্রামের দলাদলি,

মামলা-মোকদ্দমা হ্রাস হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার জন্য গ্রাম্য যুবকগণ উদ্বুদ্ধ হউন। প্রত্যেক শিক্ষিত যুবক যদি অবকাশের সময় নিজ পল্লীর উন্নতিকল্পে একটু একটু করিয়া খাটিতে থাকেন তবে ধীরে ধীরে গ্রামে শক্তি সঞ্চারিত হইবে, সকলেই সঞ্জীবনী শক্তির ক্রীড়া দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।

একবার পাগল হওয়া চাই! শ্রীচৈতন্যদেব যেমন কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়াছিলেন, তেমনি করিয়া পাগল হওয়া চাই—দিগ্‌বিদিগ জ্ঞান থাকা চাই না, আপনাকে ভুলিয়া পাগল হওয়া চাই! 'মেরেছ কলসীর কাণা, তা' বলে কি প্রেম দিব না' এই আদর্শে লোক-নিন্দা বা প্রশংসার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া শিক্ষিত যুবকগণ গ্রামের হিতে অগ্রসর হউন। গ্রাম্য পাঠাগারটিকে কৃষি স্বাস্থ্য নীতি, বিজ্ঞান, জীবনী ইত্যাদি বিষয়ক সৎগ্রন্থ দ্বারা পূর্ণ করিয়া ঘরে ঘরে সে সকল অমৃত কণা ছড়াইয়া দিন—নেশা ধরাইয়া দিন। ইংরেজ চা-কর যেমন চায়ের নেশা ধরাইবার জন্য নানারূপ কৌশল উদ্ভাবন করিতেছেন—তেমনি আমোদে গল্পে ক্রীড়া-কৌতুকে গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের উপায় নির্দ্দেশ করুন। গ্রাম্য নরনারীকে স্বাস্থ্যের কথা শিক্ষা দিন। আত্ম-বিসর্জ্জন করা চাই—সেই একপ্রাণতার সৃষ্টির কেন্দ্র স্বরূপ গ্রাম্য পাঠাগারটিকে গড়িয়া তুলুন। তাহার সাহায্যে একে একে সব কাজই হইবে।

গ্রন্থের শিক্ষা অতি মহৎ দীক্ষা। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পাঠাগারের উপকারিতা ও গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

'These are the masters who instruct us without rods and ferrules, without hard words and anger, without clothes or money. If you approach them, they are not asleep ; if, investigating, you interrogate them, they conceal nothing, if you mistake them they never grumble ; if you are ignorant, they can not laugh at you. The library, therefore, of wisdom is more precious than all riches, and nothing that can be wished for is worthy to be compared with it. Whosoever, therefore, acknowledges himself to be a zealous follower of truth, of happiness, of wisdom, of science, or even of the faith, must of neuricity make himself of a lover of book'.

আমাদিগকে বাচিতে হইবে, আমাদিগকে আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া ক্রমশ মনুষ্যত্বের পদবীতে আরোহণ করিতে হইবে। নিজ প্যারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা লইয়া থাকিলেই শুধু চলিবে না। মানুষ হইতে হইবে। কবি গাহিয়াছেন,—'একবার তোরা মানুষ হ'। আমাদের সেই মানুষ হওয়া চাই। স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডী এড়াইয়া দশজনের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান করি। যাঁহারা শিক্ষিত, যাঁহারা উন্নত তাঁহারা যদি গ্রামের হিতার্থে সাধু-সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর না হ'ন, দশজনের সামনে ত্যাগের মহৎ আদর্শ না ধরেন তবে আর কে ধরিবে?

বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করা সকলের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে, কিন্তু প্রতিগ্রামে একএকটী করিয়া পাঠাগার স্থাপন করা তাদৃশ কষ্টসাধ্য নহে। প্রথমতঃ গ্রামবাসী অশিক্ষিত নরনারীকে স্বাস্থ্যের কথা ভাল করিয়া গ্রন্থের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও—পরে কৃষককে কৃষির কথা বুঝাও, গ্রাম্য রমণীগণকে ভিন্নদেশীয় নারীগণের ক্রমোন্নতির বিষয়সমূহ বুঝাইবার চেষ্টা কর। প্রথমতঃ তোমাদের এ সাধু চেষ্টা—নিন্দনীয় হইবে কেহই তেমন আদর করিতে চাহিবে না, যদি তোমরা তাহাতে নিরাশ না হইয়া দৃঢ়তার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাক তবে দেখিবে একদিন না একদিন নিশ্চয়ই কৃতকার্য্যের সফলতা দেখিয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে। সাধুকার্য্য করিলে নিজের মানসিক আনন্দ ও উৎকর্ষতা লাভ হয় সে লাভও কি পরম লাভ নহে? আমরা সংসারে কাজ করিতে আসিয়াছি, কাজ করিবই করিব—যদি কাজই করিতে হইবে তবে মন্দ কাজ করিব কেন?

আমরা পল্লীবাসী—পল্লীর বেদনা বুঝিয়াই এই কথা কয়টি লিখিলাম। তুমি নাগরিক—তুমি আমাদের মর্ম্মবেদনা না বুঝিয়া হাসিতে পার—কিন্তু মনে রাখিও পল্লী সমাজ গঠিত না হইলে আমরা কখনও উন্নত ও শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিগণিত হইতে পারিব না। পল্লীগ্রামকে কোনরূপে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। ভাই পল্লীবাসী! একথা মনে রাখিও নিজ গ্রামের কল্যাণ চেষ্টায় বিমুখ হইলে তুমি দেশের কোনও মহৎকার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না।

নিঃসঙ্গ।

নির্ম্মলের সহিত কমলার বিবাহ হইয়াছে। তাহার পর আরও চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি ইতিমধ্যে এম, এ পাশ করিয়াছি, বিবাহের পর দুই বৎসর নির্ম্মল তাহার নবীনা স্ত্রীকে লইয়া বড়ই ব্যস্ত ছিল; তাহার চিন্তায়, তাহার প্রীতি সাধনের ব্যর্থ চেষ্টায় অধিকাংশ সময় সে কাটাইয়া দিত; বন্ধুবান্ধবদের সহিতও স্ত্রী সম্বন্ধীয় গল্প গুজবই করিত।

বিবাহের পর পূর্ব্বের ন্যায় ঘনঘন না হইলেও মধ্যে মধ্যে আমি নির্ম্মলের বাড়ীতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। পৃথিবীতে এমন এক একটী স্বভাব আছে যে হয়ত একটী চঞ্চল অকৃতজ্ঞ বন্ধুর নিকট সম্পূর্ণ আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া জীবনের সমস্ত মূলধন সমর্পণ করে; পরে হয়ত রিক্তহস্তে শূন্যপ্রাণে কাঙাল হইয়া পথে দাঁড়ায়। আমার অবস্থাও অনেকটা তদ্রূপ। আমি জানিতাম, কমলা এখন আমার নিকট আকাশের নক্ষত্র হইতেও দূরতর, বিবাহের পর তাহাকে একটীবার চোখের দেখা দেখিবার আশাও আমি সমূলে হৃদয় হইতে উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

রূপমত্ত নির্ম্মল বিবাহের পর দুই বৎসর তন্ময় হইয়া কমলার রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিল। কিন্তু, কামনার তপ্তশ্বাসে প্রেমের অমিয় সিঞ্চন শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। ধমনীতে রক্তপ্রবাহের গতি শ্লথ হইয়া উঠিল, কমলার রূপ-চ্ছটার অভিনবত্ব নির্ম্মলের নিকট ক্রমেই অভ্যস্ত ও পুরাতন হইয়া গেল, অবসাদ আসিয়া অদম্য উৎসাহের স্থান অধিকার করিল। ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যু হওয়াতে নির্ম্মল স্বয়ং বিশাল সম্পত্তির মালিক হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যের মত্ততায় চঞ্চল যুবকের মন সর্ব্বদাই আলোড়িত হইত। মধুমক্ষিকার ন্যায় খোসামুদে ইয়ারের দলও ক্রমে তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে লাগিল এবং নির্ম্মলকে উৎসন্নের পথে লইয়া যাইতে লাগিল। সামান্য ইয়ার্কির লোভে নিজের চতুর্দ্দিকে একটা অন্তঃসারশূন্য ইয়ারের দল পাকাইয়া তাহার উপর স্বীয় আধি-পত্য বিস্তার করিবার একটা উৎকট উত্তেজনা যুবক হৃদয়ে স্বাভাবিক। নির্ম্মল

এই নেশায় পড়িয়া অসৎসঙ্গে ক্রমশঃ নিজের ধর্ম্ম, পবিত্রতা সমস্তই হারাইতে লাগিল। এ সময়ে কমলার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল, জানি না, কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিবাহের পর আর তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

মধ্যে মধ্যে আমি নির্ম্মলের বাড়ী যাইতাম; তাহার অধঃপতন যখন আরম্ভ হয়, তখন আমাকে দেখিলে সে যেন একটু সঙ্কুচিত ও সন্ত্রস্ত হইত, কিন্তু, শেষে যখন সে প্রকাশ্যভাবেই কুকার্য্যরত হইল, তখন সে আমাকেও উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিল; সুতরাং আমিও আর উপযাচক হইয়া তাহার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইতাম না।

মানসিক দুর্ব্বলতার ফলে অনেকে সন্দিগ্ধপ্রকৃতি হইয়া দাঁড়ায়। নির্ম্মলও ক্রমে সেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া উঠিল। নিজের পাপ সে সর্ব্বদাই অপরের হৃদয়ে প্রতিফলিত দেখিতে পাইত। ফলে সে কমলার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রেও সন্দিহান হইয়া উঠিল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহার হৃদয়ের সমস্ত সুখ শান্তি অন্তর্হিত হইল; দিবানিশি শুধু একটা অমূলক উন্মত্ত সন্দেহ তাহার হৃদয়কে বিষময় করিয়া তুলিল। সর্ব্বদা নানা খুঁটিনাটি লইয়া নির্ম্মল যখন সন্দেহ প্রকাশ করিত, অভিমানিনী স্বল্পভাষিণী কমলা তখন অপমানে ক্ষোভে লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইত, এবং সাশ্রুনয়নে চুপ করিয়া আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিত। কমলার নিরুত্তর অবজ্ঞাতে নির্ম্মলের সংশয় মত্ততা আরও বাড়িয়া উঠিল।

বহুকাল পরে আমি একদিন নির্ম্মলের বাড়ী গেলাম। ভাবিয়াছিলাম, এতদিন পরে সে আমাকে দেখিয়া হয়ত সুখী হইবে, হয়ত তাহার পূর্ব্বকৃত উপেক্ষার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইবে। কিন্তু, আমি যখন স্মিতমুখে কুশল প্রশ্নাদি করিলাম, সে যেন ক্রমেই গম্ভীর হইতে লাগিল, তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। বহুদিন পর আজ তাহাকে সঙ্গীহীন এবং একাকী পাইয়া তাহার চরিত্র সংশোধনার্থ কয়েকটী কথা বলিলাম। কমলার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আবেগ ভরে আমি বলিলাম,—

"ভাই এমন রত্ন পাইয়া পায়ে ঠেলিও না। সতীর দীর্ঘশ্বাসে কাহারও মঙ্গল হয় না। কমলা আমাদের বড় আদরের জিনিষ, তাই তাহার জন্য প্রাণে লাগে।"

মর্ম্মের নিভৃত অংশে যে সন্দেহ এতদিন গুপ্ত ক্ষতের মত যন্ত্রণা দিতেছিল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দাহ করিতেছিল, ইন্ধন পাইয়া আজ তাহা দাবানলের ন্যায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নির্ম্মল সরোষ গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"প্রাণে লাগিবে বৈকি? ভণ্ড, আমার চরিত্রের দোষানুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে নিজের হৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখ। তোমার অন্তরের অভিসন্ধি আমি জানি। এ জীবনে আর যেন তোমার মুখ দর্শন করিতে না হয়। এই মুহূর্ত্তেই আমার গৃহ ত্যাগ কর।"

বিস্ময়ে, ক্ষোভে, অপমানে আমার বাক্যস্ফুরণ হইতেছিল না। অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম,—"ভাই, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে; আমার মুখ দর্শন তোমাকে আর কখনও করিতে হইবে না। কিন্তু ভাই, তোমার সন্দেহ মিথ্যা, ইহাপেক্ষা মিথ্যাপবাদ কখনও মনুষ্য জিহ্বায় উচ্চারিত হয় নাই। যদি বিশ্বাস না কর, একদিন প্রমাণ করিব। আর একটি কথা। আমি তোমার বন্ধু। সুদিনে অনেক বন্ধু মিলিবে; ঈশ্বর না করুন, যদি কখনও দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, বন্ধুত্বের প্রমাণ নিও। বিদায়, ভাই; সুখী হও, এই প্রার্থনা।"

নির্ম্মলের গৃহত্যাগ করিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম। উত্তেজনায় তখনও পা টলিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল। উত্তপ্ত হৃদয় হইতে সর্ব্বনিয়ন্তার উপরে একটা দারুণ অভিমান দীর্ঘশ্বাসরূপে বাহির হইয়া গেল; বলিলাম,—'দয়াময়, কি অপরাধ করিয়াছিলাম, যে এই নিষ্ঠুরতম দণ্ডে দণ্ডিত করিলে?' চক্ষু দিয়া অশ্রু ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল; দমন করিতে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল।

দ্রুতপদে বাড়ী ফিরিলাম। সামান্য কিছু পরিচ্ছদ একটা ব্যাগে ভরিয়া হাবড়া ষ্টেসনের দিকে ছুটিলাম। পশ্চিমযাত্রী একখানা গাড়ী প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করিতেছিল। অভিশপ্ত জীবন লইয়া ভগ্নপ্রাণে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চলিলাম।

(৫)

পঞ্জাবের একটি ক্ষুদ্র নগরে আমি শিক্ষকতা করিতাম। বিদ্যালয় এবং বাসগৃহের চারিটি দেয়ালের মধ্যে দিন রাত্রি আমি নিজকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতাম। সেখানে আমার কোন বন্ধু ছিল না, সঙ্গী ছিল না। আমার ভয়

হইত, যে আমার সংস্পর্শে আসিবে, তাহারই জীবন বিষময় হইয়া উঠিবে। আমি মনুষ্যসঙ্গের অযোগ্য, আমার জীবন অভিশপ্ত। যে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত, বন্ধুগণকর্ত্তৃক বিতাড়িত, এই বিশাল পৃথিবীতে যাহার আপনার বলিবার কেহ নাই, তাহার জীবনের সার্থকতা কি, উদ্দেশ্য কি?

স্বদেশের সংবাদাদি জানিবার জন্য মাঝে মাঝে মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তাই কলিকাতা হইতে প্রকাশিত একখানা দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা রাখিতাম। কলিকাতা ত্যাগের বৎসরাধিক কাল পরে একদিন হঠাৎ পত্রিকা পড়িয়া জানিতে পারিলাম, নির্ম্মল একটী গুরুতর হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। জামিনের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই।

এই আকস্মিক বিপদ সংবাদে মনটা একেবারে বিকল হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ কলিকাতা যাত্রা করিলাম। কলিকাতা পৌছিয়াই মোকদ্দমার সংবাদ সংগ্রহ করিলাম। নির্ম্মল দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছে, জজের নিকট বিচার চলিতেছে। নির্ম্মলের পক্ষসমর্থনকারী ব্যারিষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলাম, খুব সম্ভবতঃ তাহার শাস্তি হইবে, মোকদ্দমার অবস্থা খারাপ।

রাস্তায় বাহির হইতেই মনে পড়িল, একদিন সদর্পে নির্ম্মলকে বলিয়াছিলাম,—"যদি কখনও দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, বন্ধুত্বের প্রমাণ নিও!" আজ দুর্দ্দিন উপস্থিত, বন্ধুত্বের প্রমাণ দিতে হইবে। তাহাকে আরও বলিয়াছিলাম,—"তোমার সন্দেহ মিথ্যা। যদি বিশ্বাস না কর, একদিন প্রমাণ করিব।" বিচারকের কঠিন বিচারে যদি নির্ম্মলের প্রাণদণ্ড হয়, তবে তো আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হইল না। স্বামীর নিকট সাধ্বী স্ত্রীর সতীত্ব যদি প্রমাণ করিতে না পারি, তবে আমায় শতধিক্! আমি মরিব; মরিবার সময় মুক্তকণ্ঠে বলিয়া যাইব,—'কমলা সাধ্বী, আমি নিষ্পাপ, নির্ম্মলের সন্দেহ মিথ্যা'। তথাপি কি নির্ম্মল আমার কথা বিশ্বাস করিবে না? তাহাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, জীবনের পরপারে দাঁড়াইয়া আবার উচ্চকণ্ঠে বলিয়া যাইব। ভাবিতে ভাবিতে পাগলের মত হইয়া গেলাম। বন্ধুত্বের প্রমাণ দিবার জন্য, সন্দেহ মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য যেন সমস্ত বিশ্বজগৎ আমাকে আহ্বান করিতেছিল। সে আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, মহা আহবের দুন্দুভিধ্বনি আমার হৃদয়ে বাজিয়া উঠিল; আমি আমার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলাম।

একবার মৃত্যুর করালমূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। হায়, সংসারে যাহার কেহ নাই তাহারও মরিতে ভয়! জীবন মৃত্যুর সন্ধি স্থানে দাঁড়াইয়া হঠাৎ মনে হইল, যদি নির্ম্মলের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, কমলার কি দশা হইবে? সে হিন্দুরমণী, সাধ্বী স্ত্রী। স্বামীর মৃত্যুতে তাহার অবস্থা স্মরণ করিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তাহার চির বৈধব্য যন্ত্রণা কি আমার মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে অধিকতর মর্ম্মান্তিক নহে? কমলার পতি প্রেম, যাহার প্রেরণায় পৃথিবীতে অসাধ্যসাধন করিতে পারিতাম বলিয়া বিশ্বাস ছিল, জন্মজন্মান্তরেও যাহার অবসান কল্পনা করা যায় না, সেই প্রেম কি সামান্য মৃত্যুর ভ্রূভঙ্গে শিথিল হইয়া যাইবে? ভাবিতে ভাবিতে ধমনীতে রক্তস্রোত বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমস্ত দ্বিধা সমস্ত ভয় দূর হইয়া গেল।

তখনই কাছারীতে উপস্থিত হইলাম। বিচারের ফলাফল জানিবার জন্য সোৎসুক চিত্তে বহু লোক অপেক্ষা করিতেছে। বিচারকের সম্মুখে নির্ম্মল রুক্ষকেশে মলিনবেশে দণ্ডায়মান; তাহার পক্ষসমর্থনকারী ব্যারিষ্টার তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য বক্তৃতা করিতেছেন। ভিড় ঠেলিয়া আমি বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলাম,—"আমি হত্যা করিয়াছি, অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। শাস্তির ভয়ে আমি এতদিন পলাইয়া ছিলাম; কিন্তু আমার পাপে অপরের দণ্ড হইবে ইহা অসহ্য, তাই, আজ স্বেচ্ছায় আমি আমার অপরাধ স্বীকার করিতেছি। আমাকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করুন।" উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত ও বিচারক হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। নির্ম্মল আমাকে দেখিয়া যেন ভূতগ্রস্তের ন্যায় কঠিন ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখে একটিও কথা ফুটিল না।

তাহার পরদিন বিচারে নির্ম্মল মুক্তিলাভ করিল; বিচারক আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা না দিয়া চিরজীবনের তরে নির্ব্বাসনের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিচারক এই অযাচিত অনুগ্রহটুকু না করিলে এইখানেই আমার জীবন নাট্যের যবনিকা পতন হইত। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ।

স্বদেশ হইতে চির নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে একবার নির্ম্মলের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলাম। যথাসময়ে সে কারাগারে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল।

সস্নেহে তাহাকে বলিলাম,—"ভাই, তোমার সহিত বিদায়ের দিনে যাহা বলিয়া গিয়াছিলাম, তাহা প্রমাণিত করিবার সুযোগ দিয়া আজ ভগবান আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আজ আমার বড় সুখের দিন। বুঝিতে পারিয়াছ কি ভাই, যে আমি তোমার নিকট বিশ্বাসঘাতক নহি?" একটু থামিয়া আবার বলিলাম,—"আমার শেষ অনুরোধ, চরিত্র সংশোধন করিও, এখনও সুখী হইতে পারিবে।" নির্ম্মল কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে এতক্ষণ আমার সকল কথা শুনিল। কি যেন সে আমাকে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার হৃদয়ের দুর্নিবার আবেগ শতমুখী গঙ্গার ন্যায় সমস্ত কথা ভাসাইয়া লইয়া গেল; সে বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

* * * *

* * * *

নিরাকূলির ব্রত

বিক্রমপুর অঞ্চলে নিরাকুলির ব্রতের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বিপদের সম্ভাবনায় মন ব্যাকুল হইলে ঘরের গৃহিণী এই ব্রত করিয়া থাকেন। ব্রতের ফলে নিরাকূলি অকূলে কূল দেন। এই ব্রত সধবা, বিধবা, কুমারী, সকলেই করিতে পারে। শনিবার অথবা মঙ্গলবার রাত্রে ব্রতের কথা কহিয়া ব্রত করিতে হয়। কোন পূজা করিতে হয় না, এই কথাই পূজা। ব্রত করিতে হইলে শনিবার বা মঙ্গলবার তৈল সিন্দুর, ধান দূর্ব্বা ঘট আমসরা পাটপাতা পান সুপারি ইত্যাদি কলার পাতার আগায় করিয়া দিয়া ব্রতের কথা বলিতে হয়। একটি মাত্র জোকার দিয়া ব্রতের কথা শেষ করিয়া সকলে প্রণত হয়। পরের দিন ভোরে অন্য সমস্ত জলে বিসর্জ্জন দিয়া সকলে কলার পাতায় দেওয়া তৈল সিন্দুর মাথায় ছোয়ায়।

ব্রতকথা

একদেশে এক ভগবানচন্দ্র রাজা। তাহার স্ত্রী লক্ষ্মীমতী কন্যা। একদিন লক্ষ্মীমতী স্বপ্ন দেখে, সে যেন নিরাকূলির কথা কহিতেছে। সেই স্বপ্নের পর

হইতে লক্ষীমতী প্রত্যেক শনিবারে ও মঙ্গলবারে নিরাকুলির কথা কহিত। কতকদিন পরে লক্ষ্মীমতীর গর্ভ হইল। ১০ মাস পরে একটি ছেলে হইল।

ছেলেটির বয়স পাঁচ বৎসর। আবার লক্ষ্মীমতীর গর্ভ হইয়াছে। একদিন সে নিরাকুলির ব্রত করিবার জন্য সমস্ত জোগাড় করিল। ভগবানচন্দ্র রাজা আসিয়া তাহার সমস্ত ফেলিয়া দিল। লক্ষ্মীমতী খুব রাগিয়া গেল এবং রাজাকে কহিল,—আমার নিরাকুলিরটা তুমি কেন ফেলিলা? আজ তোমার রাজত্ব সব যাইবে! এই কথা কহিয়া লক্ষ্মীমতী রাগ করিয়া সে দিন ব্রত করিল না। সেই রাত্রেই রাজার রাজত্ব সব গেল! নিরাশ্রয় ভগবানচন্দ্র রাজা লক্ষ্মীমতী ও তাহার ছেলেটি পুরী হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে এক বনে গিয়া পড়িল। ভোরে উঠিয়া দেখে কোথায় রাজবাড়ী! তাহারা এক বনে পড়িয়া আছে। বিপদের উপর বিপদ,—এমন সময় লক্ষ্মীমতীর প্রসববেদনা আরম্ভ হইল। লক্ষ্মীমতী কহিল,—রাজা, আমার এখন উপায় কি? রাজা কহিল, আর উপায় কি? এখানেই প্রসব হউক। লক্ষ্মীমতী নিরাকুলির নাম স্মরণ করিয়া সেই বনেই একটি ছেলে প্রসব করিল। প্রসবান্তে কাতর হইয়া লক্ষ্মীমতী রাজাকে কহিল,—আমার বড়ই পিপাসা হইয়াছে—আমার জন্য একটু জল লইয়া আইস।

রাজা নদীর পারে জল আনিতে গেল। এক দেশে এক রাজা মারা গিয়াছিল, তাহার রাজহস্তী—চারিদিকে ঘুরিতেছিল—যাহার কপালে রাজদণ্ড দেখিবে তাহাকেই নিয়া সেই থানে রাজা করিবে। ভগবানচন্দ্র জল আনিতে যাইয়া সেই হাতীর সম্মুখে পড়িল। তাহার কপালে রাজদণ্ড দেখিয়া তাহাকে রাজহস্তী পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া গেল।

এদিকে লক্ষ্মীমতী জলের আশায় বসিয়া আছে, রাজা আর আসে না। অবশেষে পিপাসায় অস্থির হইয়া সে বড় ছেলেকে কহিল, তুই এখানে বসিয়া থাক্, আমি রাজাকে তল্লাস করিয়া আসি আর স্নান করিয়া আসি। লক্ষ্মীমতী অনেক খুঁজিয়াও রাজাকে না পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নদীতে স্নান করিতে গেল। এক ব্যাপারীর নৌকা নদীর এককোণে ছিল আর সারা নদী শুকাইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীমতী কহিল, দেখ হে ব্যাপারী, তোমার নৌকাখানা একটু সরাও,

আমি স্নান করি। ব্যাপারী কহিল,—আমার নৌকা নড়ে না, তুমি সরাইয়া স্নান করিতে পারিলে কর। লক্ষ্মীমতী বা' হাতে নৌকা ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া স্নান করিল,—নদী ভরিয়া জল হইল! ব্যাপারী কহিল,—তুমি কে আমাদের নৌকা নারিলা? লক্ষ্মীমতী কহিল—আমি লক্ষ্মীমতী কন্যা। ব্যাপারী দেখিল যে, এই কন্যা সঙ্গে থাকিলে আর নৌকা ঠেকিবার ভয় থাকিবে না, তাই সে লক্ষ্মীমতীকে জোর করিয়া ধরিয়া নৌকায় তুলিল, লক্ষ্মীমতী কত মিনতি করিল,—কহিল, আমাকে ছুঁইস্ না, আমার অশৌচ, আমার একটী ছেলে হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারী তাহা মানিল না। তখন লক্ষ্মীমতী নিরুপায় হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। কহিল,—হে ভগবান্, আমার সৌন্দর্য্য সব তুমি নেও, আমাকে কুরূপ, কুৎসিৎ কর। তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীমতীর সমস্ত রূপ চলিয়া গেল। ব্যাপারী তাহার এই দশা দেখিয়া তাহাকে নৌকার পাটাতনের নীচে স্থান দিল, এবং নৌকা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এদিকে ছেলে দুটী সেই বনেই আছে। সেই দেশে এক গোয়ালের একটি কপিলেশ্বরী গাই আছে। গোয়াল ভোরে গাই ছাড়ে, সেই বনে ছুটিয়া গিয়া গাই ছেলেদুটিকে দুধ দেয়। এইরূপে কতকদিন যায়,—গোয়াল ভাবে, গাই কোথায় যায় আর আগের মত দুধ দেয় না কেন তাহা দেখিতে হইবে। একদিন গোয়াল গাই ছাড়িয়া তাহার পিছে পিছে চলিল। গিয়া দেখে, গাই এক বনের মধ্যে দুটি ছেলেকে দুধ দিতেছে। গোয়াল কহিল, কিহে বাছারা, তোমরা এখানে কেন? বড় ছেলেটি কহিল, আমার—

বাপ গেছে জল আনতে সেও আসে নাই।
মা গেছে স্নান করিতে সেও আসে নাই।
যে গুণে আছে গোয়ালের কপিলেশ্বরী গাই।
চারিটি বাণের দুগ্ধ খেয়ে বাঁচি দুটি ভাই।

গোয়াল কহিল, এখন তোমরা কোথায় যাইবে? ছেলে দুটি কহিল, আমাদেরে যে নেয় সেই আমাদের বাপ-মা, তার সঙ্গেই যাই। গোয়াল ছেলে দুটিকে আর গাইটিকে লইয়া বাড়ী আসিল। বাড়ী আসিয়া সে গোয়ালিনীকে কহিল,—দেখ্ তোর জন্য কি একটি জিনিস্ আনিয়াছি। গোয়ালিনী ছেলে দুটিকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—কোথায় এই দুটি ছেলে পাইলা?

গোয়ালা সমস্ত বিবরণ বলিল। গোয়ালিনী তখন পেটে একটি ধামা বাঁধিয়া রাজার বাড়ী দধি দুগ্ধ লইয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল,—ওলো বাঝা গোয়ালিনী, তোর আবার কবে গর্ভ হইয়াছে? গোয়ালিনী কহিল, ঠাকুরুণ, এই মাসে ১০ মাস। গোয়ালিনী বাড়ী আসিল, আসিয়া একটি কুকুর কাটিয়া ছেলেটির গায় রক্ত মাখাইয়া দিল। তাহার পরদিন চারিদিকে খবর গেল যে রাজার বাড়ীর গোয়ালিনীর একটি ছেলে হইয়াছে ও আর একটি ছেলেকে পোষ্য আনিয়াছে। শুনিয়া সকলেই আহ্লাদিত।

কতকদিন পরে ছেলে দুটি বড় হইল। গোয়ালা রাজাকে বলিয়া কহিয়া ছেলে দুটিকে নিয়া ঘাট মাঝির কাজে দিল। দৈবক্রমে সেই ব্যাপারীর নৌকাও সেই ঘাটেই আসিয়া লাগিল। একদিন রাত্রে ছোট ছেলেটি কাঁদে, বড়টি বলিল—আয় আমরা বাপ মায়ের কথা কহি। বড়টি দুঃখের কথা কহিতে লাগিল, ছোটটি শুনিতে লাগিল। সেই লক্ষ্মীমতী কন্যা তাহাদের কথা শুনিয়া সারারাত্র কাঁদিল। তাহার পরের দিন ব্যাপারীরা রাজার কাছে গিয়া কহিল, আমাদের নৌকায় একটি মেয়ে আছে,—আপনার ঘাটমাঝি ছোড়া দুইটা রাত্রে তাহাকে মারিয়াছে। ছেলে দুইটিকে ডাকাইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা বলিল,—আমরা তাহাকে দেখিও নাই। লক্ষ্মীমতীকে ডাকাইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাল কাঁদিয়াছ কেন গো? লক্ষ্মীমতী কহিল, আপনার ঘাট মাঝি ছেলে দুটির কথা শুনিয়া কাঁদিয়াছি। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে ছেলে দুইটি কি কথা বলিয়াছিল, তাহা সমস্ত বলিল,—রাজার পূর্ব্বের কথা সব মনে হইল। তখন জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা সব জানিতে পারিলেন। রাজা গোয়ালাকে পুরস্কৃত করিয়া তাহার নিকট হইতে ছেলে দুটিকে গ্রহণ করিলেন, রাজপুরীতে আনন্দের কোলাহল উঠিল। লক্ষ্মীমতী স্নান করিয়া স্বামী পুত্র নিয়া নিরাকুলির কথা কহিল। সেই রাত্রে রাজা পূর্ব্ব রাজত্বও ফিরিয়া পাইল এবং সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করিতে লাগিল।

শ্রীভুবনমোহিনী দেবী।

অদৃষ্টের ফের

কোন সময়ে একজন বণিক অত্যন্ত দুর্দ্দশায় পতিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের করাল ছায়াও তাহার সংসারে প্রবেশ করে। অতিকষ্টে দিন চলে—কোন দিন অর্দ্ধাহারে, কোন দিন অনাহারে। দারিদ্র্য যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন বণিকের স্ত্রী স্বামীকে রাজদরবারে যাইয়া রাজার নিকট তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশা জানাইয়া সাহায্য চাহিতে পরামর্শ দিল।

বণিক এই প্রস্তাব অনেকবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল কিন্তু এবার আর প্রত্যাখ্যান করিল না—বরং আনন্দের সহিত স্ত্রীর পরামর্শানুসারে রাজবাটীতে গমন করিল। বণিক যখন রাজবাটী গমন করিল তখন সেখানে লোকে লোকারণ্য—দেখিল তাহারি মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত বহুলোক সাহায্যার্থ তথায় উপস্থিত হইয়াছে। এ দৃশ্যে বণিকের হৃদয় দমিয়া গেল! সুসময়ে রাজার সহিত তাহার পরিচয় থাকিলেও, এখন তিনি তাহাকে চিনিতে পারিবেন কিনা এই দুর্ভাবনায় বণিকের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অবশেষে কম্পিত পদে বণিক রাজার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। রাজা কিন্তু বণিককে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। ও পরে তাহার জন্য তিনি কি করিতে পারেন ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

বণিক তাহার দুঃখদৈন্য বিবৃত করিল। রাজা খুব সদ্বিবেচক ছিলেন। তিনি বণিকের পূর্ব্বাবস্থা জানিতেন তাই তাহাকে সাধারণ ভিক্ষুকের ন্যায় অর্থ সাহায্য করিয়া মনে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তিনি তৎপরিবর্ত্তে নিজ 'খাসকামরায়' যাইয়া একটি তরমুজ ফল আনয়ন করিলেন এবং ফলটির ভিতর একটি ছিদ্র করিয়া উহার শাঁস বাহির করিয়া ফেলিলেন, পরে ঐ তরমুজ ফলটি স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া উহার মুখটি বেশ করিয়া বন্দ করিলেন। এইরূপ করিয়া রাজা ঐ তরমুজটি বণিককে দান করিলেন এবং ইহা হইতেই তাহার অভাব-ক্লেশ দূর হইবে এরূপ বলিয়া দিলেন।

বণিক ধন্যবাদের সহিত রাজার নিকট হইতে তরমুজটি গ্রহণ করিল কিন্তু আর্থিক সাহায্যের পরিবর্ত্তে এইটুকু একটি ফল পাইয়া—নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে

বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। পথে যাইতে যাইতে পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত দুই-জন পথিকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের ক্লান্ত দেহ দেখিয়া বণিকের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তরমুজ ফলটি পথিকদ্বয়কে দান করিলে তাহার নিজের অপেক্ষা তাহাদের বেশী উপকার হইবে মনে করিয়া সে উহা তাহাদিগকে দান করিয়া শুধুহাতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

কয়েক বৎসর অনাহারে অত্যন্ত দুঃখকষ্ট পাওয়ায় বণিককে তাহার স্ত্রী অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া পুনরায় রাজার নিকট পাঠাইয়া দিল। রাজা বণিকের দ্বিতীয় বার আগমনে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মনে হইল বোধ হয় বণিক তাঁহার প্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা যৌথকার্য্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পুনরায় সাহায্যার্থ আসিয়াছে। রাজা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ অপর একটি তরমুজ বণিককে দান করিলেন।

বণিক এবারও ধন্যবাদের সহিত উহা গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত মনোদুঃখে বাটী ফিরিল। এই সময়ে দারিদ্র্য তাহাকে এরূপ নির্য্যাতন করিতেছিল যে, সে ঐ ক্ষুদ্র তরমুজটি লইয়া তাহার ক্ষুধার্ত্ত পুত্র-কন্যাদিগকে দিতে পারিবে বলিয়া আনন্দানুভব করিতেছিল। কিন্তু ফিরিবার পথে এবার বণিকের সহিত ক্ষুধায় মৃতপ্রায় অপর এক ভিক্ষুকের দেখা হইল। ভিক্ষুকের দুরবস্থা দেখিয়া তাহার দয়ার্দ্র হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু হায়, বণিকের অর্থ সাহায্য করিবার কোন ক্ষমতা নাই, তাই সে রাজদত্ত সেই তরমুজটি ভিক্ষুককে দান করিয়া ফেলিল।

বণিকের স্ত্রী এবারও স্বামীকে রিক্তহস্তে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে রাজার সামান্য একটি তরমুজ ফল দানের কথা বলিয়া অত্যন্ত রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। বণিকের স্ত্রী বিশেষ কোপনস্বভাবা ও একগুঁয়ে ছিল, বিশেষতঃ সাংসারিক দুঃখে-কষ্টে তাহার আর তেমন সাহস বা হৃদয়ের বল ছিল না, তথাপি সে পুনরায় স্বামীকে রাজার নিকট সাহায্যার্থ পাঠাইল। এবারও রাজা পূর্ব্ববৎ সদয় ব্যবহারে বণিককে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত দুইটি ফলের কিরূপ ব্যবহার হইয়াছে জানিতে চাহিলেন। বণিক সামান্য দুইটি তরমুজ ফল সম্বন্ধীয় প্রশ্নে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং ইহার কারণ বুঝিতে না পারিলেও সে ফল দুইটি কিরূপে দান করিয়াছিল, তাহা রাজার নিকট বিবৃত করিল।

রাজা ইহা শুনিয়া একটু হাসিলেন ও তরমুজ ফল দুইটিতে যে স্বর্ণমুদ্রা প্রভৃতি ছিল তাহা প্রকাশ করিলেন। এবার রাজা তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য্যের সহিত পুনরায় তৃতীয় আর একটি তরমুজ বণিককে প্রদর্শন করিয়া নানাপ্রকার মহা-মূল্য মণিমাণিক্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন ও উহা তাহাকে অত্যন্ত সাবধানে বাটী লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

বণিক রাজপ্রদত্ত অর্থদ্বারা তাহাদের জীবন-স্রোত নূতন ভাবে প্রবাহিত করিবে মনে মনে স্থির করিল এবং অত্যন্ত আনন্দসহকারে বাড়ীর দিকে রওনা হইল। বণিকের গৃহ রাজবাড়ী হইতে নদীর অপর তীরে অবস্থিত। নদী পার হইতে হইলে তাহাদিগকে প্রস্তর সেতুর উপর দিয়া যাইতে হইত।

বণিক এইরূপভাবে যাইতে যাইতে পদস্খলিত হইল ও তাহার হাত হইতে মণিমাণিক্যপূর্ণ তরমুজ ফলটি পড়িয়া গড়াইতে গড়াইতে গভীর জলে ডুবিয়া গেল। হতভাগ্য বণিক তাহার দুরদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। বণিক মনে করিল যে, সে দরিদ্রাবস্থায় থাকে ইহাই বিধাতার অভিপ্রায় সুতরাং সে স্থির করিল যে দেবতারা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট-চিত্ত হইয়া যে পর্য্যন্ত না ভাগ্য পরিবর্ত্তন করেন তদবধি নিজের আন্তরিক চেষ্টা ব্যতীত সে অন্য কাহারও পুনরায় সাহায্য প্রার্থনা করিবে না।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর সান্যাল।

আকাশ

বিজ্ঞান আমাদিগকে শিখাইয়াছে আকাশ কোন পদার্থ নহে—এ কথায় আমরা কিছু অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই; কারণ ঘট যেমন জলের আধার, পৃথিবী যেমন ঘটের আধার, আকাশ তেমনি পৃথিবীর আধার। আধেয় আছে অথচ আধার নাই একথা ন্যায়সঙ্গত নহে; আর এই সকল চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু ইহারা যদি কোন পদার্থ দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন না হয় তবে সমষ্টিকে এক অখণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিরূপে বলা যাইতে পারে। এই সকল কারণে হিন্দুবিজ্ঞান প্রবহ, আবহ, সংবহ প্রভৃতি সপ্তবায়ুর অস্তিত্ব স্বীকার

করিয়া গিয়াছে। নবীন বিজ্ঞানও 'ইথার' নামক বায়বীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছে। আমরাও আশৈশব শিখিয়া আসিতেছি ঐ আকাশে তেত্রিশ-কোটি দেবতা আছেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঐখানে বাস করিতেছেন, কত গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ অপ্সরা আছে, ঐ আকাশে নন্দনকানন আছে, পারিজাত আছে, ঐরাবত আছে, মন্দাকিনী আছে আরও কত কি আছে—উহার নাম স্বর্গ। আকাশ নাম সর্ব্বস্ব হয় হউক অর্থাৎ নাম থাকিয়া বস্তু না থাকে না থাকুক, আমরা দিন দিন কত না অপূর্ব্ব জিনিস ঐ আকাশের গায়ে দেখিতেছি। সূর্য্য প্রখর কিরণে জগত উদ্ভাসিত করিতে করিতে ঐ আকাশের ভিতর দিয়া চলে, মেঘগুলি কখনও গর্জ্জন করিতে করিতে কখনও শান্তভাবে ঐ আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, ঐ আকাশে সংখ্যাতীত নক্ষত্ররাজি সমাকীর্ণ হয়, আর চাঁদ মেঘে উঠিয়া তাহাদের ভিতর দিয়াই আপন পথে চলিতে থাকে। তাই আকাশ! তোমাকে বড় ভালবাসি।

আকাশের অন্ত নাই—তাই তার এক নাম অনন্ত; অন্ত থাকিলেও বুঝিবার সাধ্য কি? চন্দ্র সূর্য্য অনাদি কাল হইতে ভ্রমণ করিয়াও যাহার অন্ত পায় নাই, কেবল ঘুরিয়াই ফিরিতেছে তাহার অন্ত মানুষ কেমন করিয়া পাইবে! অথবা আকাশ বোধ হয় গোলাকার তাই তাহার অন্ত নাই, আর চন্দ্র-সূর্য্য পৃথিবী সবই গোলাকার তাই মনে হয় এই সৃষ্টিই গোল নতুবা তাহার আদি ও অন্ত লইয়া এত গোলে পড়ি কেন?

জ্যামিতিতে পড়িয়াছি, 'যাহার অবস্থিতি আছে বিস্তৃতি নাই তাহার নাম বিন্দু', কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল; আজ আবার শুনিলাম, 'যাহার বিস্তৃতি আছে অবস্থিতি নাই তাহার নাম আকাশ', এ সংজ্ঞার অর্থবোধ করিতে যিনি পারেন করুন আমি নাচার। আমি শুধু জানি আকাশ বড় বিস্তৃত—আকাশ বড় উদার, তাই আকাশ দেখিলে মন না কি উদার হয়। আকাশের এ অদ্ভুত প্রকৃতি কি লোকশিক্ষার জন্য? এই ঘটাকাশ জীবদেহে বদ্ধ মানবকে মহাকাশে লীন হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে ও সেই বিশালতা ধারণা করাইতেই কি আকাশের সৃষ্টি? তবে এই আকাশ দেখিয়া সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে এই আকাশের মত এক, অনাদি, অনন্ত, অজর, অক্ষয়, স্থির, প্রশান্তভাবে অনুভব করিতে ইচ্ছা হয় বই কি! আবার আকাশ দেখিলেই

মনে বড় দুঃখ হয়, এই আকাশের নীচে থাকিয়া আমরা এত সংকীর্ণমনা! তাই আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার উদারতার কথা ভাবি; কিন্তু আকাশ অতি বড়, তাহাকে ধারণা করিতে যাইয়া আত্মহারা হই আর যেন চাঁদের গায়ে মিশিয়া যাই, তারায় তারায়, মেঘে মেঘে ঘুরিতে থাকি। দেখি চাঁদ ছোট বড় মেঘগুলির ভিতর দিয়া কত দ্রুত অথচ কত নিরাপদে হাসিতে হাসিতে পথ বাহিয়া চলিয়াছে, আর মাঝে মাঝে উঁকি দিয়া বলিতেছে—তোমরাও এইরূপে বিপদের ভিতর দিয়া অনায়াসে চলিতে শিখ নতুবা অনন্ত কালেও এই অনন্ত সংসার পার হইতে পারিবে না। তাই আবার মনে হইল, আকাশ! তুমি দেখাও অনেক, শিখাও অনেক, তাই তোমাকে ভালবাসি। সহসা বিদ্যুৎ চমকিল, মেঘ গর্জ্জন করিল—মনে হইল ওপথে বাধা অনেক। যাহা হউক তারাদলের সঙ্গে আমিও চাঁদের পিছু লইব সংকল্প করিলাম, কিন্তু তাহা আর করা হয় নাই, মাঝে মাঝে সংকল্পই করিতেছি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ভাদুড়ী।

রাজসমুদ্র

'রাজসমুদ্র' হিন্দুকুলসূর্য্য রাণা প্রতাপসিংহের বংশধর রাজসিংহের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। ইহা গোমতী নামে একটি বক্রগতি গিরিতরঙ্গিণীর স্রোত কিন্তু একটি বিশাল বাঁধ দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই হ্রদই এখন 'রাজসমুদ্র' বা 'রাজসমুন্দ' নামে কথিত। ইহা রাণা রাজসিংহের জাতীয় মহতী প্রতিষ্ঠার ও রাজপুতকীর্ত্তির প্রমাণক্ষেত্রস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত। ইহা মেবার রাজধানীর সাড়ে বারো ক্রোশ উত্তর এবং আরাবল্লীর পাদপ্রান্ত হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

যে কারণবশতঃ সরোবরের উৎপত্তি তাহা অনুশীলন করিলে ইহার অভ্যন্তরে একটি গভীর সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সে সৌন্দর্য্যের সহিত ইহার আর আর সমস্ত সৌন্দর্য্যই তুলনায় যেন মলিন হইয়া পড়ে। সে কারণ এই বিংশশতাব্দীর সভ্যজগতেও এক যুগান্তর আনিয়া দেয়। রাণা রাজসিংহের

শাসনকালে রাজস্থানের চিরপ্রসিদ্ধ মেবারভূমি অনাবৃষ্টি হেতু ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে আক্রান্ত হয়। নদ, নদী, সরোবর, নির্ঝর, প্রস্রবণ প্রভৃতি সমস্তই বিশুষ্ক। আষাঢ় শ্রাবণ মাস অতীত হইয়া গেল তথাপি এক বিন্দু বারিপাত হইল না। যাহারা কেবল অল্পকার আহার সংগ্রহ করিতে পারিল তাহারা তাহা দুইদিবস আহার করিল। সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ক্ষুৎপীড়িত ও তৃষ্ণাতুর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই করুণ দৃশ্যে প্রজাবৎসল রাণা কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয় দয়া দাক্ষিণ্য ক্ষমা প্রভৃতি স্বর্গীয় গুণগ্রামে বিভূষিত ছিল, সেই জন্যই এই দুঃস্থ প্রজাগণের হৃদয়-বিদারী শোচনীয় দুর্দ্দশায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। রাণা দেবতার কৃপা প্রার্থনা করিবার জন্য ভগবতী চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। কিন্তু হায়! কিছুতেই কিছু হইল না। মেবারের অধিপতি দারুণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাগণের অসীম যন্ত্রণা দূরীকরণার্থ এই বিশাল সরোবর খনন করিতে মনস্থ করিলেন। দৈবজ্ঞের পরামর্শানুসারে ১৬৬১ খৃঃ ৮ই পৌষ মঙ্গলবার হস্তানক্ষত্রে রাজসমুদ্রের বাঁধের জন্য প্রথম প্রস্তরখণ্ড স্থাপিত হইয়াছিল। এই বিশাল সরোবরের সোপান-পংক্তির নির্ম্মাণকার্য্য সমাধান হইতে সাত বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহার প্রারম্ভে ও উপসংহারকালে দেবদেবীর ষোড়শোপচারে পূজা ও নানা-প্রকার বলিদান করিয়া রাণা রাজসিংহ এই বিপুল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার পবিত্র নামানুসারেই এই সরোবরের রাজসমুদ্র বা রাজসমুন্দ নামকরণ হইয়াছিল।

হ্রদের ঈশান ও বায়ুকোণ ব্যতীত আর সকল দিকেই বাঁধ বিস্তৃত। ইহা গভীর জলে পরিপূর্ণ এবং ইহার পরিধি প্রায় ৬।৭ ক্রোশ হইবে। বাঁধের সকল স্থান শ্বেতমর্ম্মর-মণ্ডিত, ইহার শীর্ষদেশ হইতে সরোবরের গর্ত্ত পর্য্যন্ত একটি বিশাল সোপানপংক্তি সমুৎকীর্ণ। সোপান রাজসমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া সংস্থিত তাহাও মর্ম্মরময়। বাঁধ উচ্চ মৃৎপ্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত।

সরোবরের দক্ষিণ পার্শ্বে রাণা একটি নগর ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং নগরী তাঁহার নামানুসারে 'রাজনগর' নামে আখ্যাত। পূর্ব্বোক্ত বাঁধের উপরিভাগে শ্রীকৃষ্ণের একটি মন্দির স্থাপিত আছে তাহাও শ্বেতমর্ম্মরময়। বাঁধের সর্ব্বাঙ্গে তৎকালের উপযোগী নানা প্রকার মনোহর চিত্র শোভিত, সেই

ষষ্ঠ শতাব্দীর শত শত চিত্র আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও ভারতীয় শিল্পনিপুণতার অকাট্য সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তন্মধ্যে একস্থলে বৃহৎ ও সুস্পষ্ট আকারে লিখিত এই সরোবর-প্রতিষ্ঠাতার বংশ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই মহতী প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করিতে রাণা রাজসিংহ ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। জানা যায় যে তাঁহার সমৃদ্ধ সরদার ও প্রজাগণ তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করেন। আবার সরোবরের বাঁধের উপকরণাদি নিকটস্থ শৈল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। যে রাশীকৃত মর্ম্মরশিলা এই বাঁধকার্য্যে লাগিয়াছে তাহা যদি রাণাকে ক্রয় করিতে হইত তাহা হইলে যে আরও কত অর্থ ব্যয়িত হইত তাহা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু মেবার ভূমি রত্নগর্ভা, এরূপ মর্ম্মর শিলা তাহার মেখলারূপিণী অনেক শৈলমালা হইতে সংগৃহীত হইতে পারে।

কীর্ত্তি তোমার অতুলনীয় মহিমা। এই জন্যই কবি গাহিয়াছেন 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি'। আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও আর্য্যবংশীয় ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রজাবাৎসল্য তোমারি গুণে প্রকাশ পাইতেছে। কর্ত্তব্যবিমুখ মানবও তোমার পদানুসরণ করিয়া সংসার সমরাঙ্গনে স্ব স্ব কীর্ত্তিধ্বজা স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। আজ এই রাজসিংহের কীর্ত্তি শুধু রাজপুতনায় নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর সান্যাল।

কার্ত্তিক-বারুণী মেলা *

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির জন্য নদীতীরে সুবিধাজনক স্থানে মেলা জমিয়া থাকে। সাধারণতঃ আমরা মেলার দুইটি দিক দেখিতে পাই, একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং অপর দিকে মেলার আয় হইতে সংসারের দুঃখ-ক্লিষ্ট নর-নারীর দুঃখ মোচনের প্রয়াস। বিলাতে কেমব্রিজের নিকটবর্ত্তী ষ্টৌব্রিজের মেলা খুব প্রসিদ্ধ। ইংলণ্ডের রাজা জন কুষ্ঠ-রোগীদের সাহায্যের

---

* 'Idrakpore is celebrated for a Barnee or fair, which is held in the month of October. It continues for about a fort-night, and is attended by

জন্য এই মেলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমাদের দেশেও কোন কোন স্থলে মেলার আয় হইতে ঐরূপ শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে সাময়িক মেলার উৎপত্তি হয়। কোন একটা ধর্ম্মব্যাপার উপলক্ষ করিয়াই মেলা জমে। হরিদ্বারে কুম্ভমেলা, পাটনায় হরিহর ছত্রের মেলা, পূর্ণিয়ায় কিষণগঞ্জের মেলা, লাঙ্গলবন্ধের চৈত্র-বারুণী মেলা, মুন্সীগঞ্জের কার্ত্তিক বারুণী মেলা, দিনাজপুরের পীরনেকমর্দ্দের মেলা, চট্টগ্রামে মহামুনি মেলা আরও কতশত হিন্দু, মোসলেম ও বৌদ্ধ মেলার উৎপত্তি, ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতেই হইয়াছিল।

ঢাকা জেলার বহুস্থানে মেলা জমিয়া থাকে। তন্মধ্যে মুন্সীগঞ্জের কার্ত্তিক-বারুণী মেলা অতি প্রসিদ্ধ। এক্ষণে আর এই মেলার কোন বিশেষত্ব নাই; আজ কয়েক বৎসর যাবৎ মেলাটি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। নদীর মধ্যস্থলে একটা চর পড়িয়া এই মেলা শ্রী-হীন করিয়াছে,মহাজনদের মাল-পত্র বোঝাই বড় বড় নৌকা মেলার ঘাটে আসিতে পারে না বলিয়া মেলার শেষ চিহ্নও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কেবল যে নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়াতেই মেলার এই দুর্দ্দশা তাহা নয়। পূর্ব্বে ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলার লোক জন এই মেলা হইতে বৎসরের গৃহস্থালীর সমুদয় জিনিষ পত্র

---

people from all the Eastern districts as well as by a few merchants from the Upper Provinces and Calcutta. The articles of merchandise consist chiefly of cloth, cotton, carpets, blankets, catechu, wax, saffan, wood, spices drugs, dyes, iron, brass and copper utensils, and agricultural and other implements'. Taylor.

* The kártik Báruni mela is a large commercial gathering held on the banks of the Dhaleswari in December and January. It used to be the great centre from which trades in neighbouring Districts took their its supplies and is still largely attended; but its importance has declined now that the steamers have brought almost every village on the large rivers into touch with Calcutta.

Imperial Gazeteer of India.

খরিদ করিত, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্র রেল ষ্টীমার সংযোগে নিজ নিজ গ্রামের নিকটে সহজ প্রাপ্য হইয়াছে বলিয়া মেলার এই অধোগতি। য়ুরোপেও সেই অবস্থা। সেখানকার ষ্টৌব্রিজ, বারথলোমিও, লিপজিগ, বারগামো, নিজনিনোভগোরর্ড প্রভৃতি বিখ্যাত মেলার বর্ত্তমান অবস্থাও বিশেষ আশাপ্রদ নয়। রেল ও ষ্টীমার সংযোগে প্রতি গ্রামে প্রতি গৃহে আবশুকীয় বস্তুর আমদানি অতি সহজে হয় বলিয়া মেলার আর আবশুকতা নাই। *

মুন্সীগঞ্জের মেলা ধলেশ্বরীর দক্ষিণ তীরে কমলাঘাট ষ্টেশনের অনতিদূরে জমিত। একটি ধর্ম্মানুষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া এই মেলার উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই উৎপত্তির কাহিনীটি এই :—

৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চ-গৌড়েশ্বর আদিশূর (জয়ন্ত) কানোজ (কোলাঞ্চ) হইতে সাগ্নিক পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। তাঁহাদের বাসস্থানের জন্য রামপাল ও ইদ্রাকপুরের (বর্ত্তমান মুন্সীগঞ্জ) মধ্যবর্ত্তী পঞ্চসার ও দেবভোগ গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। এই পঞ্চসার গ্রামে বিখ্যাত গদাধর পণ্ডিতের পরিবার ও তাঁহার ভক্ত ঠাকুর বল্লভ বাস করিতেন। ঠাকুর বল্লভ ঐশীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। ইঁহার বংশে ব্রজবিহারী, লালবিহারী ও বলরাম গোস্বামীর জন্ম হয়। এই শেষোক্ত গোস্বামীর বাসস্থান দেবভোগে ছিল। পরম ধার্ম্মিক গোপাল দাস বৈরাগী বলরাম গোস্বামীর ভক্ত শিষ্য ছিলেন। সেই সময়ে বিক্রমপুরের বৈষ্ণব সমাজে তাঁহার বড়ই খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। হরিকথা শ্রবণ, হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া, হরিপ্রেমে মজিয়া থাকিতেই ইনি প্রাণে প্রাণে ভাল বাসিতেন। সাধনার সুবিধা

---

* য়ুরোপের মেলার অধোগতি লক্ষ করিয়া Chambers' Encyclopedia র লেখক বলেন,—They were gatherings adopted to a comparatively backward state of society, where the provincial stores of goods were few, and the means of communications defective, the prevalence of good roads, * * *, and improved methods of transport have superseded the necessity for the ordinary classes of fare, and in consequence they have in some cases degenrated into mere scenes of merriment.'

হইবে বলিয়া ইনি নির্জ্জন কাটাখালি * নদীর তীরে আখড়া নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। ভক্ত নিয়ত রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন। কত সময় রাধা-কিষণজীর সঙ্গে কত কি আলাপ করিতেন। ভক্ত ও সাধক অভীষ্ট দেব-দেবীর সঙ্গে আলাপ করেন, একথা অনেক স্থলেই শুনিতে পাওয়া যায়। সাধকের হৃদয়-ঘন ভক্তিরসে ডুবিয়া গেলে ভক্তাধীন ভগবান যে প্রাণের ভিতর সাড়া দেন ইহা বোধ হয় অলৌকিক নয়। গোপালদাস গুরুদেবের উপদেশ-মত নিজ আখড়ায় রাধাকিষণজীর রাসযাত্রা উপলক্ষে একটি ক্ষুদ্র মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে কাটাখালি তীরে মহাসমারোহে হরিসংকীর্ত্তন ও নাম গান হইত। উৎসব দর্শনের জন্য বহু লোকজন সেখানে আসিত। তাহারা রাস-পূর্ণিমার দিন কাটাখালি ও ব্রহ্মপুত্রের মিলন স্থানের স্রোতোজলে স্নান করিয়া দেবদর্শন করিত। এই সময়ে কাটাখালির তীরে সাতদিনের জন্য মেলা জমিত। এই ক্ষুদ্র মেলাই কালক্রমে বিখ্যাত কার্ত্তিক-বারুণী মেলায় পরিণত হইয়াছিল। বাংলায় ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ কালে গোপাল দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথম এই মেলার সূচনা হয়। চতুর্দ্দিক হইতে বহু লোক ক্রয় বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়া কয়েকদিনের জন্য কাটাখালির নির্জ্জন আখড়া মুখরিত করিয়া তুলিত। ক্রমশঃ এই মেলার নাম চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী লোকজন সকলেই জানিতে পারিল। তখন দলে দলে লোক এখানে আসিয়া আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিত। এই সময় হইতে মেলা ১৫ দিন ব্যাপিয়া জমিত। ভক্ত গোপালদাসের মৃত্যুর পর সুধারাম বাউল এবং মুন্সীগঞ্জের জমিদারবর্গ বারুণী মেলা কাটাখালি হইতে তুলিয়া লইয়া যোগিনী † ঘাটের পশ্চিম তীরে স্থাপন করেন। এই সময় হইতে গভর্মেণ্টের কর্ম্মচারিগণ মেলার তত্ত্বাবধান করিতেন এবং ইহা একমাস কাল স্থায়ী হইত।

উত্তরকালে মুন্সীগঞ্জের মুসলমান জমিদার ও গোপাল নগরের রায়বংশের জমিদারগণ এই মেলার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফিরিঙ্গী বাজারের বিখ্যাত জমিদার রামনারায়ণ বাবু এই মেলার অশেষ উন্নতি সাধনে তৎপর

---

* উত্তরে ব্রহ্মপুত্র ও দক্ষিণে পদ্মা এই উভয় স্রোত হইতে কাটাখালির উৎপত্তি।

† জনশ্রুতি এই যে, এখানে রাজকন্যা বরদা কোন যোগিনীর নিকট মন্ত্র লাভ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন।

হইয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে মেলাটি যোগিনীঘাট হইতে ধলেশ্বরী তীরে সরাইয়া নেওয়া হয়। সেই অবধি মেলা এই স্থানেই জমে। তবে মধ্যে মধ্যে নদীর গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা পূর্ব্ব কি পশ্চিমে পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এই মেলা জমির বহু অংশীদার, তন্মধ্যে বালিয়াটির বাবুবংশ, আমিনপুরের সেন-বংশ ও ফিরিঙ্গীবাজারের বাবুরাই প্রধান। মেলার সুশৃঙ্খলার জন্য রাম-নারায়ণ বাবুর পুত্র অধুনা পরলোকগত বিপিন বাবু মালিকদের নিকট হইতে সমগ্র মেলার ইজারা গ্রহণ করিয়া নিজেই মেলার কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার সময়ে মেলা হইতে যথেষ্ট আয় হইত। গোপালদাস বাবাজির সময় মেলায় কোন প্রকার কর গ্রহণ করা হইত না, তবে মেলার শেষ দিন ব্যবসায়ীরা মহাসমারোহে 'মহোৎসবের' আয়োজন করিয়া অসংখ্য কাঙ্গালী ভোজনের ব্যবস্থা করিত। জমিদারবর্গ মেলার শাসন ভার গ্রহণ করিলে কর প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তখন হইতে ব্যবসায়ীগণ মেলার বিভিন্ন স্থানে জাঁক-জমকের সহিত কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, ও সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান করিত। মেলায় শান্তি বিধানের জন্য গভর্মেণ্ট পুলিশ ফৌজ বসাইতেন। কলেরায় বহুলোক মারা যাইত বলিয়া একটি সাময়িক হাসপাতালও প্রতিষ্ঠিত হইত। মেলার কর্ত্তৃপক্ষ গভর্মেণ্টকে পুলিশ ও হাসপাতালের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য টাকা জমা দিতেন।

মেলায় চোর, জুয়াচোর, গাঁইটকাটার বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। স্যর্ লেন-সেট হেয়ার সাহেব তখন ঢাকার কালেক্টর ছিলেন। তাঁহার কঠোর শাসনে মেলা হইতে বেশ্যাগণ তাড়িত হয়; বেশ্যার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে মেলায় চুরি ও জুয়াচুরির কথা বড় শুনা যাইত না। অনেক সময় ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে বিভাগীয় কমিশনর সাহেব মেলা পরিদর্শন করিতে আসি-তেন। মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটের উপর শান্তি রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল।

গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, দিল্লী, জয়পুর, মজঃফরপুর, কলিকাতা, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি বহুস্থান হইতে বণিকগণ এখানে বাণিজ্য করিতে আগমন করিত। মগেরা জাপান ও চিনের কাচ এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য মেলায় লইয়া আসিত। মেলায় প্রায় সহস্রাধিক

দোকান জমিত এবং প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার মাল বিক্রী হইত। মেলার সুদিনে লক্ষাধিক লোক ও ২৫।৩০ হাজার নৌকা উপস্থিত হইত।

সুদূর পেশোয়ার হইতে মেওয়া, উৎকৃষ্ট শাল ও বনাত; শ্রীহট্ট হইতে কমলালেবু ও বেতের নানাবিধ আসবাব; ব্রহ্ম ও আসাম হইতে নানাবিধ কাষ্ঠ ও মোম; কলিকাতা হইতে মনোহারী বস্ত্র, ছাতা, জুতা, ধুতি ইত্যাদি; রংপুর ও পূর্ণিয়া হইতে তামাক; অন্যান্য স্থান হইতে রেশম, লৌহ, কার্পাস, চিনি, মৃগনাভি প্রভৃতি জিনিষ প্রচুর পরিমাণে এই স্থানে আমদানি হইত।

এই মেলা সম্বন্ধে 'History of the cotton manufacture' গ্রন্থে লিখিত আছে—'কার্ত্তিক বারুণী মেলাই 'গেঞ্জে রিজিয়া' *।' 'ঢাকার ইতিহাস' লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন—'এই Gange Regia সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। মেজর রেণেল প্রাচীন গৌড় নগরকে, D'Anville রাজমহলকে, বিলফোর্ড হুগলী নগরীকে Heren ডুলিয়াপুর নামক স্থানকে Gange Regia আখ্যা প্রদান করিতে সমুৎসুক।'

তিনি আরও বলেন,—'হিন্দু রাজত্ব সময় হইতে এই বারুণী মেলার অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম ছিল লক্ষীবাজার (লক্ষ বাজার)। কোনও মহাজনের ব্যবসায়ের মূলধন লক্ষ মুদ্রার ন্যূন হইলে তিনি এই স্থানে বাস করিতে পারিতেন না; ইহাই নাকি বিক্রমপুরাধিপের আদেশ ছিল।'

এই মেলা হিন্দুরাজাদের আমলে জমে নাই, গোপালদাস বাবাজীই এই মেলার প্রথম প্রবর্ত্তক। ইনি ১৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। মহারাজ আদিশূর, কি শ্যামল বর্ম্মা, অথবা কেদার রায়ের সময়ে এই মেলার অস্তিত্বের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। হিউয়েঙ্‌সাংএর 'সমতটের' বর্ণনা হইতেও মেলা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তখন বিক্রমপুর সমতট রাজ্যের রাজধানী ছিল। 'ত বড় একটা প্রসিদ্ধ মেলার অস্তিত্ব থাকিলে চীন পরিব্রাজকের চক্ষে উহা নিশ্চয়ই পড়িত। এ মেলাটি যে দেড়শত বৎসরের অধিক প্রাচীন এসম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

---

* Gange Regia.

এই মেলার রিপোর্টে ঢাকার কালেক্টর ক্লে সাহেব বলেন,—'ধর্ম্মোৎসব হইতে মুন্সীগঞ্জ মেলার উৎপত্তি। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার একটি শাখার মিলিত স্রোতের সংযোগ স্থলে এই মেলার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আজিও ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতেই এই মেলার আরম্ভ হয়; মেলার প্রথম দিন বহুলোক পুণ্যস্রোতে স্নান করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত মেলাটী সর্ব্ববিষয়েই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য জমিয়া থাকে। ইহা ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ তীরে 'গুদারা ঘাটের' চরে জমে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১॥ মাইল এবং প্রায় ৩৫০ বিঘা জমি লইয়া বিস্তৃত। পূর্ব্বে এই মেলা কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন আরম্ভ হইয়া তিন সপ্তাহ কাল স্থায়ী হইত। মেলার সময় ঢাকা হইতে বহু সদাগর মাল পত্র ক্রয় বিক্রয় করিতে এখানে আসে। ইহা ভিন্ন অমৃতসর ও দিল্লী প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও বণিকগণ এখানে বাণিজ্য করিতে আসিয়া থাকে। দক্ষিণ হইতে মগেরা খয়েড় ও নানাবিধ জাপানজাত বাসন পত্র বিক্রয়ার্থ এই মেলায় আনে। এখানে বিলাতী ও দেশী সব জিনিষই পাওয়া যায়। ত্রিপুরা, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, পাবনা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে অনেক পাইকার ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এখানে আসিয়া থাকে। মেলায় গাঁইট কাটা, ব্যবসায়ী চোর, এবং একদল নিষ্কর্ম্মা লোকেরও প্রাদুর্ভাব বেশ উপলব্ধি করা যায়। ইহাদিগের দমনের জন্য গভর্মেণ্ট বিশেষ পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত করেন। কত লোক যে মেলায় আসে তাহা ঠিক বলা যায় না, তবে অনুমান পঞ্চাশ সহস্রের কম নয়। *

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

---

* The Moonsheeganj fair, no doubt, originated in a religious festival, and the locality appears to have been, selected, as forming the junction of the sacred river Bramhaputra with one of the numerous branches of the Ganges. The religious character of the meeting is still so far kept up that the first day is celebrated by a solemn bathing ceremony in the holy water of the river, but all subsequent proceedings are almost of a commercial nature.

The Kartik Baruni.

This fair is held on the Gudara Ghater Char (called also Barunirchar)

সাধনার ধন

আয়রে আয় সাধনার ধন
আয় ফিরে আয়!
যতন করিয়ে নিশিদিন তোরে
রাখিব হিয়ায়।
জগতের জন জানিবে না কেহ
দেখিবে না তোরে,
আমিই কেবল জানিব দেখিব
পূজিব অন্তরে।
কুটিলতা মাখা সংসারে তোমার
রহিবে না অরি,
এ বিশ্ব-মাঝে আমি যে তোমার
তুমি যে আমারি।

শ্রীকৃষ্ণ কুমার চক্রবর্ত্তী।

---

on the rignt bank of the Delassery, nearly opposite Naraingunge, it is about 1½ miles long, and covers an area of some 350 Bighas. It commences with the full moon of the month of Kartik, and lasts usually about three weeks. The majority of dealers and manufacturers who occupy booths come from the city of Dacca, but some few may be noticed from remote places, as cloth and brocade-merchants from Umritseer, dealers in *sundries* from Delhi, and one or two more. Mughs come up from the southward, bringing *kair* (catechu) or Japan earth and other commodities. Bamboos are bought from Sylhet and *Sundari* wood from the Sunderbuns. The articles procurable at the fair are too numerous to be specified here, but they include most goods,European and Native, that are in general demand. To this fair *paikars* or brokers and general dealers flock yearly from the surrounding districts of Tipperah, Furredpoor, Sylhet, Mymenshingh, Pubna and Buckergunge, for the purpose of replenishing their stock of goods which they then distribute to retail dealers, or dispose of to customers throughout the country. The mela is a favourite resort of pick-pockets, professional thieves, and a number of idle vagabonds. To check the depredations and generally to keep order in the place, a Police force is always specially told off and stationed in the fair. The number of people that attended this gathering has never been correctly ascertained ; the lowest estimate is 50,000.

A. L. Clay,
Collector of Dacca.

বিক্রমপুরের প্রাচীন ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তি

কালগর্ভে বিক্রমপুরের প্রাচীন স্থাপত্য-স্মৃতি প্রায় সমুদয়ই লোপ পাইয়াছে। স্থাপত্য-গৌরব-কথা এখন শুধু জনশ্রুতিতেই পর্য্যবসিত। বর্ত্তমান সময়ে বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি-গৌরব-কাহিনী বুঝাইতে হইলে প্রাচীন ভাস্কর্য্য-স্মৃতি ব্যতীত আর কিছুই নাই। একদিন বিক্রমপুর ঐশ্বর্য্য-গৌরবে, শিল্প-গৌরবে কিরূপ গৌরবান্বিত ছিল, বিক্রমপুরের বিবিধ গ্রামে প্রাপ্ত শ্রীমূর্ত্তি সমূহই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যুগ-যুগান্তরের স্মৃতি বহন করিয়া বিক্রমপুরের নানা গ্রামে বিক্ষিপ্তভাবে যে সমুদয় দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় সে সকলের আলোচনা করিলে এক সময়ে বিক্রমপুরে বা পূর্ব্বাঞ্চলে কিরূপ ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইবার পথ সুগম হয়।

বিক্রমপুরের নানা গ্রামের মৃত্তিকা খননে প্রাপ্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ নানা শ্রেণীর মূর্ত্তি হইতে অতীতের ঘটনা বৈচিত্র্য, বিবিধ ধর্ম্মের স্ফূরণ, ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই। মূর্ত্তির ইতিহাস প্রত্যক্ষ ইতিহাস। সে ইতিহাসে নিত্য নূতন তাম্রফলক আবিষ্কারের মিথ্যা কল-কোলাহল ও কাল্পনিক সিদ্ধান্তের বাক্‌বিতণ্ডা নাই। কাল-বিপর্য্যয়ে অধিকাংশ মূর্ত্তি, স্থানান্তরিত, অপহৃত বা অনাদৃত ভাবে যেখানে সেখানে নিপতিত আছে—ক্রমশঃ সে সকলের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পাছে দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকগণের বিঘ্নের কারণ হয় সেজন্য আজ প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ ব্যাপী পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের দ্বারা বিক্রমপুরের বিবিধ গ্রাম হইতে যে সমুদয় দেবদেবী মূর্ত্তির চিত্র ও বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি সে সকলের সচিত্র বিবরণ ধারাবাহিক রূপে 'বিক্রমপুরে' প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। শ্রীরামচন্দ্রের সেতু-বন্ধনে কাঠবিড়ালীর সহায়তার ন্যায় আমার এ সামান্য মঞ্জুরীগিরিদ্বারা যদি দেশের ইতিহাসের সামান্য হিতও সাধিত হয় তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব।

আমরা আমাদের এ আলোচনা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিলাম (১) শ্রীমূর্ত্তি বিবৃতি (২) পৌরাণিক উপাখ্যান (৩) শিল্প-কথা (৪) কাল-নির্ণয় ও

ঐতিহাসিক গবেষণা। (৫) প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্পের তুলনায় সমালোচনা। কাল-নির্ণয় ও ঐতিহাসিক গবেষণা আমরা সর্ব্বশেষে করিব, কারণ ঐ বিষয়টি অতীব গুরুতর, বিশেষ এক সঙ্গে সমুদয় বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইলে সাধারণ পাঠকেরও তাদৃশ চিত্তাকর্ষক হইবে না। আশা করি বিক্রমপুরের এই ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্যেক সহৃদয় বিক্রমপুরবাসী আমাকে সাধ্যানুরূপ সাহায্য করিবেন।

বিক্রমপুরের বিবিধ গ্রাম হইতে আমরা এ পর্য্যন্ত নটরাজ গণেশ, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণুর বিবিধ অবতার (যেমন বরাহ, পরশুরাম, বামন, নৃসিংহ ইত্যাদি) সূর্য্য, নটরাজ শিব, অমোঘশক্তি, মারীচি, উমা-মহেশ্বর, গরুড়, ধ্যানীবুদ্ধ, দ্বিভুজ লোকেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, পঞ্চমুখী শিবলিঙ্গ, ত্রৈলোক্য-মহাভস্মঙ্কর, বৃষ, হর-গৌরী, চুণ্ডারোষণী, মহিষ-মর্দ্দিনী প্রভৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রোক্ত বহু দেব দেবী-মূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছি।

সর্ব্বাগ্রে আমরা সিদ্ধিদাতা বিনায়ক দেবের মূর্ত্তির আলোচনা করিব।

নটরাজ গণেশ।

বিক্রমপুরের নানা গ্রামে আমি এ পর্য্যন্ত পাঁচটি গণেশ মূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছি। তন্মধ্যে দুইটী পূজিত, এবং তিনটি ভগ্ন। এই পাঁচটির মধ্যে আউটসাহী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ গুপ্ত বি. এ. মহাশয়ের বাড়ীতে অযত্নে পতিত গণেশ মূর্ত্তিটি বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। ইহার আলোক-চিত্রই এখানে মুদ্রিত হইল।

আউটসাহী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীর গণেশ মূর্ত্তি।

এই গণেশটি দশভুজ ছিল—কিন্তু কালবশে অন্যান্য হস্তসমূহ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এখন শুধু ষড়্ভুজ বিরাজিত, তাহারও কতক ভগ্ন। আকার ২ ফি, ৮ ই × ১ ফি, ৭ ই। পাদপীঠ ভগ্ন। উর্দ্ধে কীর্ত্তিমুখের পরিবর্ত্তে পঞ্চ আম্রফল ও পঞ্চ আম্র-পত্র। প্রত্যেক দেব-দেবী মূর্ত্তির উর্দ্ধভাগে যে সিংহাস্য চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় উহার নাম কীর্ত্তিমুখ।

কীর্ত্তিমুখ।

আমাদিগকে মূর্ত্তি পরিচয় সম্পর্কে বহুবার কীর্ত্তিমুখের উল্লেখ করিতে হইবে সেজন্য অগ্রেই ইহার পৌরাণিক কথা আলোচনা করিলাম। কীর্ত্তিমুখ হিন্দু ভাস্করের বিশেষ শিল্প চিহ্ন—হিন্দু

আদর্শ। কীর্ত্তিমুখ চিহ্নিত মূর্ত্তি সমূহও আবার অধিকাংশস্থলে ভাস্কর্য্যের চরমোৎকর্ষ। কীর্ত্তিমুখ কি? ইহার পৌরাণিক কাহিনীটুকু কি? কেন

কীর্ত্তিমুখ হিন্দুর তোরণ দ্বারে, মন্দির সম্মুখে, শ্রীমূর্ত্তির পুরোভাগে অঙ্কিত

বা খোদিত হয় সে কাহিনীই এখানে বলিতেছি। পুরাকালে জলন্ধর নামে এক দৈত্য ছিলেন। বিষ্ণুর বরে জলন্ধর অমিতবলশালী—ত্রিভুবন-বিজয়ী দিগ্বিজয়ী মহাবীর। কমলা তাঁহার গৃহে অচলা। সর্ব্বত্র এ দৈত্যবীরের খ্যাতি প্রতিপত্তি। একদিন নারদ জলন্ধর দৈত্যের নিকট আসিয়া কৈলাসস্থ দেবী উমার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিলেন। নারদ বলিলেন 'দৈত্যরাজ তুমি অমিত বলশালী ধন-ধান্যের অধিকারী হইলে কি হইবে? তুমি দুর্ভাগা, কারণ সংসারে মানবের সারসুখ—যোগ্য পত্নীলাভ—কিন্তু তোমার সে স্ত্রী-রত্ন কোথায়? এ বিষয়ে মহাদেবই সুখী, কারণ উমার সহিত শীঘ্রই শিবের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হইবে। নারদের কথায় জলন্ধরের মতি বিভ্রম হইল। শিবকে উমার বিবাহ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য তাঁহার নিকট দৈত্যরাজ রাহুকে দূত পাঠাইলেন। রাহু কৈলাসে যাইয়া মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল "হে শিব, তুমি শ্মশানবাসী, অস্থিভূষণধারী, দিগম্বর, তুমি রমণীরত্ন হিমালয়-তনয়া উমার যোগ্য নও।" রাহু এইরূপ বলিলে ক্রুদ্ধ দেবেশের ভ্রু মধ্য হইতে এক রৌদ্র পুরুষের উদ্ভব হইল। তাহার মুখ সিংহের মত, জিহ্বা লক্‌লক্ করে, নয়ন অনলের ন্যায় দীপ্ত, উর্দ্ধ কেশ, কৃষ তনু যেন দ্বিতীয় নৃসিংহ। এই বিরাট পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াই রাহুকে ভক্ষণ করিতে অগ্রসর হইল। রাহু প্রাণভয়ে ভীত হইয়া দেবেশের করুণা প্রার্থনা করিলে মহাদেব ভীত ও চকিত ব্রাহ্মণকে ক্ষমা করিলেন। রাহু দূত অবধ্য এই কথা বলিয়া মহাদেব তাহাকে নিরস্ত করিলেন। ঐ পুরুষ রাহুকে ত্যাগ করিয়া মহাদেবকে বলিল যে আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, 'আমি কি খাইয়া ক্ষুধা দূর করিব বলুন।' মহাদেব তাহাকে স্বীয় হস্তপদের মাংস ভক্ষণ করিতে বলিলেন। সে তাহার হস্তপদাদির মাংস এইরূপে ভক্ষণ করিল যে এক মস্তক ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিতে পাইয়া দেবাদিদেব বলিলেন,—

ত্বং কীর্ত্তিমুখ সংজ্ঞোহি ভব মদ্দ্বারিগঃ সদা।
ত্বদর্চ্চাং যেন কুর্ব্বন্তি নৈব তে মে প্রিয়ঙ্করাঃ॥

*　　*　　*　　*　　*　　*

তদা প্রভৃতি দেবস্য দ্বারি কীর্ত্তিমুখস্থিতঃ।*

* স্কন্দপুরাণ—বিষ্ণুখণ্ডে কার্ত্তিক মাস মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য। বঙ্গবাসী সংস্করণ।

এই জন্তই প্রত্যেক দেব মূর্ত্তির শীর্ষদেশে সিংহাস্ত কীর্ত্তিমুখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন গণেশের কথা বলি। এই মূর্ত্তিটি তক্ষণ-শিল্পের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন, অত্যুৎকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণের কষ্টিপ্রস্তর-নির্ম্মিত। লম্বোদর গজমুখ প্রমথাধিপ গণপতির

মূর্ত্তির বর্ণনা।

দেহ অতিশয় নিপুণতার সহিত খোদিত। শীর্ষস্থ পঞ্চ চূত ফলের গঠন-নৈপুণ্যে বিস্মিত-চিত্তে শিল্পীকে শত সহস্রবার ধন্যবাদ দিতে হয়। পাথর খুদিয়া এমন স্বাভাবিক ভাবে যাহারা ফল ও পাতা গড়িয়াছে তাহারা কি সাধারণ শিল্পী? পাঁচটি আম্রফলের মধ্যে একটী ফলের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পাঁচটি বোঁটে পাঁচটি ফল দোদুল্যমান। উর্দ্ধে পঞ্চপত্র, মাঝখানে একটী ফল আর নিম্নে বক্রী চারিটি আম। তার নীচে মেঘমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী মাল্য হস্তে অপ্সরাযুগল। ঠিক্ মূল মূর্ত্তির উর্দ্ধভাগে পেখমধারী শিখীযুগল। গণপতির শির কিরীট ও মাল্য শোভিত। কর্ণ দু'টীর অধোভাগ ভগ্ন, ত্রিনয়ন, শুণ্ড অর্দ্ধভগ্ন। এক দন্ত। কণ্ঠে-মণি-রত্ন-রঞ্জিত কণ্ঠহার। নাগযজ্ঞোপবীতধারী। বামদিকের প্রথম হস্ত ভগ্ন, দ্বিতীয় হস্তের অঙ্গুলীসমূহ দ্বারা সর্প মাল্যাকারে ধৃত, তৃতীয় হস্তে বীজ পূরক চতুর্থ ও পঞ্চম হস্ত সম্পূর্ণ রূপে ভগ্ন। দক্ষিণদিকের প্রথম হস্তে কুঠার, দ্বিতীয় হস্তে অক্ষমালা, তৃতীয় হস্তে লড্ডুক, চতুর্থও পঞ্চম হস্ত ভগ্ন। গণপতির বাহুতে বাজু ও কর-প্রকোষ্ঠে কারুকার্য্য-খচিত কঙ্কনবৎ ভূষণ। পরিধানে ক্ষুদ্র বস্ত্র, কিন্তু অতীব কারু-ভূষিত। গণেশ মূর্ত্তির পৌরাণিক ইতিহাসের আলোচনা করার তেমন আবশ্যকতা নাই কারণ উহা সর্ব্বসাধারণের বিশেষ সুপরিচিত। বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড, অমরকোষ, বৃহৎ-সংহিতা ইত্যাদি বিবিধ পুরাণ—গ্রন্থে গণেশের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গণপতি পূজা প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্ণয় করেন। বিক্রমপুরে এ সকল দেবদেবী মূর্ত্তির পূজার প্রচলন কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হয় সে কথা আমরা কাল-নিরূপণ ও ঐতিহাসিক আলোচনা অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিব। গণেশ মূর্ত্তি—রাজসিক মূর্ত্তি।

শ্রীমূর্ত্তির শ্রেণীবিভাগ।

শুক্রাচার্য্যের 'শুক্রনীতি' গ্রন্থে শ্রীমূর্ত্তির শ্রেণী-বিভাগ আলোচিত হইয়াছে। মানব যেমন সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিবিধ

গুণানুসারে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, শ্রীমূর্ত্তি সমূহও তেমনি এরূপ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) যে সকল মূর্ত্তি যোগাসনোপবিষ্ট, উপাসকের প্রতি প্রসন্ন ও বরপ্রদ ও যে মূর্ত্তির চারিদিকে ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রার্থনা-নিরত সে সকল শ্রীমূর্ত্তিকে সাত্বিক কহে (২) বাহনোপবিষ্ট, সালঙ্কৃত, বিবিধ আয়ুধধারী আরাধ্যকে বর ও উৎসাহদাতা মূর্ত্তি রাজসিক। (৩) বহুবাহুধারী, ভয়ঙ্কর, রণ-প্রিয়, অসুরদলনকারী মূর্ত্তিসমূহ তামসিক নামে অভিহিত। গণেশ মূর্ত্তি চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, অষ্টভুজ এবং দশভুজ হইয়া থাকে। মূর্ত্তিটির শিল্প-সৌন্দর্য্য অনিন্দনীয়। এক সময়ে তক্ষণ-শিল্প বিক্রমপুরে কিরূপ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মূর্ত্তিসমূহ হইতে তাহা সুস্পষ্ট সপ্রমাণ হয়। যে প্রস্তরখানিতে মূর্ত্তিখানা নির্ম্মিত তাহার বর্ণ ধূসর। প্রস্তরখানি এত মসৃণ যে মনে হয় এই বুঝি শিল্পী কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আউটসাহী গ্রামের অনতিদূরে একরূপ সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র গ্রামের নাম বলুই। বলুইর পূর্ব্ব নাম 'রাণীহাটি'। রাণীহাটি কোন্ রাণীর নাম-স্মৃতি এতকাল পরে সে কথা কে বলিবে? রাণীহাটি গ্রামের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত ইষ্টক সমূহ প্রাচীনের কীর্ত্তি-ভূষিত জনবহুল নাগরিক সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। এই গ্রামের

গণেশ প্রভৃতি মূর্ত্তির প্রাপ্তি স্থান।

একটী প্রাচীন পুষ্করিণী খনন করিতে বহু দেব দেবী-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। সে সকলের অধিকাংশই লুপ্ত, যে কয়েকটি মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়া যত্নে রক্ষিত আছে তন্মধ্যে গণেশ, বরাহাবতার, নটরাজ, পরশুরাম, বিষ্ণু ইত্যাদি। এ সব মূর্ত্তি কয়টিই ইন্দ্রবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত। গণেশের কথা বলিয়াছি এবার বরাহাবতার মূর্ত্তির কথা বলিব।

বরাহাবতার মূর্ত্তিটির আকার দৈর্ঘ্যে ২ফি ৪ই × ১ফি ৬ই। এ মূর্ত্তিটিও কষ্টিপ্রস্তর-নির্ম্মিত। বরাহাবতার মূর্ত্তি পুরাণাদি গ্রন্থে মহাবরাহ নামে খ্যাত।

বরাহাবতার।

মহাবরাহের পৌরাণিক উপাখ্যান সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। পুরাকালে হিরণ্যাক্ষ নামে এক অসুরাধিপতি দেবগণকে পরাজিত করিয়া সুরপুরে বাস করিতেছিল। ভীত ও লাঞ্ছিত দেবগণ উক্ত দৈত্যপতির কবল হইতে রক্ষা

পৌরাণিক উপাখ্যান।

পাইবার জন্য বিষ্ণুর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলে বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু যজ্ঞবরাহরূপে সেই দানবপতিকে ও তদীয় অনুচর বৃন্দকে ধ্বংস করিয়া দেবগণের রক্ষা

বিধান করেন। অগ্নি, মৎস্য, বরাহ, স্কন্দ ইত্যাদি পুরাণ মতে ইহাই বরাহাবতারের পৌরাণিক ইতিহাস। শ্রীমূর্ত্তিসমূহ প্রায়শঃই ধ্যানানুসারে নির্ম্মিত। ভাস্করগণ

কোথাও শাস্ত্রের ব্যভিচার করেন নাই। বরাহমূর্ত্তির একমাত্র মুখমণ্ডল বরাহের মত, অপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মনুষ্যের ন্যায় চতুর্ভুজ। দক্ষিণদিকের প্রথম হস্তে গদা, দ্বিতীয় হস্তে চক্র, বামদিকের প্রথম হস্তে পদ্ম, দ্বিতীয় হস্তে শঙ্খ। বাম কুর্পরে শ্রী উপবিষ্টা। চরণযুগলে নাগরাজ অনন্ত ও পৃথিবী। পাদপীঠে উপাসক-উপাসিকা এবং পক্ষযুক্ত মনুষ্যাকৃতি গরুড় জানু পাতিয়া উপবিষ্ট। উর্দ্ধে লতাপত্র-পরিশোভিত পুষ্প-কোরক। পুরাণকারের মত এইরূপ বরাহমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিলে রাজ্যলাভ ও সংসার সাগরের পার প্রাপ্তি হয়। মূর্ত্তিটি একরূপ অভগ্ন। তক্ষণ-শিল্পের সৌন্দর্য্যালোচনার দিক্ দিয়া আলোচনা করিতে গেলে এ মূর্ত্তিটি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

বৈষম্য

মায়া কুহকিনী—
হে জননী শুনিয়াছি তোর নামে নাকি
পলায় আপনি
সূর্য্যের উদয়াভাষে ত্রস্ত নিশা সম,
তীব্র শীত-বায়ু
বসন্তের পদার্পণে শিহরিয়া মরে
বিনষ্ট প্রমায়ু।
বৈশাখের রুদ্র রবি লাজে ঢাকে মুখ
বর্ষারে হেরিয়া,
নব বর্ষ এলে দ্বারে শীর্ণ পুরাতন
পলায় রাঙ্গিয়া!
আশা মায়াবিনী
নিত্য কাণে কাণে মোর গুঞ্জরে আশ্বাস
কিন্তু গো জননী
কোথা মুক্তি? মায়া দেছে পরাইয়া ফাঁসী
শত গ্রন্থি দিয়া,

প্রভাত কাঁদিছে মোর তিমির প্রাচীরে
উষারে খুঁজিয়া !
কুহরি কুহরি ক্লান্ত আকাঙ্ক্ষা-বিহগ—
কোথা সে অরুণ ?
ক্ষিপ্র আকাঙ্ক্ষার রণে সব্যসাচী মোর
বিজয় তরুণ !
বসন্ত আমার
শীর্ণ মঞ্জরীর মাঝে ফেলিছে নিশ্বাস,
দারুণ তুষার
কুঞ্জ ভবনের দ্বারে মৃত্যু সম জাগি
কঠোর শাসনে !
শুষ্ক বল্কলের নীচে মৃত কিসলয়
মর্ম্মরে পবনে !
বিগলিত নব ঘন প্রাণদ মোহন
খর রবি করে
প্রসারিত পক্ষে কাঁদে পিপাসী চাতক
ঘন আর্ত্তস্বরে।
বল্ গো অভয়া,
সুধাপানে হলাহল নহিল বারণ
কিসের লাগিয়া !
কোথা তোর নাম-শক্তি দিব্য ইন্দ্রজাল ?
দামিনী আমার
আজ কেন দীপ্তি তোর হেরি না নয়নে—
শুধু যে আঁধার !
হে চির জ্যোৎস্না মম হৃদি-চক্রবালে
নিরাশার সাঁঝে
হাসিয়া উদিত হও বৈষম্য-গোধূলি
মরে যাক্ লাজে।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

ময়মনসিংহের বারেন্দ্রব্রাহ্মণ জমিদার—শ্রীসৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত। ডবলক্রাউন ষোলপেজী ফর্ম্মের ২০৫ পৃষ্ঠা। বহু হাফ্‌টোন চিত্র ও প্রাচীন দলিল ইত্যাদি সম্বলিত। কুমার সৌরীন্দ্র কিশোর রামগোপালপুরের (ময়মনসিংহ) খ্যাতনামা দানশীল ভূম্যধিকারী রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। কুমার সৌরীন্দ্রকিশোর এ গ্রন্থ রচনা করিয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতীর চিরন্তন বিবাদভঞ্জন করিয়াছেন। যাঁহাদের অর্থ ও অবসর আছে তাঁহারা যদি সাহিত্যসেবায় ব্রতী হ'ন তাহা হইলে সাহিত্যের নানাদিক্ দিয়া নানাভাবে বিবিধ কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের সেদিকে তেমন একটা আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। ময়মনসিংহের মধ্যে মুক্তাগাছার মহারাজ সূর্য্যকান্ত ও কালীপুরের খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী ধরণীকান্ত 'শিকার-কাহিনী' ও 'ভারত-ভ্রমণ' এই দু'খানা গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে প্রচার করিয়া সাহিত্যের যে উপকার করিয়াছেন তাহা অপরিশোধনীয় বলিতে হইবে। ধনীসন্তানগণ যদি অসার আমোদে কিম্বা দাম্ভিকতায় মত্ত রহিয়া দেশের ও দশের উপকার করিতে বিমুখ হ'ন তাহা হইলে আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? সৌভাগ্যের বিষয় স্রোত ফিরিয়াছে, তাই কুমার সৌরীন্দ্রকিশোরকে সাহিত্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমরা তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি।

ইতিহাস শুধু যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া নহে—রাজা মহারাজাদের জীবন-কথা লইয়া নহে—উহা নানাদিক্ দিয়া নানাভাবে আপনাকে প্রকাশ করে। সামাজিক ঘটনা—বিপ্লব, দেশাচার, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কথা, দেশের রীতি-নীতি, কৃষি-শিল্প বাণিজ্যের ক্রমিক উন্নতি-অবনতি, সভ্যতার ক্রমবিকাশ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়সমূহের সমষ্টিকেই ইতিহাস কহে। মোট কথা ইতিহাস অর্থে বুঝিতে হইবে যে (It is an acquaintance with the events, the men, the ideas of the past.)

সমাজে ভূম্যধিকারীর প্রভাব অত্যন্ত বেশী। কাজেই জমিদারদের ইতিহাস —দেশের প্রাচীন ঘটনা বিপ্লবের ইতিহাস। আজ যাহারা লক্ষপতি, একদিন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ অতি দীন-দরিদ্র মুষ্টিভিক্ষাপ্রার্থীর ন্যায় হীনাবস্থাপন্ন ছিলেন,

ইহা অতিশয়োক্তি নহে, ইহাই প্রকৃত কথা। ইহাতে লজ্জা বা অপমানের কথা নাই বরং ইহাতে গৌরব অনুভব করিবার বিষয়ই অনেক আছে। সেকালের বীরত্ব সাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দানশীলতা ও মহানুভবতার পরিচয় অনেক ভূম্যধিকারিগণের পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাসে পাওয়া যায়। সৌরীন্দ্রবাবু বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ জমিদারগণের ইতিহাসে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বিবিধ দুর্ব্বলতা, নৈতিক হীনতা ইত্যাদির পরিচয় দিয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ইতিহাস অর্থে—সত্যের ব্যভিচার নহে। আমরা সৌরীন্দ্র বাবুর গ্রন্থ পড়িয়া সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হইয়াছি তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসা দেখিতে পাইয়া—সত্যকে তিনি কোথাও রাখিয়া ঢাকিয়া বলেন নাই। ভাষা অতি সুন্দর—পড়িতে কোথাও বাধে না—নদীর স্রোতের ন্যায় আপনার গতিতে তর তর রবে বহিয়া চলিয়াছে।

গ্রন্থখানা উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। অবতরণিকা অতি সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, বিশেষ কোন কথাই তেমন গবেষণার সহিত আলোচিত হয় নাই—কথাগুলি ভাসাভাসা—এইরূপ গ্রন্থের অবতরণিকা ইহা অপেক্ষা সারগর্ভ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। অবতরণিকা—শুধু জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে, উহাতে কোনও ঐতিহাসিক তথ্যানুশীলনের প্রয়াস নাই। চাঁদরায়ের সম্পর্কিত অনেক কথা উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগের সহিত আলোচিত হওয়া উচিত ছিল—বিশেষ মুসলমান জমিদারের বেগমের 'মেরা ওয়াস্তে কৌন হ্যায়' ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করা সঙ্গত হয় নাই; জনপ্রবাদ অনেক সময় নানা অলীক ঘটনাকে লইয়াই রচিত হইয়া থাকে। চাঁদরায় যে মুসলমান জমিদারের শিরশ্ছেদ করেন তাহার সামান্য পরিচয়ও গ্রন্থ মধ্যে লিখিত হয় নাই। লেখক কোথা হইতে উপাখ্যানটি সংগ্রহ করিলেন? ইহা উপন্যাসে স্থান পাইতে পারে ইতিহাসে নহে। হাতে যখন উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ নাই তখন এ বিষয়টি বিশেষ সতর্কতার সহিত আলোচনা করিলে ভাল হইত না কি?

'মুতাক্ষরীণ' প্রণেতা গোলাম হোসেন যে চীনরায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সে চীনরায় ও চাঁদরায় কি অভিন্ন ব্যক্তি? তাহা ত মনে হয় না। কারণ মুতাক্ষরীণকার কোথাও চীনরায়ের তেমন পরিচয় দেন নাই, তাঁহার গ্রন্থে চীনরায়

সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই আছে। এরূপস্থলে লেখক চীনরায় ও চাঁদরায়কে কোন্ প্রমাণ বলে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া দাঁড় করাইলেন? আমরা কিন্তু চীনরায় ও চাঁদরায় এক ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিতে অক্ষম।

গ্রন্থমধ্যে বহু জীবিত ভূম্যধিকারীর বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আলোচনায় অতিরঞ্জন আছে—তাহা সামান্য হইলেও প্রার্থনীয় নহে। সৌরীন্দ্রবাবু প্রকৃত ঐতিহাসিকের ন্যায় গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে একথা কয়টি বলিলাম। সাহিত্যক্ষেত্রে বৃথা তোষামোদ কিংবা মনস্তুষ্টির বাক্য লোভনীয় হইলেও বাঞ্ছনীয় নহে। আশা করি সৌরীন্দ্রবাবু একথা কয়টি স্মরণ রাখিবেন।

আমরা 'ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার' দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। আশাকরি ক্ষণিক প্রশংসায় বা তোষামোদে বিচলিত হইয়া সৌরীন্দ্রবাবু সাহিত্যক্ষেত্র হইতে দূরে রহিবেন না। তাঁহার যে প্রতিভা আছে, দেখিবার শক্তি আছে, ভাষার উপর অধিকার আছে তাহাতে তিনি যে এক সময়ে একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক হইতে পারিবেন তৎসম্পর্কে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। বর্ত্তমান সমালোচ্য গ্রন্থ ১৩১৭ সনে প্রকাশিত হইয়াছে—তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল—এখনও তাহার দ্বিতীয় খণ্ড বাহির না হওয়া কুমার সৌরীন্দ্রকিশোরের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে। আশা করি তিনি আলস্য ত্যাগ করিয়া পুনরায় কর্ত্তব্যের আহ্বানে এবং দেশের ও দশের কল্যাণে লেখনী ধারণ করিবেন। গ্রন্থের ছবি ও ছাপা—আশাপ্রদ হয় নাই। গ্রন্থে কোনও মূল্যের উল্লেখ নাই।

বাঙ্গলার বেগম—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও অধ্যাপক শ্রীযুত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র। এই গ্রন্থে লুৎফুন্নিসা, আমিনা, আলীবর্দ্দী বেগম, মণিবেগম, ঘসিটী, জিন্নতুন্নিসা প্রভৃতি বাঙ্গালার ছয়জন বেগমের জীবন-কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। মুখপত্রে ঘসিটী বেগমের একখানা ত্রিবর্ণ মুদ্রিত চিত্র সন্নিবিষ্ট। ব্লকখানা 'বিক্রমপুর' সম্পাদক কর্ত্তৃক গ্রন্থকারকে ব্যবহার করিবার জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। অমূল্য বাবুর ভূমিকা অনুরোধে ঢেঁকি গেলা।

তিনি লিখিয়াছেন 'ভূমিকা লিখিতে হইলে, যে সম্বন্ধে লিখিত হইবে, তাহার কিছু আভাষ তাহাতে দেওয়া চাই, কিন্তু বিশেষ অপ্রকাশ্য কারণে আমি গরীয়সীদিগের ঘরের কথা অনুসন্ধান করিতেও প্রস্তুত নহি।' ইহার উপর আর টিকা টিপ্পনী চলেনা—কাজেই অমূল্য বাবুর ভূমিকা—নামে মাত্র ভূমিকা।

ব্রজেন্দ্রনাথের বাঙ্গালার বেগম পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। এই তরুণ যুবকের অক্লান্ত সাহিত্যসেবার প্রয়াস, অধ্যয়ন-স্পৃহা ও বক্তব্য বিষয় বেশ গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা বস্তুতঃই প্রশংসার্হ। লেখকের সাহিত্য-সাধনা অক্ষুণ্ণ থাকুক ইহাই ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি।

মানব চরিত্র গঠন।

দর্পণে যেরূপ মানবের প্রতিকৃতি প্রতিভাত হয় তদ্রূপ চরিত্র মানবের পক্ষে আলেখ্য স্বরূপ। মলিন দর্পণে যেরূপ মুখচ্ছবি বিকৃত দেখা যায় তেমনি মানবের চরিত্র বিশুদ্ধ না হইলে তাহা বদনেই প্রতিবিম্বিত হয়। চরিত্রশুদ্ধি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। চরিত্র যদি পবিত্র না হয় তাহা হইলে মানব কখন শান্তিতে থাকিতে পারে না। ধন সম্পদ শারীরিক শান্তি দিতে পারে, কিন্তু অন্তর নিরন্তর অশান্তি অনলে দগ্ধ হয়। বিশুদ্ধ সুখ ও শান্তির পথ তাহার সমক্ষে ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে। চরিত্র পবিত্র না হইলে, প্রকৃত মহত্ত্ব তাহাকে আশ্রয় করিতে পারে না। অপূর্ব্ব জ্ঞান গরিমা, মানবের বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করিতে পারে সত্য, কিন্তু হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্তল হইতে কি যেন এক মর্ম্মবেদনা তাঁহাকে পরম শান্তির জন্য ব্যাকুলিত করে। মানব-সমাজ তাহাকে সম্মান করে কিন্তু হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহার জন্য চিরলুক্কায়িত থাকে। যাঁহার চরিত্র ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভূমিতে আরূঢ় হইয়াছে দুঃখ দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণ ও সুখ সমৃদ্ধির আলিঙ্গন তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। পূর্ণচন্দ্রের সুবিমল জ্যোৎস্নাসুধা যেরূপ তৃষিত চকোর পান করিয়া তৃপ্ত হয় তেমনি মহাজনদিগের চরিত্রসুধা জনমণ্ডলী পান (অর্থাৎ জীবনগত) করিয়া কৃতার্থ হয়। চরিত্রের সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। বাহিরের সৌন্দর্য্য ক্ষণস্থায়ী ও অসার কিন্তু চরিত্রের সৌন্দর্য্য জগতে নিত্যস্থায়ী। পরমেশ্বর শিশুর পবিত্র মুখকমলে কি সৌন্দর্য্যই

প্রদান করিয়াছেন। বহুমূল্য রত্নাভরণ ও পরিচ্ছদ পরিশোভিত ব্যক্তি হইতে, শিশুর সরলতা, পিতামাতার প্রতি বিশ্বাস, স্নেহ-প্রীতিমণ্ডিত সহাস্য বদনমণ্ডল কি অধিক সুন্দর নহে? ইহা পবিত্র কুসুমের কোরক। কিন্তু যখন কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধ বিস্তার করে তখন উহা আরও মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করে। আবার কখনও উহার বিকাশ হইবার পূর্ব্বেই সংসারের স্বার্থ-পরতা রূপ কীট আসিয়া বিনষ্ট করে। প্রত্যেকের চরিত্র এই বিমল শিশু-চরিত্রের মত গঠন করা উচিত। স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের যেরূপ চরিত্র দিয়াছেন সেই অবিকৃত চরিত্র রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কারণ আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা নির্ম্মল চরিত্রে আবিলতা আনয়ন করি। যে মানব আপনার সৎচরিত্র দ্বারা একটী সংসারতাপদগ্ধ মনুষ্যকে সৎপথে আনয়ন করিতে পারে না, তাহার জগতে আগমন বৃথা। কঠোর কর্ত্তব্যময় মানবজীবনের প্রতিপদে বাধা বিঘ্ন; এই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইলে অত্যন্ত চরিত্রবলের প্রয়োজন। এরূপ চরিত্র বল না থাকিলে পদে পদে বিপর্য্যস্ত হইবার সম্ভাবনা।

এই চরিত্রবলের প্রথমটী বাধ্যতা। বাধ্যতা মানব চরিত্রের একটী বিশেষ গুণ। মানব চরিত্র যে সকল সদ্‌গুণে লোকের নিকট পূজিত হয় বাধ্যতা তাহার অন্যতম। বাল্যকালে গুরুজনের বাধ্য না হইলে পরিণত বয়সে অন্যকে বাধ্য করা সুকঠিন। মানব শৈশবে গুরুজনের বাধ্য না হইলে পরিশেষে জীবন-দেবতার বাধ্য হইবে কিরূপে? চরিত্রকে সুগঠিত করিতে হইলে সকল বিষয়ে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অধীন হইতে হইবে। তাঁহার আদেশ শ্রবণ, তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে হইবে। চরিত্র গঠনের অন্যান্য যাহা কিছু প্রয়ো-জনীয় উপাদান তাহাও তিনি আমাদিগকে প্রদান করিবেন। তাঁহার অধীন হইলে তাঁহার ইচ্ছা আমাদের চরিত্রে জয়যুক্ত হইবে। তাঁহাকে আদর্শ রাখিয়া চরিত্রকে গঠিত করিলে প্রেম, পবিত্রতা বিশ্বাস ভক্তি সকলই তিনি দান করিবেন। তাঁহার ইচ্ছাধীন হইলে সকল প্রকার প্রতিবন্ধক চলিয়া যাইবে। চরিত্র আত্ম-সংযমের বেলাভূমিতে আরোহণ করিবে।

দ্বিতীয়—বিবেকের বল। বিবেক অর্থাৎ ধর্ম্মবুদ্ধি। পশুপাখিগণ ত জীবন ধারণ করে; পশু পাখী বৃক্ষ লতা ও জীবগণও আহার করে, নিদ্রা যায়। তাহা-দিগেরও অভাব বোধ আছে। তাহা হইতে মানব শ্রেষ্ঠ কেন? এই বিবেকের

জন্য। পরমেশ্বর প্রথম হইতে মানব হৃদয়ে এই বিবেককে সৃষ্টি করিয়াছেন। মানব এই বিবেক দ্বারা ঈশ্বরের সহিত পরিচিত হয়। পাপ, অবিশ্বাস নাস্তিকতা প্রভৃতি ইহাকে আচ্ছাদিত করে। বিবেক অর্থাৎ ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে জীবন পরিচালিত করাই প্রকৃত জীবন।

তৃতীয়—সৎ সঙ্কল্প বা সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা মানবকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে লইয়া যায়। এই প্রতিজ্ঞা বল না থাকিলে মানব কিছুতেই এই দুঃখ বিপদময় সংসারের নানা পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। আমরা পৃথিবীতে সকল মহাপুরুষদিগের জীবনেই এই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিতে পাই। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা দ্বারা সকল প্রকার পার্থিব সুখ শান্তি পরিত্যাগ করিয়া, আত্মসংযম দ্বারা ধর্ম্মের দিকে উন্নীত হইয়া, ইহলোকে মহীয়সী কীর্ত্তি এবং পরলোকে অক্ষয় শান্তি লাভ করেন। জীবনকে সকল বিষয়ে সুসংযত করিতে হইলে প্রতিজ্ঞা তাহাকে সহায়তা করে।

চতুর্থ—জ্ঞানবলের প্রয়োজন। জ্ঞান ভিন্ন মানব পশুত্বে উপনীত হয়। প্রকৃত জ্ঞান না হইলে অপকৃষ্ট বিষয়কেই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা হয়, সুতরাং জ্ঞানকে চরিত্রের সর্ব্বাগ্রে স্থান দান করা কর্ত্তব্য। জ্ঞান মানবকে দেবত্ব দান করে।

চরিত্রকে সুগঠিত করিতে হইলে জীবনকে কুসংসর্গ হইতে দূরে রাখা কর্ত্তব্য। কুসংসর্গরূপ বিষবৃক্ষের বীজ জীবনে প্রবিষ্ট হইলে তাহার উৎপাটন করা দুরূহ ব্যাপার। মানব চরিত্র দেব চরিত্রে পরিণত করিতে হইলে, শৈশব হইতেই সৎসংসর্গে থাকা কর্ত্তব্য। কারণ শৈশবে যে কু অভ্যাস জীবনে বদ্ধমূল হয়, তাহা পরিণত বয়সে অন্যায় বলিয়া বোধ হইলেও উহার উচ্ছেদ সাধন করা অত্যন্ত কঠিন। কুগ্রন্থ পাঠ ও কুচরিত্র শ্রবণও কুসঙ্গের অন্তর্গত। কুসঙ্গ যেরূপ মানবকে কলুষিত করে তদ্রূপ কুগ্রন্থ পাঠে মানবহৃদয় বিকৃত হয়। সুতরাং এ সমুদয় আমাদের সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জনীয়।

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

দানশীল ৺রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাদুর

বিক্রমপুর

প্রথম বর্ষ	মাঘ ; ১৩২০	৪র্থ সংখ্যা

বিক্রমপুর

মোদের জননী নদীমেখলা
রম্যা বিক্রমপুর,
প্রকৃতির যেন দুলালী মেয়ে
কণ্ঠে মধুর সুর !
চিরশ্যামল বিটপি তাহার
হরিৎ তাহার মাঠ,
রতনে কাঞ্চনে জড়িত যেন সে
রাজার বিপুল ঠাট !
পুকুরে তাহার কমল শোভে
কুমুদ বরষাজলে,
গগনে তাহার বলাকারমালা
শোভে শ্বেতপুষ্পছলে !
গৃহে শোভে তার মাতৃপ্রতিমা
নারীর সেরা যত,
কোমলে করুণে, সরলে মধুরে
কে আর তাদের মত ?

বল্লালের ভূমি বাবা-আদম
তাপসের পীঠস্থান,
ধন্য করেছে যে পুণ্য দেশেরে
তথায় লভেছি প্রাণ!
চাঁদ-কেদারের প্রতাপে প্রচুর
রঞ্জিত ললাট যার,
এই সেই ভূমি বিক্রমপুর
বন্দনীয় সবাকার!
বৌদ্ধ দীপঙ্কর জনমি যেথায়
বাড়াল মায়ের মান,
জ্ঞানার্থীর সেই বিখ্যাত ভূমি
আজ শুধু ম্রিয়মাণ!
হিন্দু মোস্লেমের স্মৃতিতে জড়িত
প্রতি ভূমিখণ্ড যার,
সে মোর জননী জনমভূমির
পায়ে শত নমস্কার!

সৈয়দ এম্‌দাদ আলী।

——0——

ওঁ তৎসৎ

[স্বর্গীয় রেবতীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিক্রমপুরের সর্ব্ব প্রথমে প্রতিষ্ঠাপিত কাউলীপাড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। সংসারের নানাবিধ প্রতিকূলাবস্থার মধ্য দিয়াও ইনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ইনি ধার্ম্মিক, উদার-চরিত, সন্নীতিপরায়ণ মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। দেশ-প্রীতি স্বজন-প্রীতি প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির দ্বারা একদিকে যেমন তিনি আত্মীয়-স্বজনবর্গের প্রীতির পাত্র ছিলেন অপর দিকে আবার দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি স্ত্রীশিক্ষা-

বিস্তার, এ সকলের প্রতি তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য ও যত্ন ছিল। তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত না হইলে দেশবাসী তাঁহার বিদ্যাবত্তার বহুবিধ কল্যাণ উপভোগ করিতে পারিত।

সংসারে বহুবিধ ধর্ম্মমত আছে। এক হিন্দু ধর্ম্মেরই বহুবিধ শাখা আছে। রেবতীবাবু তাহারই এক শাখা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আধুনিক মনীষিগণ অনেকে সেই মতাবলম্বী, আবার অনেকে তাহাতে আস্থাশূন্য। কিন্তু ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-প্রবণতা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। তিনি এক খানা ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। রেবতীবাবু সেই অসম্পূর্ণ গ্রন্থে যে সকল ধর্ম্ম-নীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যেমন অহিংসা, ত্যাগ, ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক নির্লিপ্তভাবে কাজ করা, ইত্যাদি— তাহার সমুদয়ই তিনি নিজ জীবনে প্রতিপালন করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে। (সম্পাদক)]

২। ধর্ম্ম কি? যাহাতে মনুষ্য দুঃখ নিবারণ করিয়া পূর্ণ সুখ লাভ করিতে পারে তাহাই ধর্ম্ম। পূর্ণসুখ লাভ করিতে হইলে পূর্ণজ্ঞানের আবশ্যক, কারণ মনুষ্য পদে পদেই দেখিতে পায় তাহার জ্ঞান নিতান্ত অপূর্ণ। সে কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইবে এবং এই মহান্ বিশ্বব্যাপার কিরূপ বিজ্ঞানে চলিতেছে তাহার কিছুই জানিতে পারে না। তাহার এই জ্ঞানের অভাবকেই অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা বলা যায়। অভাব দূর হইলেই জ্ঞানের পূর্ণতা হয়।

৩। পূর্ণজ্ঞান কাহার আছে? অবশ্য কাহারও পূর্ণজ্ঞানে এই বিশ্বকার্য্য চলিতেছে। যাহার পূর্ণজ্ঞান তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। আর যিনি এই পূর্ণজ্ঞানের দিকে যতদূর অগ্রসর হইতেছেন তিনিই ততদূর উৎকর্ষ লাভ করেন। এই উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হওয়াকেই ধর্ম্মের কার্য্য বলা যায়। কারণ ইহাতে ক্রমে অভাবকে দূর করিতে থাকে এবং সুখবৃদ্ধি করিতে থাকে। পূর্ণজ্ঞান লাভ করিলে মোক্ষসাধন হয়। পূর্ণজ্ঞানী আনন্দময় হন এবং নিত্যসুখলাভ করিয়া অনন্তরাজ্যে বিচরণ করেন। এই পূর্ণজ্ঞানে একত্বসাধনকেই মুক্তি বা মোক্ষ বলে। কোন মতে (according to Christians) নৈকট্যসাধনকেই মুক্তি বলে। হিন্দুমতে ইহা "ক্রমমুক্তি" মাত্র।

৪। উক্ত পূর্ণজ্ঞানের স্বরূপ কি? "সত্যং জ্ঞানমনন্তং বিজ্ঞানানন্দময়ং শুদ্ধং—অপাপবিদ্ধং শিবমদ্বৈতং"। উহা সত্যস্বরূপ, আনন্দময়, নির্ম্মল, মঙ্গলময়, অদ্বিতীয়। অর্থাৎ উক্ত পূর্ণজ্ঞানই নিত্যসত্য, নিত্য আনন্দময়, নিত্য মঙ্গলময় এবং তাহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই। ইহা হইতে এই হইল যে, অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানতা এবং অচেতন জড়বস্তুও তাঁহার শক্তিসম্ভূত, ওতপ্রোতভাবে তাঁহারই মধ্যে আছে, কিন্তু তাঁহা ভিন্ন নহে। "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব"। ঐশীশক্তিতে সচেতন ও অচেতন উভয়বিধ বস্তুরই বিকাশ করে কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বিকাশ অখিল জ্ঞানেতে পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়।

১৭। মানুষও উক্ত পূর্ণজ্ঞানের বিকাশমাত্র। তাহার প্রকৃতি-আবরণ উঠাইয়া লইলে পূর্ণজ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং উক্ত প্রকৃতি-আবরণ থাকা হেতুই "আমি" "তুমি" উপাধিভেদ প্রতীতি হয়। নচেৎ একমাত্র অনন্ত জ্ঞান সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। অতএব মায়াতে মুগ্ধ না হইয়া উহাকে দূর করাই কর্ত্তব্য।

২০। জ্ঞানের তুল্য পবিত্র বস্তু সংসারে আর কিছুই নাই। বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাকে জ্ঞান বলি না। তাহা কেবল মায়ার অর্থাৎ অবিদ্যার কার্য্য। শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসন দ্বারা বাহ্যবস্তুর বাহ্যাভ্যন্তরস্থিত একমাত্র সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং তাহাদের পৃথক্ নামরূপ অস্তিত্ব কেবল উক্ত চৈতন্যের বিকাশমাত্র, এইরূপ অনুভাবাত্মক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নামই জ্ঞান। এই জ্ঞানই মোক্ষ সম্পাদন করে।

২১। উপরোক্ত জ্ঞান লাভ করিলে মনুষ্য সর্ব্বভূতের অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীর হিতে রত হন এবং তিনি সমুদায় প্রাণীকে সমান দর্শন করেন। তাঁহার কোন প্রকার ভেদ জ্ঞান থাকে না।

২২। যখন মানবাত্মা ঐইরূপ ভাবাপন্ন হয়, তখন সেই মুক্ত আত্মা সর্ব্বভূতস্থ হম এবং সর্ব্বভূত তাহাতে স্থিত থাকে। সেই আত্মা অবিনাশী এবং অনন্ত জীবনে জীবিত। সেই শরীরধারীর শরীরপতন অর্থাৎ মৃত্যু হইলে তিনি পরব্রহ্মে অবস্থিতি করেন এবং দীপ্তিমান ব্রহ্মসাক্ষাৎকার এবং অনন্ত আনন্দ লাভ করেন। তখন তিনি "সচ্চিদানন্দ" রূপী বা "সচ্চিদানন্দ" ময় হন। An eternal joyous state in the blessedness of God.

২৪। ঈশ্বর অতিশয় নিকটে। প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরাত্মাতে (in his soul) প্রকাশ পান। অজ্ঞানতাহেতু মনুষ্য তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। অজ্ঞানীর নিকট তিনি অতিশয় দূরে। কারণ তিনি অজ্ঞানের পর—"তমসঃ পরস্তাৎ"। অতএব ঈশ্বরকে জানিবার জন্য অন্তরাত্মাতেই তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। তিনি গুরু। অন্তরাত্মাতে তিনি সর্ব্বদাই সদুপদেশ দেন এবং সেই উপদেশমতে মানুষ চলিতে পারিলে তাহার অজ্ঞানতা দূর হয় এবং জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়। সেই সদ্গুরুর উপদেশ পাইলেই আত্মার দ্বার খুলিয়া যায় এবং ঈশ্বরদর্শন হয়। He reveals His will in every soul—চিত্তশুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরকে জানিবার ইচ্ছা হয়; তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা ও অভ্যাসদ্বারা তাঁহাকে জানা যায়; তাঁহাকে জানিলেই তাঁহার দর্শন হয়; এবং দর্শনহেতু কর্ম্মক্ষয় হয়; এবং কর্ম্মক্ষয় হইলে তাঁহাতে "প্রবেশ" করা যায়। অর্থাৎ তাদাত্ম্যলাভ হয়। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ, ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে তস্য কর্ম্মাণি, তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"

২৫। প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধি কিরূপে হইতে পারে। মানবাত্মার সহিত বহিঃশরীরের এত নৈকট্যসম্বন্ধ যে শরীরকে পবিত্র করিতে না পারিলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ করা যায় না। অতএব আদৌ শরীরশুদ্ধি আবশ্যক। এই জন্য রীতিমত স্নানাদি ও শরীরকে সুস্থ ও পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে যে "শরীরং খল্বাদ্য ধর্ম্মসাধনং।" শরীরকে সুস্থ ও পরিষ্কার রাখিতে হইলে আহারেরও সুব্যবস্থা আবশ্যক এবং বাসস্থানও পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। এইজন্য খাদ্যাখাদ্যের এবং আচার ও নিয়মের আবশ্যক হইয়াছে। মদ্য ও মাংসাদির দ্বারা শরীর সতত উত্তেজিত করিলে কখনও শরীর শুদ্ধ ও সংস্কৃত হইতে পারে না, অতএব উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব আত্মার উন্নতির জন্য শরীরকে বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে। শারীরিক ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে প্রবল হইয়া অন্তরাত্মাকে কলুষিত না করে তৎপ্রতি যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিতে না পারিলে (that is, without self-control) প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিবেক প্রতিষ্ঠিত হয় না। "বশেহি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা"। এবং উক্ত প্রজ্ঞাশক্তির পরিচালন না করিলে আত্মার উন্নতি সাধন হয় না। আত্মা ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যের দ্বারা জড়িত। ইন্দ্রিয়গণ এবং মন ও বুদ্ধি

প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্তু কিন্তু জড়। তাহাদের দ্বারা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল আত্মা আবৃত হইয়াছে। এই অপরিষ্কার আবরণ দূর না করিলে আত্মার স্বচ্ছত্ব প্রকাশ পায় না। অতএব আচার ও নিয়মের অধীন হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে মানুষের মনুষ্যত্ব হয় না, কারণ পশুবৎ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা চালিত হইলে মনুষ্যজন্ম লাভের সার্থকতা হয় না।

২৬। ইন্দ্রিয়াদির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা সর্ব্বদা প্রবল হওয়া আবশ্যক। এই ইচ্ছা প্রবল করিতে হইলে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক। চেষ্টা করিলেও প্রথমতঃ কৃতকার্য্য হওয়া দুরূহ। কিন্তু এই চেষ্টার দ্বারা বারংবার অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ তাহার ক্ষমতা জন্মিবে। ক্ষমতা জন্মিলেও ইন্দ্রিয়গণের প্রবল-শক্তির দ্বারা বারংবার প্রতারিত ও চালিত হইবার ইচ্ছা থাকিবে। কিন্তু যখন সেই ইচ্ছা (hankering) ও দূর হইবে তখন বৈরাগ্য সংস্থাপিত হইবে। বৈরাগ্য সংস্থাপিত হইলেই ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত থাকিবে। এই ভাবাপন্ন মনুষ্যই মুক্তিলাভে ক্ষমবান্ হইতে পারেন। Christ says. "To him who overcometh, I shall give a crown of life" "নরূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা। অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্বা॥

২৯। সর্ব্বদা অন্তঃকরণে সরলভাব পোষণ করিবে এবং তাহাই বাক্যে পরিণত করিবে। তাহা না হইলে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না। কুটিলতা, মিথ্যা ও পাপ পোষণ করে এবং চিত্তকে মলিন করে।

৩১। অন্তঃকরণে যখনই পাপভাব আবির্ভাব হইবে তখনই উহা ঈশ্বরচিন্তা-দ্বারা দূর করিবে, নচেৎ উহা ক্রমশঃ সংস্কাররূপে আত্মাতে বদ্ধমূল হইয়া আত্মাকে নষ্ট করিবে। আত্মা যাহাতে নির্ম্মল থাকে এবং পাপের দ্বারা মলিন না হয় তজ্জন্য সতত যত্নবান্ থাকা বিধেয়। অতএব যখনই পাপভাবের উদয় হয় তখনই পরব্রহ্মের চিন্তা দ্বারা উহা ক্ষয় করিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলেই আত্মা নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হইবে। আত্মাকে নির্ম্মল ও উজ্জ্বল করিতে না পারিলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। Christ says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God."

৩২। হিংসাবৃত্তি কিছুতেই অন্তরে পরিপোষণ করিবে না। লোকের প্রতি কখনও হিংসাভাব রাখিবে না। কারণ তাহাতে হৃদয় অপরিষ্কার হইবে এবং

দুঃখ বৃদ্ধি হইবে। অপরের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হইবে এবং যে তোমার প্রতি হিংসা করে তাহার প্রতিও তুমি হিংসার ভাব রাখিবে না। তোমার মহৎ অনিষ্ট করিলেও তুমি প্রতিহিংসা করিবে না। হিংসাকারীর উপকার করিতে পারিলে বরং তাহাই করিবে। Know that vengeance is God's, and that you can take only "holy vengeance" by doing good to him who renders mischief unto you.

৩৩। অহংবৃত্তি, অর্থাৎ অহঙ্কারকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। 'আমি করিতেছি' এই জ্ঞানকেই অহঙ্কার বলে। সর্ব্বতোভাবে তুমি তোমার কর্ত্তা নহ ইহা জানিবে। তোমার আত্মাতে ঈশ্বর অধিষ্ঠান থাকিয়া সকল কার্য্য করিতে দেন এই ভাব সর্ব্বদা অন্তরে জাগরূক রাখিবে। "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥" So, says Jesus Christ, "Father, thy will, but not mine, be done". এই অহংবৃত্তিকে লোপ না করিলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। তুমি খাও, তুমি সুখভোগ কর, তুমি কার্য্য কর, সকলই পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবে। তাঁহার প্রীতির জন্যই সমুদায় সংসারধর্ম্ম করণীয় ইহাই হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিবে। "যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তু পশ্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং।" "তব প্রিয়ার্থং সংসারধর্ম্মমনুবর্ত্তয়িষ্যে।" অতএব যাহা তোমার হৃদয় হইতে উৎপন্ন হয় তাহাই ভগবদিচ্ছা জানিবে এবং যাহা তুমি অহংবৃত্তি হইতে ইচ্ছা কর তাহাই পাপেচ্ছা এবং তোমার নিজের ইচ্ছা জানিবে। তোমার এই নিজেচ্ছাকে সমূলে উৎপাটন করিবে। Your own will is enemy to God.

৩৪। সর্ব্বভূতে দয়া করিবে। জন্তুনির্ব্বিশেষে এই দয়া করিবে। যে ব্যক্তি সকল প্রাণীকে দয়া করে সে ঈশ্বরের নিয়ম রক্ষা করে। (fulfils the law of God)—সে অনন্ত সুখের অধিকারী হয়। কোন জীব তাহার প্রতি হিংসা-ভাব রাখে না। "অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্বা যশ্চরতি মুনিঃ। ন তস্য সর্ব্বভূতেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে কচিৎ॥"

৩৫। পরোক্ষে পরনিন্দা করিবে না কিম্বা তাহাতে সহানুভূতি দেখাইবে না।

মনুষ্যের প্রকৃতিতে সাধারণতঃই পরনিন্দা করিতে কিম্বা তাহা শুনিতে ভালবাসে। ইহা পাপমূলক জানিবে।

৩৬। "ছিন্দি, ভিন্দি, পিব, খাদ, পরস্বাপহরয়" (eat and drink, destroy and plunder &c) ইহা আসুরিক কার্য্য জানিবে। আসুরিক বৃত্তি যাহাদের তাহাদিগকেই অসুর বলে। তাহারা নরকযন্ত্রণা ভোগ করে।

৩৮। ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস। স্বার্থপরতাতে মনুষ্যকে লোভী ও নীচ করিয়া থাকে কিন্তু ত্যাগস্বীকার দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন হয়। তুমি প্রতিদিন এইরূপ কোন না কোন বিষয়ে ত্যাগ স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই আত্মাকে পরিষ্কার ও পবিত্র করিতে সক্ষম হইবে। তুমি ক্রমে ঈশ্বরপ্রীতির কার্য্য ভিন্ন আর সমুদায় কার্য্যই ত্যাগ করিতে পার। তুমি সংসারে থাকিয়া নিঃস্বার্থভাবে হৃদয়মন ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া পরমানন্দে জীবন কর্ত্তন করিতে পার অথবা নির্জ্জন প্রদেশে অর্থাৎ দেবালয়ে কিম্বা পাহাড় পর্ব্বতে সন্ন্যাসী হইয়াও বিচরণ করিতে পার।

৪০। ধর্ম্মাচরণদ্বারা আত্মা সজীব হয় এবং পাপাচরণদ্বারা বিনষ্ট হয়। Righteousness leads to life and vice to death. অতএব তোমার পথ যাহাতে ধর্ম্মের পথ হয় এবং আচরণ ধর্ম্মসঙ্গত হয় তাহাই করিবে। পাপকার্য্য দ্বারা আশুফললাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহার পরিণাম অতিশয় কষ্টকর। ধর্ম্মপথে চলিলে আশু কষ্টকর হইলেও পরিণামে তাহার জয় ও স্থায়িত্ব নিশ্চয়। Invincible uprightness of conduct will ultimately be triumphant, although wickedness may for a time bear away the palm.

"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমং।
তৎসুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতং॥"

স্বর্গীয় রেবতীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

স্বর্গীয় রেবতীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্ঞান ও জটিলতা

জ্ঞান কহে "জটিলতা, দুর্ব্বোধ, অসার,
প্রতিপদে বিড়ম্বনা—প্রকৃতি তোমার।"
ধীরে কহে জটিলতা "সত্য বটে সব,
পরাভব মানি বলি তোমার গৌরব।"

শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ।

বিক্রমপুরে গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন

কিছুদিন পূর্ব্বে বিক্রমপুরে এমন একটা ভাব আসিয়াছিল যে গ্রামের পুরাতন—কিছু অমার্জ্জিত নামগুলিকে ভাঙ্গিয়া একটা নূতন নাম দিতেই হইবে। তাহাতে ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে কতকগুলি গ্রামের নাম এমন ভাবে রূপান্তরিত করা হইয়াছে যে সে গুলিকে আর চিনিবার উপায় নাই,—পরিবর্ত্তনের হাওয়া গায়ে লাগায় তাহাদের ঐতিহাসিকতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য জন্মভূমির এই ত্রুটীর বিষয় উল্লেখ করাই প্রয়োজন মনে করিতেছি।

১। শেখের নগরের কথাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। নামটি হইতেই উহার স্থাপয়িতার জাতি প্রকাশ পাইতেছে। তিনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন বলিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উপরে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করা কোন রূপেই বিধেয় নহে। যাঁহারা ঢাকা জিলার প্রাচীন মানচিত্রের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন উহাতে গ্রামটি ঐ মুসলমানী নামেই পরিচিত। কিন্তু পরলোকগত জগচ্চন্দ্র রায় মহাশয় প্রমুখ কয়েকজন সুশিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক তাঁহাদের গ্রামের নামের সহিত মুসলমানের নামের সংশ্রব থাকা বাঞ্ছনীয় মনে না করিয়া উহার 'শেখর নগর' এই হিন্দুনাম দিয়াছেন। ইহাতে গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা শেখ সাহেবের পবিত্র স্মৃতির প্রতি যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহা ঠিক হইয়াছে বলিয়া কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না।

২। চামারদি। গ্রামের নাম ছিল 'চামারদি' হইয়াছে 'চম্পকদি'। ইহা একরূপ কাণা ছেলের পদ্মলোচন নামের মতই হইয়াছে। এই গ্রামের পূর্ব্বতন নামের সহিত যে ইহার জীবন্ত ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে উপনিবেশকারী ভদ্র হিন্দুগণ যদি তাহা একবারও ভাবিতেন! মোট কথা এই গ্রামটি হিন্দু চামার অধ্যুষিত, এবং এই প্রবলতর কারণেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহার 'চামারদি' এই সার্থক নাম রাখিয়াছিলেন! এখনও এই গ্রামে বহু চামার বাস করিতেছে।

৩। চন্দনধূল। পূর্ব্বনাম ছিল 'চলনদুষ্ক', হইয়াছে চন্দনধূল। পূর্ব্বে এই স্থান বিশেষ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, সেই জন্যই তৎকালীন গ্রামবৃদ্ধগণ ইহার মধ্যদিয়া যাতায়াত কষ্টকর মনে করিয়া গ্রামটির এই আমোদজনক নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু এখনকার নামের যে অর্থ তাহার সহিত গ্রামের ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই এবং গ্রামের নামটি শুনিয়া ইহাকে চিনিবার পক্ষে কোন উপায় নাই। স্বর্ণধূল, চন্দনধূল নামগুলি কেবলমাত্র দিদিমার উপকথার স্থান পাইবার উপযুক্ত।

৪। সোনারং। পূর্ব্বে লোকে বলিত সোনার টং। হয়ত সোনা নামে কোন বর্দ্ধিষ্ণু কৃষক এই স্থানে টং নির্ম্মাণ করিয়া তাহার শস্যক্ষেত্রগুলি রক্ষা করিত, এবং তৎপরে যখন প্রথম বসতি আরম্ভ হইল, তখন লোকে গ্রামের নাম সোনার টং রাখিয়াছিল। কে জানে এই নামের সহিত কোন ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে কি না? আমাদেরই অযত্নে আমাদের দেশের কত ইতিহাস যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে কে তাহার সংখ্যা করিবে? আমরা কেবল ললিতকান্ত নামের জন্য লালায়িত, কিন্তু গ্রামের ইতিহাস রক্ষার দিকে আমাদের এক বিন্দু যত্নও নাই।

৫। ইছাপুরা। এই গ্রামকে 'ইচ্ছাপুর' এই হিন্দুনামে পরিবর্ত্তিত করিবার সঙ্কল্প হইয়াছিল, জানি না কি কারণে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ বিশেষ সুখের কারণই হইয়াছে। ইছাপুরা এই নাম হইতে বার ভূঞার অন্যতম স্বদেশপ্রাণ দেওয়ান ইসা খাঁ মসনদে আলীর কথাই স্মরণ-পথে উদিত হয়। হয়ত তাঁহারই নামে তাঁহার কোন ভক্ত আত্মীয় বা কর্ম্মচারী গ্রামের এই নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই নামকরণ সম্বন্ধে খাঁটি ইতিহাস জানার কোন উপায় নাই। ইছাপুরা পূর্ব্বে মুসলমান ভদ্রলোকপূর্ণ ছিল, কিন্তু

এখন তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। তবে পাঠান ভূস্বামী চল্‌বল্‌ খাঁর বিস্তীর্ণ পরিখা-যুক্ত সুবৃহৎ বাড়ীর কথা যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই লেখকের সহিত এক-মত হইবেন। ঢাকার নবাব বাহাদুরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ভদ্রাসন এখন যথায় অবস্থিত, তাহাকেই লোকে চল্‌বল্‌ খাঁর বাড়ী বলিত। যাঁহারা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক দিয়া কখনও ইছাপুরা অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারাই চল্‌বল্‌ খাঁর বাড়ীর দক্ষিণ-পরিখা দৃষ্টি করিয়াছেন। বাজারের সন্নিকট উত্তরে যে গভীর দীর্ঘ জলাশয় দেখা যায় উহাই সেই পরিখার একাংশ। এইরূপ সুবৃহৎ বাড়ী উত্তর বিক্রমপুরে আর দ্বিতীয় নাই, দক্ষিণ বিক্রমপুরে আছে কি না জানি না। যে ভূস্বামী এই বাড়ীতে বাস করিতেন তিনি না জানি কিরূপ ছিলেন? তাঁহার ইতিহাস আজ কোথায়? গ্রামবৃদ্ধগণ যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে কিম্বদন্তি জ্ঞাত ছিলেন তাঁহারাও আজ নাই। এইরূপে আমাদের দেশের কত ইতিহাস—কত বীরত্ব ও সতীত্বের অবদান কাহিনী, কত দাতার, কত ধর্ম্মপ্রাণ পল্লীবাসীর জীবনের কথা, কত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

৬। তেঘরিয়া। এখনও ইহা এই নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে, কোন্‌ দিন যে ইহা রাজানগরের সহিত মিশিয়া গিয়া নিজের অস্তিত্ব লোপ করে তাহার ঠিক নাই। কারণ পূর্ব্বে ইহা একরূপ মুসলমানপ্রধান গ্রাম ছিল, এখন ইহা হিন্দুপ্রধান গ্রাম হইয়াছে। এই গ্রামের নামকরণ সম্বন্ধে যে ইতি-হাস পাওয়া যায় তাহা গ্রহণযোগ্য। ইহাতে তিনটি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার বাস করিতেন, তাঁহাদের উপাধি যথাক্রমে সৈয়দ, চৌধুরী ও লস্কর ছিল। ইঁহা-দের বর্ত্তমান বংশধরগণ বলেন যে এই তিন বংশের বাসভূমি বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছে। এক সময়ে এই তিন বংশই তেঘরিয়ার ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের ভূস্বামী ছিলেন। এখন তাঁহারা নিঃস্ব হইয়া পড়ায় তাঁহাদের প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই উপনিবেশকারী হিন্দু ভদ্রলোকদের হস্তগত হইয়াছে। এক সময়ে ইঁহাদের খুব প্রতাপ ও প্রভাব ছিল, সে সম্বন্ধে এখনও অনেক গল্প শুনা যায়। ঢাকার নিকটবর্ত্তী তেঘরিয়াও সম্ভবতঃ এইরূপ তিনটি হিন্দু পরিবারের বাস ভূমি বলিয়া উক্ত নামে খ্যাত হইয়াছে।

বিক্রমপুরে এমন বহু গ্রাম আছে, যাহাদের নাম পরিবর্ত্তন ইতিহাসের

হিসাবে একান্তই আপত্তিজনক। যেমন সেরাজদি খাঁ, মীরকাদেম, রেকাবী বাজার, ফিরিঙ্গি বাজার, গণকপাড়া, মাল খাঁ নগর, মুন্সীগঞ্জ, মুন্সীর হাট, আব্দুল্লাপুর, কাজির পাগলা, বহর, কাজি কস্‌বা, পাইক পাড়া, সিপাই পাড়া প্রভৃতি মুসলমান নামগুলির পরিবর্ত্তন অবাঞ্ছনীয়, সেইরূপ পঞ্চসার, আমতলী, বেলতলী, রক্ষিতপাড়া, সিংপাড়া, পাটাভোগ, গুয়াখোলা *, বেজের হাটি (ব্রজের হাটি), ষোলঘর, শ্যামসিদ্ধি, ভাগ্যকুল, কামার গাও, বাঘরা, নাগর ভাগ, দোগাছি, কুমার ভোগ, অনন্তসার, মেদিনী মণ্ডল, পরানি মণ্ডর (সংস্কৃত অবস্থায় প্রাণী মণ্ডল—গ্রামের স্থাপয়িতা পরাণ মণ্ডল নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া কেহ তাহাকে আমল দিতে চান্‌না কি না !) দেউল ভোগ, পশ্চিম পাড়া, মধ্য পাড়া, রাজাবাড়ী † প্রভৃতি গ্রামের সামান্য সংস্কারও অবাঞ্ছনীয়। উপরে যে সব গ্রামের কথা বলা গেল, অনুসন্ধান করিলে ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ইতিহাস আবিষ্কার করা যায় এবং আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বান্ধব যোগেন্দ্র বাবুর কৃপায় এইদিকে এখন অনেকেরই দৃষ্টি পড়িবে। তিনি নিজে 'বিক্রমপুর' ইতিহাসে এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমাদের শেষ প্রার্থনা, বিক্রমপুরের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ নিজ নিজ গ্রামকে একটা সুন্দর নাম দেওয়ার প্রলোভনে পড়িয়া যেন গ্রামের ঐতিহাসিকতা নষ্ট না করেন। ইহাতে পিতৃ-পুরুষের স্মৃতির প্রতি অসম্মান করা হয় মাত্র। হিন্দু-মুসলমান একই দেশ-মাতার সন্তান বলিয়া হিন্দু নামের গ্রামে মুসলমানের বাস বা মুসলমানী নামের গ্রামে হিন্দুর বাসে কোন পাপ নাই, ইহাতে বান্ধবতা সূচিত করে মাত্র।

সৈয়দ এমদাদ্ আলী।

---

* গুয়াখোলা। পূর্ব্বে হয়ত এই স্থানে সুপারির বিস্তৃত কারবার ছিল। স্থানটি ইছামতি নদীর তীরে বলিয়া এইরূপ অনুমান করা অন্যায় নহে। পূর্ব্বে বিক্রমপুরে বহু সুপারি উৎপন্ন হইত, হয়ত এই স্থান হইতে তাহা দেশদেশান্তরে প্রেরিত হইত।

† রাজাবাড়ী। বিক্রমপুর পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় তাঁহার "বিক্রমপুর" ইতিহাসে রাজাবাড়ীকে অমর করিয়াছেন, অতএব ইহার সংস্কার করিতে কেহ সাহসী হইবেন না। বিশেষতঃ ইহা হিন্দুনাম, সংস্কারেরও অপেক্ষা রাখে না।

পণ্ডিত জগন্নাথ সার্ব্বভৌম

সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য বিক্রমপুর চিরপ্রসিদ্ধ। স্মরণাতীত কাল হইতে কত বিজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে তাঁহাদের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিরাশি দ্বারা এই স্থানকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। কিন্তু বঙ্গদেশ ও বিক্রমপুরের দুর্ভাগ্যনিবন্ধন এই সকল মহাপুরুষের ইতিহাস আজ কাল চিরতমসাচ্ছন্ন। কিন্তু বিক্রমপুরবাসী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের অগাধ পাণ্ডিত্য কাহিনী জনশ্রুতি পরম্পরায় এখনও সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবাদের ন্যায় কীর্ত্তিত হইতেছে। এইরূপ এক মহাপণ্ডিতের নাম জগন্নাথ সার্ব্বভৌম। তাঁহার সময়ে তাঁহার মত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বিক্রমপুরে আর দ্বিতীয় ছিল না। তাঁহার সম্বন্ধে অবশ্য লিখিত কোন বিশেষ বিবরণ এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার স্বদেশবাসিগণ বংশ পরম্পরায় তাঁহার পুণ্যস্মৃতি এযাবৎ কাল পর্য্যন্ত বহন করিয়া আসিয়াছে। আলোচনা অভাবে তাঁহার এই স্মৃতিটুকুও হয়ত অচিরেই বিলুপ্ত হইবে। "পল্লী-যশোরঞ্জিনী" নামক বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে নিম্নলিখিত কারিকাটী লিখিত ছিল—

"হরি সেনাত্মজৌ পুত্রৌ দ্বাবেব চ গুণান্বিতৌ।
সার্ব্বভৌমো জগন্নাথঃ কনীয়ান্ রামচন্দ্রকঃ॥
বিদিতসকলশাস্ত্রো ধার্ম্মিকঃ সত্যসন্ধঃ।
নিখিলগুণনিবাসো রামবংশাবতংসঃ॥
ধবলবিমলকীর্ত্তী রাজপাশা নিবাসঃ।
সুকবিজনবরেণ্যঃ সার্ব্বভৌমঃ প্রসিদ্ধঃ॥"

ইহা ব্যতীত "পল্লী যশোরঞ্জিনীর" বহু সুললিত কারিকা বিক্রমপুরস্থ বহু পণ্ডিতগণের নিকট শ্রুত হওয়া যায়। সমগ্র গ্রন্থখানি লোকলোচনের অজ্ঞাতে কোন পল্লী-কুটীরে সযত্নে রক্ষিত আছে কি না আমরা অবগত নহি। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহার বিখ্যাত জাতিতত্ত্ববারিধি (প্রথমভাগ) গ্রন্থের ৪৮৩ পৃষ্ঠায়ও উল্লিখিত কারিকাটী প্রকাশিত করিয়াছেন।

জগন্নাথ সার্ব্বভৌম বিক্রমপুরস্থ পদ্মার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ রাজপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুমান ১২৫০ শালে কীর্ত্তিনাশার উত্তাল তরঙ্গরাশি উক্ত গ্রাম গ্রাস করিয়া রাজনগর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। জগন্নাথের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও বৈদ্যবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই টোল রাখিতেন এবং দেশ বিদেশের বহু ছাত্র আসিয়া তথায় সমবেত হইত। জগন্নাথও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-গণের পদাঙ্ক অনুসরণ ক্রমে তাঁহার নিজ গৃহে এক সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। বহু শিক্ষার্থী আসিয়া তথায় সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন। তিনি 'কাব্য জীবনম্' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ ছাপাইবার জন্য তাঁহার এক বংশধর ৺কালীকান্ত চৌধুরী মহাশয় কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত কালীকান্ত সেন চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অভীপ্সিত কার্য্যসম্পাদনের পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। তৎপর আর উক্ত গ্রন্থের কোন সত্বা অবগত হওয়া যায় না। জগন্নাথ সার্ব্বভৌমের টোলে নানাদেশ হইতে বহুছাত্র আসিয়া শিক্ষালাভ করিতেন। এই সকল শিক্ষার্থীর বংশধরগণ উক্ত মহাত্মার মৃত্যুর পরেও তাঁহার বাটীতে আসিয়া শ্রীপঞ্চমীর দিন দেবী বীণাপাণির নিকট অঞ্জলি দিতেন। জগন্নাথের চতুষ্পাঠীগৃহ যেস্থানে অবস্থিত ছিল তাহা পরে "সার্ব্বভৌমের ভিটা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রাজপাশার পূর্ব্বাধিবাসী দুই চারিজন অশীতিপর বয়স্ক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার নিকট উক্ত সার্ব্বভৌমের ভিটা সম্বন্ধে এখনও অনেক গল্প শ্রুত হওয়া যায়। সর্ব্বগ্রাসী কীর্ত্তিনাশা বিক্রমপুরের অন্যান্য কীর্ত্তিসহ জগন্নাথের শেষ কীর্ত্তি সার্ব্বভৌমের ভিটাও বহুদিন হইল গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন গুপ্ত।

সাধ

বড়ই দেখিতে সাধ তারে একবার,
কত যে যতন করে,
কত যে সোহাগ ভরে,
এঁকেছি হৃদয় পটে মূরতি তাহার।
সে মুরতি সেই আঁখি,
সাধ একবার দেখি,
বারেক সুধাই মনে আছে কি না তার
সেই ছুটাছুটি খেলা,
সৃজন প্রলয় বেলা,
প্রভাতে প্রসূন-হাসি, প্রদোষে সংহার।
স্মৃতি সুধু মনে পড়ে,
সেত চাহিবে না ফিরে
গেছে অস্ত আঁধারিয়া হৃদয়-আকাশ
তবুও দরশ আশে হয়রে উল্লাস।

শ্রীস্নেহলতা দেবী।

——0——

তিনদরিয়া

অনেকদিন হইতে দার্‌জিলিংএর বিচিত্র বিরাটরূপ ও অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখিবার সাধ ছিল। কিন্তু নানা কারণে উঁহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষার পর আমার অন্তরঙ্গ জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট জলপাইগুড়ি যাই। এইখানে আসিয়া আমার সেই হিমাচলদর্শনের বাসনা— বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সাধ পূর্ণ হইবার সুযোগ হইয়াছিল। জলপাইগুড়ি সহরটী আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝখানে তিস্তাতীরে বন্ধুর

বাংলো। সুখে স্বচ্ছন্দে, তাঁহার সহিত দিনগুলি কাটিত—সন্ধ্যায় তিস্তাতীরে ভ্রমণ, দুইবেলা পুলিশ কর্ম্মচারীর বাসায় গুরুতর ভোজন, প্রাতে ও সন্ধ্যায় নানাবিধ মিষ্টান্নের সহিত চা-পান, রাত্রে গান ও তাসের মজলিস্ ও এককোণে পড়িয়া আমার নিদ্রা, এই ভাবে দিন যায়। বেশ ছিলাম, তখন না ছিল পরীক্ষার চিন্তা, না ছিল সংসারের ভাবনা, বাঙ্গালীর জীবনে ইহা হইতে আর কি সুখের বিষয় হইতে পারে? আলস্যজড়িত কোমল সুখে ডুবিয়া 'দুর্জ্জয় লিঙ্গ' দর্শনের বাসনা লুপ্তভাবে মনের এক কোণে পড়িয়া রহিল। জলপাইগুড়ি ছাড়িয়া দুইচারিদিনের জন্য পাহাড়টা ঘুরিয়া আসিব একথা বন্ধুবরকে বলা যায় না, বলিলেই তাঁহার সদানন্দ মুখখানিতে কেমন একটা বিষাদের ভাব ফুটিয়া উঠে। একদিন বড়ই জেদ করিলাম। বন্ধু আর আমার জেদের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। মেজাজটা একটু একটু রূক্ষ কি না, বিশেষতঃ মাঝে মাঝে স্থলবিশেষে দুর্ব্বাসার পরিচয় দিতে কোনও কুণ্ঠা বোধ করিতাম না, তাই বন্ধু চুপি চুপি আমার জন্য কতকগুলি গরম জামা তৈয়ার করাইয়া আনিলেন। বন্ধু বলিলেন,—'বেশী দূর যেও না, তিন দরিয়া হইতে কাঞ্চনশৃঙ্গ, এভারেষ্ট প্রভৃতি পর্ব্বত চূড়ার মহনীয় দৃশ্য দেখিয়া ফিরিয়া এস।' আমিত অগ্নিশর্ম্মা। আমি রূক্ষস্বরে বলিলাম—'আমি কোথাও যাব না, কালই দেশে ফিরিয়া যাব। তোমার জিনিষ পত্র এই ফিরিয়া লও!' এই বলিয়া বন্ধুপ্রদত্ত গরম জামাগুলি ছুড়িয়া ফেলিলাম। ছাত্রজীবনের সেই মেজাজ আর নাই। সংসার-আবর্ত্তে হাবুডুবু খাইয়া সব দিক ঠিক হইয়া গিয়াছে। মানুষের 'effervescence of youth' বা গরম রক্ত কয়দিনই বা থাকে! পারিবারিক সংগ্রামে উহা ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। যাহা হউক মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে তিনদরিয়া ঘুরিয়া আসাই স্থির হইল। তিনদরিয়ায় বন্ধুর বন্ধু গুহ-বাবুর এক আত্মীয় ছিলেন। তিনি দারজিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের হেড ক্লার্ক। কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিব এ সংবাদ তাঁহাকে প্রেরণ করা হইল।

যাত্রার দিন রাত্রি ৩টার সময় ঘুম হইতে উঠি। বাসার দুর্গা চাকরকে সঙ্গে লইয়া দারজিলিং মেল ধরিতে বাহির হইলাম। তখনও রজনীর ঘন অন্ধকার অপসৃত হয় নাই। সহরের চারিদিকে নির্জ্জন মাঠ, ঘাট, গলি বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, আশে পাশের গাছপালা জমাট কালো স্তূপের

মত দেখাইতে লাগিল। উষার আরক্তিম স্থবর্ণচ্ছটা পূর্ব্বদিকে সামান্ত একটু ফুটিয়া উঠিতেই শত শত চক্রের বিকট ঘর ঘর শব্দে দশদিক্ নিনাদিত ও দূর

ঘু

দূরান্তর বিকম্পিত করিতে করিতে দারজিলিং মেল প্ল্যাটফরমে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ষ্টেশনে সাহেবদিগের চা পানের উত্তম বন্দোবস্ত আছে; গাড়ী

থামিতে না থামিতেই দেখি দাড়িওয়ালা বাবুর্চ্চিরা চা, রুটী, কলা প্রভৃতি প্লেটে সাজাইয়া 'আঁখি ঢুলু ঢুলু' সাহেবদের মুখের সম্মুখে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চা-পান শেষ হইতেই ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল, আর অমনি দ্রুতগামী মেল ট্রেণ চারিদিক মুখরিত করিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে অনর্গল ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল। ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই দক্ষিণ পার্শ্বে দূরে অতিদূরে, নিবিড় বনানীমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী নবীন নীল মেঘমালার ন্যায় ঊর্দ্ধে আকাশের গায়ে স্তরে স্তরে বিস্তৃত দেখিতে পাইলাম। তন্মধ্যে অনন্ত হিমানীমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘার মেঘচুম্বী তুঙ্গ শিখর সৌর কিরণে ঝক্‌মক্ করিতেছিল। স্বপ্নরাজ্যের চিত্রের ন্যায় হিমালয়ের এই দৃশ্যপট কি অদ্ভুত, কল্পনার অতীত—নয়ন ফিরাইতে পারিলাম না, মুগ্ধ, বিস্মিত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বেলা ৮ ঘটিকার সময় আমরা শিলিগুড়ি ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোকের ছুটাছুট হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গেল। এখানে গাড়ী বদল করিয়া দারজিলিং এর ক্ষুদ্র গাড়ীতে উঠিতে হয়। শিলিগুড়ি উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের Terminus বা শেষ ষ্টেশন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারী এই লাইন ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই দার্জ্জিলিং হিমালয়ান্ রেলওয়ে লাইন প্রথম খোলা হয়। গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেই একজন সাহেব আসিয়া নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন। প্রথমে বুঝিলাম এ বুঝি করমর্দ্দন (?) না—না— তাহা নয়, নাড়ী টিপিয়া প্লেগ পরীক্ষার জন্য এই সাহেব এখানে Special dutyতে নিযুক্ত আছেন। গাড়ী বদল করিয়া আমরা পাহাড়ের গাড়ীতে উঠিলাম। এই লাইনের ছোট ছোট গাড়ী ও ইঞ্জিনগুলি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বসিবার বেঞ্চগুলি মাটী হইতে মাত্র আধ হাত উচু হইবে। প্রতি গাড়ীতে দুইটী করিয়া কামরা এবং প্রতি কামরায় দুইখানি করিয়া বসিবার আসন। গাড়ীর দুইদিক খোলা, বাদলা আসিলে ক্যাম্বিসের পর্দ্দা ফেলিয়া দেওয়া হয়। পাহাড়ে উঠিতে সুবিধাজনক বলিয়াই এই গাড়ীগুলি আকারে ক্ষুদ্র ও হাল্‌কা করা হইয়াছে। প্রায় ৯ ঘটিকার সময় ক্ষুদ্র ট্রেণখানি মন্থর ও বক্রগতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। ট্রামের বেগে গতিশীল গাড়ীখানি কিছুদূর অগ্রসর হইলেই রাস্তার উভয় পার্শ্বে চায়ের বাগান দেখিতে পাইলাম।

গাড়ী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল দেখি ঘনশ্যাম গিরিশ্রেণী, বিহঙ্গমকাকলি-কূজিত অরণ্যানী, বালুকাপূর্ণ ক্ষীণতোয়া মহানদী, পশ্চাতে উন্মুক্ত শ্যামল প্রান্তর ও তিস্তার বিচিত্র শ্যামল শোভাপূর্ণ মনোহর উপত্যকা এক মহিমামণ্ডিত স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল; আর কেমন একটা অভিনবভাবে আমার হৃদয় আপ্লুত হইল। দেখিতে দেখিতে ট্রেণ হেলিতে দুলিতে মহানদীর সুদৃঢ় লৌহ নির্ম্মিত সেতুর উপর আসিয়া পড়িল। পুলের নীচে মহানদীর স্রোত শিলাখণ্ড হইতে শিলাখণ্ডে লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এই সেতুটী দৈর্ঘ্যে সাতশত ফিট। সাত হাজার ফিট উচ্চ 'মহালদিরাম' নামক গিরিশৃঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া এই স্রোতস্বতী জলপাই, পূর্ণিয়া ও মালদহের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া রাজসাহীর অন্তর্গত গোদাগাড়ী নামক স্থানে গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। মহানদীর সেতু অতিক্রম করিয়া গাড়ী শুক্না ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। শিলিগুড়ি হইতে এই ষ্টেশন সাত মাইল। এই স্থান হইতে চড়াই আরম্ভ। রেলগাড়ী এখান হইতে আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের গা দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। এই স্থানের পর্ব্বতের সর্ব্বত্র শ্যাম সৌন্দর্য্য যেন উথলিয়া পড়িতেছিল। রেলের দুই পার্শ্বে ভীষণ অরণ্য, সেই অরণ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ মনোহর পুষ্পলতায় মণ্ডিত ও শৈবালে আবৃত হইয়া মেঘমালার রাজ্য ছাড়াইয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। সেই বিশাল নিবিড় বনমধ্যে ঝিল্লীর কর্কশ রব, প্রফুল্ল বিহঙ্গমের বন্দনগীতি, মহানদীর কুলুকুলু ধ্বনি, ও নির্ঝরের শ্রুতি-মধুর ঝর্ ঝর্ শব্দ পর্ব্বতকন্দরে, শ্যামল বনকুঞ্জে, দূর শৈলশৃঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে,—ইহা ব্যতীত আর কোনও শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। ক্রমে আমরা প্রস্তরময় পার্ব্বত্যপথ ঘুরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। 'পাঁচকিল' পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা এই লাইনের প্রথম লুপে বা চক্রে উপনীত হইলাম। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের যত কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল এই লুপ বা চক্র নির্ম্মাণে। লুপ পাহাড়ের গা বিদীর্ণ করিয়া প্রসারিত, যেস্থানে ঘুর পাক খাইয়া সহজে ও অল্প সময়ে গাড়ীখানি ঊর্দ্ধে উঠিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাকে লুপ বা চক্র বলে। ইহা ভিন্ন অন্য উপায়েও গাড়ীগুলি পাহাড়ের উপর তুলিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে "zig zig" বলে। প্রথম লুপ অতিক্রম করিলেই 'রংটং' ষ্টেশন, ইঞ্জিনে জল

লইবার জন্য এখানে গাড়ী কিছুক্ষণ থামে। এই খানে পর্ব্বতগাত্রে golden fern নামক বহু বিচিত্র বনলতা অপরূপ শোভা বিকাশ করিতেছে।

রংটং এর অপূর্ব্ব দৃশ্য ও গিরিপথের বর্ণনায় শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র দোবে মহাশয় 'দারজিলিং' পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

'এইখান হইতে গিরিশৃঙ্গের মনোহর শোভা দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এবং রেল-পথের নির্ম্মাণকর্ত্তার অসাধারণ কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। যে পর্ব্বতে মানুষ কখনই উঠিতে পারে না, সেই দুরারোহ পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া শত শত আরোহী ও বহুমণ দ্রব্যাদি সহ ট্রেণগুলি কেমন বাঁকিয়া বাঁকিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া ক্রমশঃই উর্দ্ধগামী হয়, তাহা দেখিলে নির্ম্মাণকর্ত্তাকে বিশ্বকর্ম্মা ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না। স্বর্ণলতা যেমন তরুবরকে বেষ্টন করিয়া থাকে, এই রেল পথও তেমনই পর্ব্বতগাত্র বেষ্টন করিয়া আছে। এই শোভা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বিমোহিত হইয়াছেন; যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই মনোরম ও অতুলনীয় দৃশ্যের শতাংশের একাংশও বুঝান অসম্ভব।

রংটং ছাড়িয়া শিলিগুড়ি হইতে ২০ মাইল দূরে তিনদরিয়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই পর্য্যন্তই আমার টিকিট ছিল। এই স্থান সমুদ্রতল হইতে ২৮২২ ফিট উচ্চ। ষ্টেশনে অবতরণ করিতেই দেখি চিঠি হস্তে আমার জন্য একটী লোক অপেক্ষা করিতেছে। তাহার সঙ্গে গিরিশ বাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা ১১টা হইবে। গিরিশ বাবুর বাড়ী বিক্রমপুর, ইনি অনেককাল এই লাইনের হেড্‌ক্লার্ক পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইঁহার নিকট হইতে এই লাইনের বহু সংবাদ প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমার খস্‌রা কাগজ-খানি হারাইয়া ফেলায় অনেক কথাই স্মৃতি হইতে লিখিত হইল। তাঁহার মতে তিনদরিয়া খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। লোকসমাগম বেশী নয় বলিয়া এ স্থানের জল বায়ু এখনও ভাল আছে। এই স্থান হইতে নীচে অনেক দূর পর্য্যন্ত তিস্তার উপত্যকা দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। সেই অবর্ণনীয় সুকৌশলচিত্রিত দৃশ্যপট আজও আমার স্মৃতিপথে জাগ্রত। কিন্তু ইহার একটা সম্যক্ বর্ণনা ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে আমি অক্ষম। রেলওয়ের কারখানা ও উপত্যকা দৃশ্য ভিন্ন এ স্থানের আর কোনও বিশেষত্ব নাই। দারজিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে গল্পটা এই:—অতি পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে 'ডাণ্ডিতে' লোকজন ও ডাক দারজিলিংএ যাইত। একদিন মাননীয় ছোটলাট স্যার এস্‌লি ইডেনের গৃহে ভোজ ও বল নাচের ব্যবস্থা ছিল। ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি দুর্য্যোগ হেতু ভোজের ফলমূল ও অন্যান্য জিনিষপত্র ঠিকসময়ে দারজিলিং পৌঁছিতে পারে নাই। এই অসুবিধা নিরাকরণের জন্য সেই দিন রাত্রেই ছোট লাট সাহেব

বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মিঃ লিজলির সহিত পরামর্শ করিয়া পাহাড়ে গাড়ী খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাই হইল এই লাইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

গিরিশ বাবুর বাসায় জলযোগ করিয়া বেলা সাড়ে বারটার সময় তিনদরিয়া ওয়ার্কসপ পরিদর্শনে বাহির হইলাম। একজন চাকর পথ প্রদর্শনের জন্য সঙ্গে লইলাম। বাসা হইতে কারখানার রাস্তার উভয় পার্শ্ব নানাবিধ মনোহর তরুলতা ও শ্যামল তৃণপুঞ্জে পরিপূর্ণ। কারখানা গৃহের দ্বারে পৌছিয়া গিরিশ বাবুর নাম করিতেই আমরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলাম। কারখানার বড় বড় করগেটেড্ শেডের বিভিন্নাংশে লোকজন কর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিলাম। চতুর্দ্দিকে লোহা লক্কড় বয়লার নল ও রেল প্রভৃতিতে সমাকীর্ণ। কোথায়ও ইঞ্জিন ফিট করা, কোথায়ও বা মেরামত, কোথায়ও গাড়ীতে রং করা, কোথায়ও 'স্ক্রু' তৈয়ার করা প্রভৃতি কাজ চলিতেছে। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টায় কারখানার সমস্ত বিভাগের মোটামুটি কাজকর্ম্ম দেখিয়া বাহিরে আসিলাম। অনেক দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা উচু পাহাড়ে গিয়া উপস্থিত হই। এই পাহাড়ের গাত্র ভেদ করিয়া 'হিলকার্ট' রোড কারশিংএর দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তা শিলিগুড়ি হইতে ৪০ মাইল। বহু অর্থ ও অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে এই পথটী প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কার্ট রোড্ নির্ম্মাণ সময়ে পর্ব্বত গাত্রের যে যে স্থানে দাঁড়াইয়া কাজ করিবার সুবিধা ছিল না, সেই সেই স্থানে উপর্য্যুপরি হুক মারিয়া, হুক ধরিয়া, হুকের উপর পা রাখিয়া পথ কাটিতে হইয়াছিল। মাঝখানে বড় বড় পাথর পড়িলে সেই গুলিকে অগ্নি ও বারুদ অথবা ডিনামাইট সংযোগে উড়াইয়া দেওয়া হইত। এই ভাবে ইঞ্জিনিয়ার ও কুলিদের অদম্য উৎসাহ ও সাহসে সাতহাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বতের উপর গিরিপথ খোলা হয়। তিনদরিয়ার এই উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া আমি চারিদিকে নিরীক্ষণ করিলাম। দূরে শস্যশ্যামলা তিস্তা উপত্যকা, কারশিংএর দিকে চিরতুহিনমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা ও রজতরেখা তিস্তা, পর্ব্বতের কোলে মেঘের লীলায়িত গতি, ক্ষণে ক্ষণে বিশাল পার্ব্বত্য প্রদেশ ঘন কুয়াসায় ডুবিয়া যাওয়া প্রভৃতি মহান্ দৃশ্যের চিত্র আলো ও ছায়ার মধুর মিলনের ন্যায় আমার নয়ন সম্মুখে ক্ষণস্থায়ী একটা স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। শৈল প্রকৃতির এই বিচিত্র সৌন্দর্য্যলীলায় অপূর্ব্বত্বে আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম, এই পরম

রমণীয় দৃশ্য অপূর্ব্ব, কল্পনার অতীত, ধারণা ও বুদ্ধির অগম্য, ইহা যিনি নিজ চোকে দেখেন নাই, তাঁহাকে তাহা বুঝান অসম্ভব।

পাহাড়ের উপর বৃক্ষতলে বসিয়া চতুর্দ্দিকের ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যের চিত্তহারী সৌন্দর্য্যমধ্যে ডুবিয়া গিয়াছি, এমন সময়ে দেখি দূরে অন্য একটা পাহাড়ের গায়ে তুলার ন্যায় শুভ্র মেঘগুলি উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে কুয়াসার জালে পাহাড়টা ঘিরিয়া ফেলিল, আবার পর মুহূর্ত্তেই সূর্য্যালোকে সব দিকটা হাসিয়া উঠিল, এই আলো এই অন্ধকার, উভয়ের কি সুন্দর সম্মিলন!

'ছায়া-রৌদ্রে কোলাকুলি, এ কি দৃশ্য? বুঝিনু তখন,
একদিকে প্রেম হাসে, অন্যদিকে নিশ্বাসে মরণ।'

তখন আমার মন ভক্তি বিস্ময় ও আনন্দে ভরিয়া গেল;--এই সমস্ত মহান্, সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অজ্ঞাতে চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, ভক্তিভরে মস্তক অবনত হইল, বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। পাহাড়ের কোলে বসিয়া একখানা চিঠি লেখা শেষ করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। পোষ্টাফিসে সেই চিঠিখানা ফেলিয়া গাড়ী ধরিতে ষ্টেশনে ছুটিলাম। ষ্টেশনে আসিয়া পা দিতেই কলিকাতাগামী মেলট্রেণ প্লাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই গাড়ীতে চাপিয়া রাত্রি ৯ টায় জলপাইগুড়ি পৌঁছি। গাড়ীতে পূজাযাত্রিগণ মেঘমালার রাজ্যে শারদীয়া পূজা শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। জনৈক প্রৌঢ় রাজকর্ম্মচারীর ভৈরব চীৎকারে আমি বড়ই উত্যক্ত হইয়াছিলাম। লোকটা মদ খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, মাঝে মাঝে মদের জন্য চীৎকার করিত। মাতালের কাণ্ডটা দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইল। গাড়ী হইতে নামিবার সময় দেখি মাতালটা বেঞ্চের উপর পড়িয়া আছে, সঙ্গে একটা সাহেবী ধরণে 'বয়' ছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। বন্ধুবর আমার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন, উভয়ে একত্র হইয়া বাসায় ফিরিয়া গেলাম। এই হইল আমার 'দুর্জ্জয় লিঙ্গ' দর্শন! ইচ্ছা থাকিলেও অনেক সময় আশানুরূপ কাজ হয় না, অনেক তীর্থযাত্রীর যেমন সময় বিশেষে "দাঁতুনের জগন্নাথই" পুরীর জগন্নাথ হইয়া দাঁড়ায়, আমারও তেমন তিনদরিয়া পাহাড় দারজিলিং হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

রাঁচি।　　　　শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

টেপাই

(বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত উপকথা)

এক মস্ত বড় সওদাগর। সওদাগরের সাতপুত্র—এক কন্যা। কন্যার নাম টেপাই। টেপাই বড় আদুরে মেয়ে। বাপ মা সকলেই তার আব্দার পালন করেন। পূর্ণিমার সন্ধ্যা, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হইয়াছে, চাঁদ দেখিয়া টেপাই বাপকে চাঁদ পাড়িয়া দিবার জন্য বায়না করিয়া বসিল। বাপ বলিলেন—'মালক্ষ্মী! একি সম্ভব? আকাশের চাঁদ কি ধরা যায়? সে যে অনেক দূর!' কিন্তু টেপাই নাছোড়বান্দা, কাঁদিয়া আকুল, শুধু ঐ এক আব্দারের কথা, 'বাবা, যে করে হয় আমায় চাঁদ পেড়ে দাও।' সওদাগর স্নেহময়ী কন্যার কান্না দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বাড়ীর তেতালার ছাতের উপরে একটা সিঁড়ি লাগাইয়া তাহার উপর হইতে একটা আঁকুসি দিয়া চাঁদ পাড়িবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হঠাৎ সিঁড়ির উপর হইতে তাঁহার পা পিছলাইয়া গেল, সেখান হইতে নীচে পড়ামাত্রই তাঁহার মৃত্যু হইল। বাপ মারা গেল তবু কিন্তু টেপাইর চাঁদ পাইবার বায়না কমিল না। সে এবার মাকে ধরিয়া বসিল 'মা আমায় চাঁদ দাও।' বাপের মত মাও টেপাইর আব্দার পূরাইতে যাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। স্নেহময় পিতা স্নেহময়ী মাতা টেপাইর নিজের দোষে অকালে প্রাণ হারাইলেন।

এখন টেপাইর বড় কষ্ট। এখন আর তাহাকে আগের মত আদর যত্ন কে করিবে? তাহার শরীরের সে শ্রী নাই, মুখের সে হাসি নাই, সে আদর আব্দার কিছুই নাই। সাত ভাইর সাত বৌ। বড় ছয় বৌর কেহই টেপাইকে দু'চোখে দেখিতে পারে না। কেবল সকলের ছোট ভাইর স্ত্রী গোপনে গোপনে আদরিণী ননদার আদর যত্ন করিতেন। সাতভাই ছোট বোনটিকে খুব যত্ন করিতেন ও ভালবাসিতেন কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা সকলেই বাণিজ্য করিতে নানা দেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। টেপাই এখন সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকে, ক্ষুধায় আকুল হইলেও সে ভয়ে ভয়ে পেট ভরিয়া খায় না—এখন তাহার রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ

দেখিলে আর পূর্ব্বের শ্রী বুঝিবার সাধ্য নাই। এদিকে ভাইরা সংবাদ দিয়াছেন যে তাঁহাদের বাণিজ্য হইতে ফিরিতে আরও একবৎসর সময় লাগিবে। এ সংবাদে বড় ছয় বৌয়ের বড়ই আনন্দ হইল—কেমন করিয়া টেপাইকে দূর করিতে পারিবেন সে সুযোগের চেষ্টায় রহিলেন। কেবল টেপাইর ছোট বৌদিদি সকলের আসিবার দিন গণিতে লাগিলেন।

২

বাহিরে কুভাব দেখাইলে পাছে টেপাই মনের ভাব বুঝিতে পারে এজন্য বড় ছয় বৌ বাহ্যিক ভাবে তাহার প্রতি বড়ই মধুর ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনে মনে তাঁহারা একটা উপায় ঠিক করিলেন। টেপাইকে সহ তাঁহারা একদিন নদীতে স্নান করিতে চলিলেন। ছয় বৌ ছয় পাল্কীতে আর টেপাই ও তাহার ছোট বৌদিদি এক পাল্কীতে চড়িয়া রওয়ানা হইলেন। দাসীরা কাপড় চোপড় লইয়া হাটিয়া চলিল। ছোট বৌ কাপড়ের ভিতরে লুকাইয়া একটী ছোট বালিশ সঙ্গে লইলেন। টেপাই একটী টিয়া পাখীকে পালন করিত, সে তাহার বড় আদরের টিয়াপাখীটিকেও সঙ্গে লইতে ছাড়িল না। বড় নদী। ওপাড়ের গাছপালা গুলো ভাল করিয়া চেনা যায় না। ঢেউ তুলিয়া নাচিতে নাচিতে সাগরের দিকে বহিয়া চলিতেছে। পাল তুলিয়া পালে পালে নৌকা নানা দেশ-বিদেশে ভাসিয়া চলিয়াছে। নদীর জলে ছয় বৌ স্নান করিতে লাগিলেন। ছোট বৌ নদীর ঘাটে বসিয়া ননদার গায়ের মলা তুলিয়া দিতেছিলেন। এমন সময় বড় বৌ টেপাইকে বলিলেন—'আয় না বোন, তোকে সাঁতার কাটিতে শেখাই।' টেপাই আনন্দে হাসিতে হাসিতে বড়বৌর নিকটে আসিল। বড় বৌ সাঁতার শিখাইবার ছল করিয়া ননদকে গভীর জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। এবং কুমীরে টেপাইকে ধরিয়া লইয়া গেল বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সকলকে লইয়া তীরে উঠিলেন। ছোট বৌ ব্যাপার কি বুঝিয়াও ভয়ে ভয়ে নীরবে রহিলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হইল টেপাইকে কুমীরে হত্যা করিয়াছে।

৩

টেপাইকে জল হইতে ফিরিতে না দেখিয়া ছোট বৌ তাহার বালিশটি ও টিয়া পাখীটিকে জলে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। এদিকে টেপাই অতি কষ্টে নদীর

অপর পারে যাইয়া উঠিল। সে বালিশটি ও টিয়া পাখীটিকেও কোন রকমে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিয়াছিল। তীরে উঠিয়া শীতে তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। এখন তাহার বাপ, মা, ভাই সকলের কথা মনে পড়িয়া বড়ই কান্না আসিল। একে একে তাহার ঘর বাড়ী ছোট বৌদিদি সকলের কথা মনে পড়িল, তাহাদের কথা মনে হইয়া তাহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইল। টেপাই একাকিনী টিয়া পাখীটিকে হাতে করিয়া ও বালিশটীকে বুকে করিয়া নির্জ্জন নদীর তীরে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রাখালবালকগণ দলে দলে ঘরে ফিরিয়া চলিয়াছে। বিজন নদীতীরে একটী সুন্দরী বালিকাকে একাকিনী কাঁদিতে দেখিয়া তাহারা একে একে সেখানে আসিয়া মিলিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল কেন সে একাকিনী বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে? তাহারা একে একে বিবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। টেপাই আদ্যোপান্ত যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিল। তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হায়! হায়! করিতে লাগিল। রাখালবালকেরা তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজেদের বাড়ীতে লইয়া আসিল। টেপাই কৃষকদের বাড়ীতে অতি আদর ও যত্নের সহিত গৃহীত হইল। ছেলেরা তাহাকে বোনের মত এবং কৃষক ও কৃষক-পত্নীরা আপন বাপ মায়ের ন্যায় যত্ন করিতে লাগিল। টেপাই কৃষকদের আদরে যত্নে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। সামান্য নিরক্ষর কৃষকপল্লীতে যে স্নেহ যত্ন পাইল—তাহার শিক্ষিতা ভ্রাতৃবধুদের নিকট হইতেও সে তাহা পায় নাই। সে এখন হৃদয়কে দমন করিতে শিখিয়াছে—বুঝিয়াছে সংসারে সুখ দুঃখ কখনও স্থায়ী হয় না। এক দিন নিশ্চয়ই তাহার এই দুঃখের রজনীর অবসান হইবে।

৪

এক বৎসরের অধিক হইল টেপাই কৃষক-পল্লীতে বাস করিতেছে। বর্ষাকাল। একদিন সন্ধ্যা হইতেই ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। টেপাই কুটীরের দরজা খানি বন্ধ করিয়া ঘরের এক কোণে আগুণ জ্বালিয়া চুপ করিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতেছিল—হায়! এমন ভীষণ ঝড়ে যদি আমার দাদাদের কোন অনিষ্ট ঘটে! যদি তাঁহারা কোন দেশ হইতে রওয়ানা হইয়া থাকেন! আর কি আমি তাঁহাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারিব? ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, ঝড়-জলও একটু কমিল। আকাশও পরিষ্কার হইল। টেপাইর

চোখে ঘুম নাই, তাহার মন আজ প্রবাসী ভাইদের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

এদিকে সেই নদীর তীরে ঠিক্ ঝড়জলের সময় সাতখানা বাণিজ্য-তরী নঙ্গর করিয়াছিল। বাণিজ্য-তরীর কর্ত্তাগণ ঝড়জলের প্রকোপে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে ঝড় জল কমিয়াছে দেখিয়া তাঁহারা ভৃত্যদের ডাকিয়া বলিলেন, 'আজ এপর্য্যন্ত একটী দানাও দাঁতে কাটিবার অবসর জোটে নাই। এখন ঝড়জল কমিয়াছে, ঐ দূরে একটী গ্রাম দেখা যাইতেছে। ঐ দেখ একটা আলোও দেখা যাচ্ছে, নিশ্চয় ও কৃষক পল্লী। যাও ওখান থেকে খাবার জিনিষপত্র জোগাড় করে নিয়ে এস।' ভৃত্য 'যে আজ্ঞে' বলিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইল। টেপাই কি করিবে! দুর্ভাবনায় অস্থির হইয়া সবে মাত্র বিছানায় শুইয়াছে। এমন সময় তাহার প্রিয় টিয়া পাখীটি বলিয়া উঠিল।

গা তোল গা তোল টেপাই,
ভাত বাড় এল সাত ভাই।

টেপাই বলিল—

অভাগা অভাগা টিয়া
ঘন ঘন ডাকিস্ কিয়া ?
বাপ মরিল চাঁদ পাড়িতে,
মা মরিল চাঁদ ধরিতে,
সাত ভাই বাণিজ্যে গেল!
সাত বৌ ঘরবাসী,
আমি অভাগী বনবাসী।

এদিকে ঐ যে সওদাগরদের ভৃত্য সে কুটীরের নিকটে দাঁড়াইয়া পাখীর ও মানুষের এই সমুদয় কথা শুনিতেছিল! সে অবাক্ হইয়া সমুদয় কথা সওদাগরদের নিকট যাইয়া বলিল। সাত ভাই এ কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বলিলেন, আমাদের বাপ মাই ঐভাবে মরিয়াছেন। আমরা সাত ভাই বাণিজ্যে আসিয়াছি, নিশ্চয়ই সাত বৌ আমাদের আদরের ছোট বোন্‌কে কোনরূপ নির্য্যাতন করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সাত ভাই তখনি সেই চাকরকে সঙ্গে লইয়া কুটীরের দিকে দৌড়িয়া চলিলেন। এবং কুটীরের নিকট

গিয়া সাত ভাই সমস্বরে চীৎকার করিতে করিতে কুটীরের দরোজা খুলিয়া ফেলিলেন। টেপাই সাত ভাইকে এরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া হর্ষ-বিষাদে বিহ্বল হইয়া পড়িল। সাত ভাই আদরের ছোট বোন্‌টির চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া একে একে সকল কথা শুনিলেন ও বলিলেন।

রাত্রি ভোর হইলে কৃষকদিগকে বহুমূল্য বস্ত্রাদি পারিতোষিক দিয়া ভগ্নীকে সহ দেশে গেলেন। সাত ভাই বাড়ী পঁহুছা মাত্রই ছয় বৌ টেপাইর নামোচ্চারণ করিয়া ক্রন্দন যুড়িয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন যে টেপাই রাজরাণীর মত বহু মূল্য বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া সাত ভাইর সহিত বাড়ীতে প্রবেশ করিল। ভৃত্যগণ বহু ধন রত্ন নৌকা হইতে তুলিয়া আনিতেছে, তখন আর তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহাদের কৃত্রিম কান্না ফুরাইয়া গেল। টেপাই বাড়ীতে পঁহুছিয়াই ছোট বৌদির গলা জড়াইয়া ধরিল। বড় ছয় বৌকে—বড় ছয় ভাই বনবাসে দিলেন। টেপাই বৌদের ক্ষমা করিবার জন্য ভাইদের অনুরোধ করিল কিন্তু তাঁহারা তাহা শুনিলেন না, বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী লইয়া তাঁহারা ঘর-সংসার করিতে সম্মত হইলেন না। এ দিকে নানা দেশ বিদেশে খোঁজ করিয়া খুব বড় এক সওদাগরের বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও রূপবান্ পুত্রের সহিত টেপাইর বিবাহ দিলেন। ভাইরা ভগ্নীকে বহু ধন রত্ন দাস দাসী যৌতুক দিলেন। টেপাই শ্বশুর বাড়ী যাইয়া স্বভাবগুণে সকলের মনহরণ করিল। ছয় ভাইও সুশীলা পত্নীর পাণি-গ্রহণ করিয়া সুখী হইলেন। চারিদিকে ছোট বৌর সুনাম রটিল।

৺রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাদুর

আদিশূর রাজার যজ্ঞে কাণ্যকুব্জ হইতে যে ৫ জন কায়স্থ বঙ্গদেশে আগমন করেন—কালিদাস মিত্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এই কালিদাস মিত্র হইতে ২১ পুরুষ রাম কিঙ্কর মিত্রের ঔরসে রামলক্ষ্মীর গর্ভে বিক্রমপুর চতুর্ম্মণ্ডল গ্রামে রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাদুর ১৭৬১ শকের ৩১ শে বৈশাখ রবিবার জন্ম গ্রহণ করেন। চতুর্ম্মণ্ডল গ্রাম পদ্মা নদীতে শিকস্ত হইলে পর ইঁহারা রাজাবাড়ী গ্রামে আসিয়া অস্থায়ী বাড়ী প্রস্তুত করিয়া কিছু কাল বাস করেন।

রায় বাহাদুর বাল্যকালে তৎকালীন সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার পর যৌবনের প্রারম্ভে বাড়ী হইতে মাত্র ।০ আনা পয়সা সম্বল নিয়া জীবনোপায়ের সংস্থান জন্য শ্রীহট্ট জেলায় উপস্থিত হন। তথা হইতে কাছাড় জেলায় যাইয়া বাঙ্গালী-দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তিনিই অসভ্য কুকিদের সহিত রবর কসের ও হস্তিদন্তের ব্যবসা আরম্ভ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকেন। ব্যবসার সৌকর্য্যার্থে তিনি কুকি ও চাকমা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর কাছাড় জেলায় ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা না হওয়াতে তিনি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটী বরকল ও ডেমাগিরিতে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে থাকেন।

১৮৮৯—৯০ ইং লুসাই এক্সপিডিসনে রায় বাহাদুর কমিসরিয়েট বিভাগের রসদ সাপ্লাই ও রসদ ধোলাইর কনট্রাক্ট নিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। ভীষণ সংক্রামক কলেরা ব্যারামের মধ্যে রায় বাহাদুর এমন সুবন্দোবস্তে রসদ ধোলাইর কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন যে সদাশয় গুণগ্রাহী ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন।

রায় বাহাদুর অতি উদার ও মহৎ অন্তঃকরণের লোক ছিলেন। কাছাড় ও চট্টগ্রামের বাসায় জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বহুসংখ্যক অতিথি অভ্যাগতদিগকে সাদরে স্থান দিতেন। তিনি অনেক হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, চাকমা ও মগ ছেলেদের বিদ্যা শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি মুসলমানের মসজিদ—মগদের ধর্ম্মের মন্দির ও হিন্দুর দেবালয় নির্ম্মাণ এবং সংস্কার জন্য সময় সময় অনেক অর্থ দান করিয়াছেন। চট্টগ্রামে হিন্দুদের শবদেহ সংস্কার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে অভয়াশ্রম নামে এক শ্মশান খোলা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পুকুর ও পাকা ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, বহুসংখ্যক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন করিয়া দিয়াছেন, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য এবং নানারূপে বিপন্ন লোকদিগকে প্রভূত অর্থদান করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় বিপন্ন ভদ্র-পরিবারে গোপনে সাহায্য এবং দরিদ্রদিগকে অকাতরে অর্থ ও চাউল দান করিয়াছেন। তিনি জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বার্ষিক দশ বার হাজার টাকা দরিদ্র ও বিপন্ন নিরু-পায়দিগকে নানারূপে দান করিতেন। ইদানীং বিক্রমপুরে তাঁহার মত দানবীর কেহ ছিল কি না সন্দেহ।

রায় বাহাদুর ১৩১৫ সনের ১৮ই বৈশাখ তারিখে ৬৯ বৎসর বয়সে চট্টগ্রামে

মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার শ্মশান-ক্ষেত্রে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ বহু অর্থব্যয়ে পরম সুন্দর এক শ্মশান-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া মহা সমারোহে মন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মৃত্যুকালে ঢাকা, কোমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও কাছাড় জেলায় বার্ষিক প্রায় ৭০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। নিজ উপার্জ্জিত সম্পত্তি নিজ পুত্র ও ভ্রাতাদের মধ্যে তুল্যরূপে বণ্টন করিয়া দিয়া অতি মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছেন।

রায় বাহাদুরের রাজাবাড়ীর বাড়ী ১৩১৫ সনে পদ্মানদীতে ভাঙ্গিয়া গেলে পর তাঁহার অনুজ বাবু কৈলাশ চন্দ্র মিত্র, গিরিশ চন্দ্র মিত্র ও শরচ্চন্দ্র মিত্র কামার খাড়া গ্রামে গিয়া বহু বিস্তীর্ণ ভূমি নিয়া স্থায়ী বাড়ী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক জাঁক জমকের সহিত বাস করিতেছেন। *

পরাজয়

যদি, হ'ল গো আমার শুধু পরাজয়
সংসারের খেলা খেলে,
তবে পরাজিত নত শিরে মম
তোমার চরণে ঢেলে;
সখা হে আমার বেদনা-মথিত
সকাতর আঁখি জল,
তোমার রাজীব চরণে যেন গো
করে সদা ঝলমল।

শ্রীমতী প্রতিভাময়ী দেবী।

---

* এই সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র চন্দ্র গুহ মহাশয়ের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। বিঃ সঃ

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য

বর্ত্তমান সময়ে রমণীগণ কিরূপভাবে জীবন পরিচালন এবং কি প্রকার শিক্ষা লাভ করিলে তাঁহাদের জীবনে আর্য্যজাতির প্রাচীন আদর্শের সহিত আধুনিক সভ্য সমাজের আদর্শের সম্মিলন হইতে পারে এবং তাঁহারা প্রকৃত স্ত্রী নামের সার্থকতা লাভ করিতে পারেন তদ্বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

যে প্রকৃতি দিয়া ভগবান নারী জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই প্রকৃতি আলোচনা পূর্ব্বক দেখা কর্ত্তব্য যে কি উদ্দেশ্য সাধনার্থ নারীজাতির সৃষ্টি হইল এবং কিরূপ শিক্ষাতেই বা সে উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। বিধাতা কর্ত্তৃক পুরুষজাতি হইতে বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন প্রকৃতিতে নারীজাতি সৃজিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের কর্ত্তব্যও তদনুযায়ী বিভিন্ন নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। যদি স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির কর্ত্তব্য একই প্রকারের হইত, তাহা হইলে সংসারে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত এবং জগতে শান্তি সদাচার এমন কি সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা অসম্ভব হইত। জ্ঞানে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই সমান অধিকার। ভারতবর্ষের স্ত্রীজাতি যেরূপ অশিক্ষিতা এবং অর্দ্ধশিক্ষিতা থাকিয়া নিজেদের শক্তি হারাইতেছেন, অপর দিকে পাশ্চাত্য মহিলা-সমাজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ শিক্ষা পাইয়া নিজেদের কর্ত্তব্য বিস্মরণ পূর্ব্বক অপরাধী হইতেছেন। উভয় বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, দুইই মানবসমাজের অবনতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। সুতরাং এরূপ শিক্ষাকে প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। নারীজাতি তাঁহাদের উচ্চ প্রকৃতির ভিতর দিয়া যথোপযুক্ত জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা জগতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবেন। যে শিক্ষা দ্বারা নারী জগতে তাঁহাদের উচ্চ প্রকৃতি রক্ষা করিয়া, জীবনের সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য পালনের উপযোগী শিক্ষালাভ করিতে পারেন এবং প্রেম, পুণ্য, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি দেবগুণে বিভূষিতা হইয়া পৃথিবীতে দেবীরূপে পরিণত হইতে পারেন, আমরা সেই শিক্ষাকেই প্রকৃত নারীশিক্ষা বলিয়া অভিহিত করিব।

পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতির উন্নতি একমাত্র নারী জাতির উপরই নির্ভর করে। সুমাতা ভিন্ন সুসন্তান কখন সম্ভব নহে। পৃথিবীতে অনেক প্রকার পরীক্ষা আছে, কেহ বি, এ, এম, এ পাশ করেন, কেহ বা সরস্বতী প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিতা হয়েন কিন্তু মাতৃত্ব সাধনরূপ মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অল্প মহিলাকেই দেখা যায়। শুনিয়াছি ইংলণ্ডে একটি অল্পবয়স্কা বিবাহিতা রমণী তাঁহার প্রথম সন্তান জন্মিবার পর, সেই শিশুসন্তানটীকে লইয়া একটী ধর্ম্মপরায়ণ পাদ্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, যাহাতে আমার এই শিশুসন্তানটীর সুশিক্ষা হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।" পাদ্রী একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "তুমি এত বিলম্বে আসিলে কেন?" মেয়েটী উত্তর করিলেন "মহাশয়, আমার সন্তান এখনও তো শিশু, বিলম্ব হইল কেন বলিতেছেন। পাদ্রী বলিলেন "না, শিশুর শিক্ষা মাতার শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং তোমার বিবাহের দশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ তোমার কুমারী কাল হইতেই তোমার সন্তানের শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল।"

পাদ্রী মহোদয়ের বাক্যগুলি গভীর জ্ঞানগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ। মাতৃত্ব পরীক্ষার তিনটী কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ সুকুমারী অর্থাৎ অতি পবিত্র ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক কুমারীগণ প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়া সুগৃহিণী ও সুমাতা হইবেন এবং পরিশেষে সমুদয় ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া প্রেম পুণ্য বিশ্বাস ভক্তিতে দেবীত্বে উন্নীতা হইবেন। যে শিক্ষা নারীজাতির এই দেবপ্রকৃতি লাভের সহায় হয়, তাহাকেই আমরা প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষা বলিব।

কেহ কেহ বলিতে পারেন সমুদয় নারীই যে বিবাহিতা হইবেন, এরূপ সম্ভাবনা নাই; তবে তাঁহাদের জীবনে মাতৃত্ব পরীক্ষার অবকাশ কোথায়? তাহার উত্তর এই হইতে পারে যে তাঁহাদের জীবনে আরও উচ্চতর মাতৃত্ব ভাবের বিকাশ হইবে, তাঁহারা জগন্মাতা হইবেন। তাঁহারা পবিত্রভাবে আপনাদের আমিত্ব ঈশ্বরের চরণে বলিদান করিয়া, পুত্রকন্যানির্ব্বিশেষে জগতের নর-নারীর সেবা করিয়া বিশ্বজননীর প্রকৃত কন্যারূপে পরিণত হইবেন।

আমাদের উপরোক্ত আদর্শানুযায়ী নারীজাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি, আশা করি ইহা পাঠকপাঠিকাগণের অপ্রীতিকর হইবে না।

নারী জাতি সর্ব্ব প্রথমে স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবতী হইবেন। স্বাস্থ্য থাকিলে ধর্ম্ম, শিক্ষা, গৃহকর্ম্ম, পরসেবা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই শৃঙ্খলানুসারে নিয়মিত হইয়া আসিবে। জীবনকে নিয়মানুসারে পরিচালন করা স্বাস্থ্যের একটী প্রধান লক্ষণ। যথাসময়ে উত্থান, স্নানাহার, গৃহকর্ম্ম, শিক্ষা প্রভৃতি সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। শৈশব হইতে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি নারীদিগের যত্ন করা অত্যন্ত আবশ্যকীয় এবং বাটীস্থ শিশু সন্তানদিগকে তদনুযায়ী পরিচালনা করা ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রণালী তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ একবার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে তাহা আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না এবং পাইলেও তাহা কষ্টসাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ। স্ত্রীজনোচিত ব্যায়ামের প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। রমণী গৃহকর্ত্রী হইয়া পরিবারের সকলের প্রতি দৃষ্টি করিতে যাইয়া, অনিয়মিত সময়ে আহারাদি করিয়া আপনাদের স্বাস্থ্য হারান। ইহা স্ত্রীজাতির পক্ষে বড়ই দুঃখের বিষয়।

আধুনিক সময়ে শিক্ষা বলিলে অনেকে একমাত্র পুস্তকগত শিক্ষাই শিক্ষা বলিয়া মনে করেন। শিক্ষা বলিলে কেবল কাল্পনিক পুস্তকের শিক্ষা বুঝায় না, গৃহের কতকগুলি কর্ম্মে অভ্যস্ত হওয়াকেও শিক্ষা বলে। এতদ্ব্যতীত চিত্র বিদ্যা, সঙ্গীত ও শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতিও শিক্ষার মধ্যে গণ্য। সকল শিক্ষার মধ্যে উত্তম শিক্ষা যাহা মানবকে ধর্ম্মের দিকে, জ্ঞানের পথে, পরসেবায়, প্রেমে ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে উদ্বোধিত করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জন। নারী জাতির শিক্ষা এরূপ হওয়া প্রয়োজন যে সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞানার্জ্জন হয়, গৃহকর্ম্ম ও স্বাস্থ্য বজায় থাকে এবং ধর্ম্মের দিকে প্রগাঢ় আস্থা হয়।

ধর্ম্ম ভিন্ন মানব সমাজ থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মানবের ধর্ম্ম থাকা কর্ত্তব্য। যাহা মানবকে ঈশ্বরের দিকে যাইতে সহায়তা করে এবং লইয়া যায় তাহাই ধর্ম্ম। সাধুসঙ্গ, সৎগ্রন্থপাঠ, পরসেবা, সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইত্যাদি ধর্ম্মের অঙ্গ। ভগবানের আরাধনা ও প্রতিদিন ভক্তিভরে তাঁহাকে স্মরণ করা নারীর ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য হওয়া বিধেয়। নারী জাতি চিরদিন ধর্ম্মকে ভক্তির সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের এ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

গৃহকর্ম্ম নারীজাতির একটী প্রধান কর্ত্তব্য। তাহার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি করা উচিত, কারণ যে কোন প্রকারেই হউক রমণীকে সর্ব্বত্রই গৃহকর্ম্ম

করিতে হয়। সুতরাং গৃহের একটী কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া, অন্যটী না শিখিলে সংসারে প্রতিপদে বিপর্য্যস্ত হইতে হয়। নারীজাতি সর্ব্বাগ্রে গৃহের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিবেন। জীবনপথে শৃঙ্খলতা প্রয়োজন। তাহা না থাকিলে বিশৃঙ্খলতা বশতঃ সমাজে ও পরিবারে শান্তি রক্ষা সুকঠিন হয়। সংসাররূপ রাজ্যের ভিতরে রমণীই রাণী। রাজ্যরক্ষা করিতে হইলে যেরূপ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, শৃঙ্খলতা, স্নেহ, দয়া এবং শাসন শৃঙ্খলার আবশ্যক হয়, যেইরূপ গৃহিণী-দেরও দয়া স্নেহ মমতা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও শাসন ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। শৃঙ্খলতা গৃহের সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যের ভিতরে পবিত্রতা এবং পবিত্রতার ভিতরে লক্ষ্মী বাস করেন। গৃহকর্ম্ম পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার সহিত সম্পন্ন করা নারী-মাত্রেরই কর্ত্তব্য। রন্ধন গৃহকার্য্যের একটী প্রধান অঙ্গ। যে খাদ্য মানব শরীরের প্রধান উপাদান, সেই খাদ্য অশিক্ষিত পাচক কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়া অনেক সময় দেহকে ব্যাধিগ্রস্ত করে। অধিকাংশ স্থলে রমণীকে সকল কর্ম্মের ভিতরে রন্ধনকেও একটী প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। সন্তান প্রতিপালন, পরিবার পরিজনের আহারাদি ও স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিরক্ষা, অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যা প্রভৃতি গৃহকর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল কার্য্য যথাযথ প্রতিপালন করিতে হইবে। চিকিৎসা-বিদ্যাও নারীদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়। কোন্ দ্রব্যের কি গুণ এবং কোন্ সময় তাহা প্রদান করিলে উপকার লাভের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় জানা থাকিলে সামান্য সামান্য রোগে চিকিৎসক ব্যতিরেকেও ঔষধাদি প্রদান করিতে পারেন। ইহাতে এক দিকে যেমন ব্যয় সংক্ষেপ, অন্য দিকে তেমনি শিক্ষা হইবে। সময়ে অনেক পরোপকারও হইয়া থাকে।

মহিলাদিগের পরিচ্ছদ আড়ম্বরবিহীন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। পরিচ্ছদের ভিতরে পবিত্রতা ও শান্তি বিরাজ করে। একটী পরিচ্ছদ যদি অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য ও দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়, সুবিবেচিকা রমণীর পক্ষে তাহা পরিধান করা কর্ত্তব্য। যে পরিচ্ছদ পরিধান করিলে অন্যের লোভ উপস্থিত হয় তাহা কদাচ পরিধান করা উচিত নহে। নারী শান্তিপ্রদায়িনী। তিনি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যেন প্রতি পদবিক্ষেপে কাহারও শান্তি নষ্ট না হয়। এরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য যদ্দারা ভগবদ্ভক্তি জন্মে। শুনিয়াছি ব্যাধও

বৈষ্ণবের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিল। যাহাতে সাত্ত্বিক ভাব উপস্থিত হয় সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বপ্রকারে লজ্জানিবারণ পোষাক পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য; বেশ ভূষা নহে। পরিচ্ছদে সেই উদ্দেশ্য সর্ব্ব প্রকারে প্রতিপালিত হইতেছে কি না তাহা প্রত্যেক মহিলার দেখা কর্ত্তব্য এবং তাহা না হইলে তাহার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করা বিধেয়। অপরিষ্কার পরিচ্ছদ কদাচ পরিধান করা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে দেহ ব্যাধির আকর হয়।

প্রাচীনাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে তৎকালে যে মহিলা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া আসিতেন, নিমন্ত্রণাদি ব্যাপারে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা আদর ও সম্মান লাভ করিতেন। আর যিনি সাদাসিদে, পরিষ্কার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার পরিশূন্য হইয়া আসিতেন, সকলে তাঁহাকে ঘৃণা ও উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করিত। দুঃখের বিষয় বিংশ শতাব্দীর এই সভ্যতার যুগে নব্য শিক্ষিতা রমণীদের ভিতরেও এই প্রাচীন দোষটী দেখা দিয়াছে। এই দোষটী আমাদের সর্ব্বাগ্রে দূর করা কর্ত্তব্য। যে অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ মানবকে অহঙ্কার ও পতনের অভিমুখীন করে তাহা পরিধান করা অপেক্ষা বৃক্ষের বল্কল পরিধান করা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর।

নারীদিগের অবরোধ কি চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে মনের অবরোধই প্রকৃত অবরোধ। দয়া, স্নেহ, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, নম্রতা, বিনয়, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি নারীদিগের মনের অবরোধ। এই অবরোধ অবগুণ্ঠন ব্যতিরেকেও রক্ষা করিতে হইবে। স্ত্রীজাতি যদি সর্ব্ববিধ গুণদ্বারা আপনাদের হৃদয় এবং মনকে বশীভূত করিয়া সুপথে পরিচালন করিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি প্রকৃত অবরোধ রক্ষা করিলেন। নরজাতিও তাঁহাদের এই অবরোধের সম্মান করিবে। এই আত্মবিজয় রমণীগণ তাঁহাদের সুকোমল প্রকৃতির ভিতর দিয়া করিলেই শোভা পায়। এতদ্ভিন্ন যদি তাঁহারা পুরুষের অনুকরণপূর্ব্বক জনসমাজে তাঁহাদের স্বীয় কর্ত্তব্য পথে না চলিয়া সর্ব্ব বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করেন; তাহা হইলে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য ও পাপ করা হইল। অবরোধ বাহ্যিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। তাহাতে মানবের মনে সঙ্কীর্ণতা উপস্থিত হয়। মহিলাদিগের বাহ্যিক অবরোধ অনেক সময় অপকারী হয়। দর্পণে যেরূপ মানবের প্রতিকৃতি দেখা যায়, তদ্রূপ মানবচরিত্রের সদ্‌গুণ ও

অসদ্‌গুণাবলী বদনেই প্রতিবিম্বিত হয়। সুতরাং নারী যদি প্রকৃত সদ্‌গুণাবলীর অধিকারিণী হন, তাহা হইলে অবরোধ ব্যতীতও তাঁহার সে কোমলতা নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী অবশ্য চরিত্রে প্রকাশিত হইবে। এই প্রকারে নারী মাত্রেরই দেবীপ্রতিমা হইতে হইবে। হিন্দুগণ যেমন দেবী প্রতিমার নিকটে আসিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মস্তক অবনত করেন তদ্রূপ দেবীপ্রতিমারূপিণী নারীজাতির নিকটে সমস্ত পৃথিবীর লোক শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিবে। মনের অবরোধ রক্ষা করিলে অন্য কোন বাহ্যিক অবরোধের আবশ্যক করে না।

অনেক সময় আমরা অবরোধ এবং পরাধীনতা একই অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের সে ধারণা ভ্রমাত্মক। এই ভ্রম বশতঃই আমরা প্রকৃত স্ত্রীস্বাধীনতা কি তাহা বুঝিতে সক্ষম হই না। অবরোধ বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝা যায় অর্থাৎ পর্দ্দানসীনতা তাহা আমাদের ভারতীয় আর্য্যজাতির ভিতরে কখন ছিল বলিয়া ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ভারতে মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভকাল হইতে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে মেয়েদের ভিতর পর্দ্দানসীনতা নাই; সেজন্য তাহাদিগকে স্বাধীনা বলিতে পারি না। অনেক লোকের ধারণা যে স্ত্রীলোক কোন দিনই স্বাধীন হইতে পারে না; শৈশবে পিতার, পরিণয়ে স্বামীর এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের অধীন হইবে। একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন যে মানবকে লৌহনির্ম্মিত পিঞ্জরে রাখিলেও স্বাধীন, কারাগারে রাখিলেও স্বাধীন; কারণ তাহার মন স্বাধীন। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, "সহস্র সহস্র দাস দাসী পরিবৃতা হইলেও যিনি আপনাকে আপনি রক্ষা করেন না সে নারী অরক্ষিতা, কিন্তু যিনি তাহা রক্ষা করেন তিনিই সুরক্ষিতা।" অতএব যে মহিমময়ী রমণী ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বীরত্ব দ্বারা আপনাকে কুপথ এবং বিপদ হইতে রক্ষা করেন তিনিই প্রকৃত পক্ষে সুরক্ষিতা অর্থাৎ স্বাধীনা। অবরোধ ও পরাধীনতা যে এক নহে তাহা বোধ হয় বিশেষভাবে বলিতে হইবে না। ভারতে যেরূপ বহুকাল হইতে পর্দ্দানসীন প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহাতে একবারে ইহার উচ্ছেদ সাধন সম্ভবপর নহে। ইহাতে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ অধিকার রমণীদিগের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

শুধু স্নেহ, মমতা ও দয়া থাকিলে নারীচরিত্রের পূর্ণ বিকাশ হয় না।

বীরত্বও থাকা চাই। বীরত্ব অর্থাৎ তেজস্বীতা না থাকিলে নারীর সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা হয় না। পুণ্যের তেজে পাপকে ধ্বংস করিতে হইবে। আমরা শম্ভু নিশম্ভুনাশিনীর উপাখ্যান হইতে এই তেজস্বীতা গ্রহণ করিতে পারি। যে পবিত্রতার তেজের নিকট সহস্র সহস্র পাপীও ভস্মীভূত হইয়া যায়। রমণী যে কেবল সুকোমলাঙ্গী হইবেন, তাঁহার যে কোন বীরত্বের প্রয়োজন নাই, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। নারীজাতির যদি পাপের প্রতি তীব্র ঘৃণা থাকে তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানগণও তদনুরূপ হইবে। প্রথমতঃ পবিত্রতার যে তেজ তাহা হইতে অন্য কোন শারীরিক বীরত্ব স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ শরীরিক শক্তি লাভ করিতে হইবে। নারীই প্রকৃত পক্ষে দেশের উন্নতিকারিণী।

সেবা একটী উৎকৃষ্ট বৃত্তি। সেবাতে আপন পর ভেদজ্ঞান থাকে না। সকল মানবজাতিকেই ঈশ্বরের সন্তান জানিয়া সেবা করা কর্ত্তব্য। অনেক মহিলা নিজ পরিবার পরিজনের সেবাকেই যথেষ্ট মনে করেন কিন্তু প্রতিবেশীদের প্রতি দৃষ্টি করেন না। অনেক দিন পূর্ব্বে এক ভদ্র লোক লিখিয়াছিলেন যে প্রথমাবস্থায় আমি প্রতিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই। আমি যে পাড়ায় বাস করিতাম, সেখানে কলেরার প্রাদুর্ভাব ছিল; তখন আমি তাহাদের চিকিৎসা কিম্বা সেবা শুশ্রূষা না করিয়া নিজের পরিবারের ভিতর সাধ্যানুরূপ সতর্ক হইলাম। কিন্তু আমার সে সতর্কতা বিফল হইল। প্রথমেই আমার স্ত্রী কলেরা রোগে আক্রান্তা হইলেন এবং মৃত্যুমুখে পতিতা হইলেন। তখনও আমার চৈতন্যোদয় হইল না। আমার একটী পুত্র ছিল, যথাসাধ্য তাহাকে সুপথে রাখিতে যত্ন ও চেষ্টা করিতাম; কিন্তু সেই পাড়াতে একদল কুপথগামী বালক ছিল, আমি তাহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতাম না। পরিশেষে আমার পুত্র আমার অগোচরে সেই বালকদের সহিত মিশিয়া কুপথগামী হইল। এক দিন আমি বসিয়া বিমর্ষভাবে চিন্তা করিতেছি যে কেন আমার এরূপ হইল? তখন স্থির করিলাম যে সমস্তই আমার দোষ; আমি যদি পাড়ার লোকদের কলেরা হইতে উদ্ধার লাভের উপায় উদ্ভাবন করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, স্ত্রীও অকালে কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইত না। আর যদি প্রতিবেশী ছেলেদের চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করিতাম, তাহা হইলে

আমার সন্তানও এরূপ হইত না। সেই হইতে আমি জীবন পরসেবায় উৎসর্গ করিয়াছি।

সুতরাং ইহাতেই বুঝা যায় যে আমাদের দেশ ও আমাদের সংসর্গকে যদি আমরা সেবাদ্বারা সংশোধিত না করি, তাহা হইলে আমরা যে প্রকার সাবধানতার সহিত অবস্থান করি না কেন সমাজ দেহের শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি আমাদিগের জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করিবে। সেবাকে যে কোন ভাব হইতে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার অন্তঃস্থলে অমূল্য রত্নরাজি লুক্কায়িত রহিয়াছে। সেবাতে কোনরূপ স্বার্থ না থাকাই ভাল, কারণ তাহাতে অনেক সময় কর্ত্তব্যের ক্রটী হয়। অনেকে বলেন যে অবরোধ মহিলাদিগকে পরসেবা হইতে বঞ্চিত করে। একথা কতকাংশে সত্য। আমাদের প্রাচীনা মহিলাগণ অনেক প্রকারে পরসেবা করিতেন। তাঁহারা বৃহৎ পরিবারে রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াইতেন। ব্যাধি হইলে সেবা শুশ্রূষা করিতেন এবং অতিথি আসিলে রন্ধন করিয়া ভোজন করান ও তাহাদের উচ্ছিষ্ট ফেলা ইত্যাদি কার্য্য এবং গুরু পুরোহিতে ভক্তি, মন্দির লেপন প্রভৃতি তাহাদের নিত্য কর্ম্ম ছিল। দুঃখের বিষয় অধুনা নারী-হৃদয় হইতে সে সেবার ভাব অনেক কমিয়াছে। আমাদের প্রাচীনাদের এই গুণগুলি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত মহিলাগণ পর্দ্দাবিশিষ্ট অবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশের জনসাধারণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবেন। কত পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকা আছে, শিক্ষাভাবে তাহাদের জীবন অকর্ম্মণীয় হইয়া যাইতেছে। কত রোগীর জীবন সেবাভাবে অকালে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইতেছে। কত শোকী সান্ত্বনা পাইতেছে না। ভগ্নীগণ জাগ্রত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও।

যে দিন বলিবে :—

"আপন পর রবে না মোর
সমান চেনা অচেনা,
আমি নিখিল মাঝে, তোমার কাজে
বিলায়ে দিব আপনা।"

সে দিন নারীজন্ম সার্থক হইবে।

শ্রীমতী ভক্তিসুধা দেবী।

সাগর-সঙ্গীত

(সমালোচনা)

আকাশ, সাগর, ভূধর এ তিনটি বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। রবি-চন্দ্র-তারা বিভূষিত আকাশের সুনীল শোভা, তরু-লতা-গুল্মসমাচ্ছন্ন, নির্ঝর-ধারা-বিধৌত ভূধরের শ্যাম সৌন্দর্য্য, আর সমুদ্রের অসীম অনন্ত নীল বারির নীল লহরমালার উদার মাধুর্য্য, অনির্ব্বচনীয়। এ তিনের রূপমাধুর্য্য শুধু দেখিবার হৃদয়ে অনুভব করিবার কিন্তু ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে। কত কবি, কত চিত্রকর, কত দার্শনিক, কত পণ্ডিত এ তিনের রূপ-মাধুরী কাব্যে, আলেখ্যে, প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই।

শচীমায়ের দুলাল ভক্তি-অবতার শ্রীচৈতন্য দেব সাগর দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাহার নীল নীরে আপনার হারানিধি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য ঝাঁপ দিয়াছিলেন। সে অমূল্য কথা সে ভক্তি-পীযূষ বাণী বৈষ্ণব কবির কবিত্ব গাথায় বাঙ্গালা সাহিত্যভাণ্ডারে চির সঞ্চিত। সাগর দেখিয়া বাইরণ গাহিয়াছিলেনঃ—Roll on thou deep blue ocean roll. রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার ইত্যাদি। সাগর দেখিলে মানবের ক্ষুদ্র হৃদয় বিধাতার বিরাট সৃষ্টির নিকট সংকীর্ণতা ভুলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও বিশালতা লাভ করে। সে অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিভোর চিত্ত আপনা হইতেই গাহিয়া উঠে,

> The sea ! the sea ! the open sea !
> The blue, the fresh, the ever free !

কবি চিত্তরঞ্জন সাগর দেখিয়া, প্রথমেই গাহিয়াছেন—

> 'হে আমার আশাতীত হে কৌতুকময়ি !
> দাঁড়াও ক্ষণেক ! তোমা ছন্দে গেঁথে লই !
> আজি শান্ত সিন্ধু ওই ম্লান চন্দ্রকরে
> করিতেছ টলমল কি যে স্বপ্ন ভরে !

সত্যই এসেছ যদি হে রহস্যময়ি !
দাঁড়াও ক্ষণেক তোমা ছন্দে গেঁথে লই।

কবি সৌন্দর্য্যের উপাসক। বিশ্বজগতের অনন্ত সৌন্দর্য্যরাজির প্রকৃত মাধুরী কবির কাব্যে ফুটিয়া উঠে। যে কথাটি, যে ভাবটি, যে মাধুর্য্যটুকু সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারে না কবি তাহাই মধুমত্ত মধুকরের মত নিখিলের অন্তঃস্থল হইতে সযত্নে সঞ্চয় করিয়া পিপাসিত জনসঙ্ঘকে দান করেন। এমার্সন বলিয়াছেন—The poet is the sayer, the namer, and represents beauty. He is a sovereign, and stands on the centre. For the world is not painted, or adorned, but is from beginning beautiful ; and God has not made some beautiful things, but Beauty is the creator of the universe. Therefore the poet is not any permissive potentate, but is emperor in his own right." কবির আসন কোথায়, কবি জগতের কত বড় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন, উদ্ধৃত অংশ হইতেই পাঠক তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

তুমি আমি সাগর দেখি, পাহাড় দেখি, নিত্য আকাশ দেখি। এ তিনের মধ্যে কি রূপ আছে তাহা বুঝি না—সৌন্দর্য্যময় জগতের প্রাণের গোপন কথাটি সাগরের তরঙ্গে উচ্ছ্বাসে কি করিয়া ব্যক্ত হইতেছে জানি না—শুধু বিধাতার সৃষ্টির মহত্ত্ব দেখিয়া আত্মহারা হই ! সাগরের ধ্বনি বুঝি না। সাগরের ভাষা প্রাণে আনন্দ বিষাদ করুণার বাণী জাগায় না। যেখানে আমরা শুধু জড় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, নীরব, স্তব্ধ, সেখানে কবির হৃদয় নীরব নহে, জড় নহে, কবি অপূর্ব্ব আনন্দে বিভোর ! সাগরের কথা তিনি কান পাতিয়া শুনিয়াছেন। তাই মেঘশূন্য নীল-নির্ম্মল গগনতলে ফেনিল তরঙ্গময় জলধির সীমান্ত রেখায় প্রভাত রবির সমুত্থান দেখিয়া শিশুর ন্যায় সরল হাস্যে চীৎকার করিয়া গাহিতেছেন ;—

ওইত বেজেছে তব প্রভাতের বাঁশী
আনন্দে উৎসবে ভরা ! সূর্য্যকররাশি
তোমার সর্ব্বাঙ্গে আজি আনন্দে লুটায়
উজল উছল জলে কুসুম ফুটায়।

* * * *

তরঙ্গে তরঙ্গে আজ যেই গীত বাজে,
সোণার স্বপন ভরা প্রভাতের মাঝে;
সেই গীতে ভরি গেছে হৃদয় আমার
গগনে পবনে বহে সেই গীত ধার।

ভাব-বিভোর হৃদয় কথার বাঁধনের অপেক্ষা করে না। যখন অন্তর ভাবাবেগে পূর্ণ হইয়া উঠে তখন সে ভাষার জন্য নিজ হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করিতে ইতস্ততঃ করে না। সান্ত সাগরের মধ্যে অনন্তের অনন্ত মূর্ত্তি—মূর্ত্ত আকারে উচ্ছলিত, কবি সান্ত সাগরের নীল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে—তাহার বিরাট মূর্ত্তি দর্শনে অনন্ত দেবতার অনন্ত আসনখানি সান্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া বলিতেছেন,

জানিনা কথার মোহ, ভাষার বিন্যাস,
জানিনা গানের সুর, তান লয় মান,
আমার অন্তরতলে মুক্ত চিদাকাশ,
অনন্তের ছায়া ভরা আমার পরাণ।

বসন্তের সমীরণসংস্পর্শে যেমন নীরব কানন-পথ প্রতিধ্বনিত করিয়া কোকিল কুহরিয়া উঠে, জ্যোৎস্না দেখিয়া কুমুদিনী যেমন স্বচ্ছ সরসীজলে বিকশিত হয়, তেমনি সাগরের অনন্ত শোভা দেখিতে দেখিতে ভক্ত কবি-হৃদয় জাগিয়া উঠিয়াছে—বাঁধন টুটিয়াছে, সাগর-তরঙ্গের আহ্বান বাণী 'উঠ কবি! উঠ! জাগ কবি জাগ!' ধ্বনি কবিহৃদয়ের ঘুমন্ত মানসীসুন্দরীর নয়নপল্লবের কোমল আবরণখানি খুলিয়া দিয়াছে। মুগ্ধ নিদ্রিত কবি তখন আপনাকে বুঝিতে পারিয়াছেন, আপনার প্রাণের দেবতার সন্ধান পাইয়াছেন তাই তাঁহার বাঁশী মধুর স্বরে গাহিতেছে,—

আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে!
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে।
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন,
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন।

পথহারা পান্থ এতক্ষণ পথ না পাইয়া হাহাকার করিতেছিলেন—শুধু কাঁদিতে-ছিলেন কোথা তুমি ঈপ্সিত! কোথা তুমি দয়িত! এস গো! এস! বিরহিণী

রাধার হৃদয়নিকুঞ্জবনে নিকুঞ্জবিহারী যেমনি শুভ পদার্পণ করিলেন অমনি তাহার—

সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল,
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করিছে আকুল।
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী,

সৃষ্টিরহস্য—বিধাতার নিজ ভাণ্ডারে লুক্কায়িত। যাহা ব্যক্ত হইবার নহে, যাহা পাইবার নহে, যাহা জানিবার বুঝিবার উপায় নাই, মুগ্ধ মানব তাহারি সন্ধানে ব্যাকুল! মৃত্যুর তীব্র অনল জগৎ দহন করিতেছে—চারিদিকে ভয়ঙ্কর সংহার মূর্ত্তি, কোমলপ্রাণ কবিহৃদয় এমন সুন্দর বিশ্ব নিখিলে মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি সহ্য করিতে পারিতেছে না, সৌন্দর্য্যপ্রিয় কবি বিশ্বসৌন্দর্য্যে বিশ্বসৃষ্টিতে ধ্বংস চাহেন না, তিনি চাহেন শান্তি—তিনি চাহেন অনন্ত জীবন। সমুদ্রের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে মরণের কথা মনে পড়িয়াছে, তিনি মৃত্যুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

হে রুদ্র মরণদেব! জটী জটাধর!
প্রলয় ত্রিশূল তব সংহর! সংহর!
জীবনেরে ছেড়ে দাও বাঁচিতে মরিতে,
আপন হৃদয়-কুঞ্জে আপনারি গীতে।

সাধনা—সিদ্ধির সোপান। হিন্দু কর্ম্মসূত্রবিশ্বাসী এবং পরজন্মে তাহার অগাধ বিশ্বাস। হিন্দুর ধারণা একদিন না একদিন বিশ্বদেবতার সহিত তাহার মিলন ঘটিবেই ঘটিবে। ঈশ্বরের করুণা—তাঁহার উপলব্ধি প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই ঘটে, তাই—

"কবে দেখেছিনু তোমা,—হাতে ধরেছিনু,
চেয়েছিনু চোখে? কোন্ কালে কোন্ দেশে
সে দিন কি তব সাথে কথা কয়েছিনু
তুমি গেয়েছিলে গান? চেয়েছিলে হেসে?

একথা কয়টি কবির কাব্যে দেখিতে পাইতেছি।

তারপর সাগরের বিচিত্ররূপ কখনো,—

উজল স্বপ্নের মত পরিপূর্ণ চাঁদে
কি অনন্ত শক্তি ভরা জোছনার রাশি
পরাণে ফুকারি উঠে আনন্দে, অবাধে।

আবার—

নির্দ্দয় রুদ্র! মরণের রঙ্গে
চরাচর ডুবে যায়, প্রলয় তরঙ্গে!
ঘন ঘোর অট্টহাসে মরণ ডম্বরে,
লাফায়ে ঝাঁপায়ে পড়ে পাতালে অম্বরে;
বিদ্যুৎবিহীন নিশা অশনি বরজে
ছিন্ন ভিন্ন বক্ষে তব মরণ গরজে!
উন্মত্ত তরঙ্গে তব অযুত ফণিনী
বিস্তারি অসংখ্য ফণা অনন্তরঙ্গিণী।

একদিকে জড়প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে কবি মুগ্ধ আবার তাহারি নিকট বিশ্বস্রষ্টার প্রতি তাঁহার আত্মনিবেদনশিক্ষা ভক্তিব্যাকুলতা, অপূর্ব্ব সুন্দর। যথা :—

পুণ্যধূমে সুপবিত্র হৃদয় মন্দির।
উদাসী সঙ্গীত তব বাজিছে গম্ভীর।
হে পূজারি! আজি তুমি কোন পূজা কর?
পরাণ প্রদীপ মোর উর্দ্ধে তুলি ধর,
কার পানে, কোন মন্ত্র করি উচ্চারণ?
কোন পূজা লাগি বল এত আয়োজন?
দীক্ষা দাও ওগো! গুরু! মন্ত্র দাও মোরে,
পূজার সঙ্গীতে তব, প্রাণ দাও ভরে!

সাগরের নিকট দীক্ষা পাইয়া ভক্তিবিনম্রচিত্তে অনন্তদেবকে হৃদয়ে অনুভব করিবার জন্য স্তব্ধ শান্ত ভাবে ধ্যানাসনে বসিলেন। উচ্ছল সমুদ্রতরঙ্গ অন্তহীন নীলিমায় মিশিয়া গিয়াছে, চক্রবাল রেখায় লোহিত তপন উদীয়মান—নিশীথ ধ্যানের পর কবি যখন সাগরের পানে নয়ন মেলিয়া চাহিলেন তখন দেখিলেন :—

সকল প্রকৃতি আজ পদ্ম হ'য়ে ভাসে জলে,
মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণ তলে,

আর হৃদয়ে উপলব্ধি হইল যে তাঁহার বক্ষের পরে যোগীবর যোগাসনে বসিয়াছেন, আর প্রিয়তমের আভাস পাইয়াছেন কিন্তু সন্ধান পান নাই—প্রাণ কিন্তু

মিলনের জন্য ব্যাকুল! সমস্ত জগৎ আনন্দময়—সমস্ত বিশ্বচরণে প্রণত ভক্তিতে নত দেখিতেছেন—

সাধনে ভজনে আজি কুসুম উঠেছে ফুটি
সকল গগন ভ'রে। তোমার নয়ন দুটি
ভক্তিরসে ঢুলু ঢুলু! বিগলিত করুণায়
তোমার তরঙ্গদল নেচে নেচে বহে যায়।
গগন ভরিয়া গেছে সঘন গম্ভীর বোলে,
চরাচর ছেয়ে আছে মধুর কীর্ত্তন রোলে।
হরিবোল! হরিবোল! করতাল বাজে যেন,
হৃদয়ে বাজেনি কভু গভীর মৃদঙ্গ হেন।
মুক্ত বায়ু প্রভাতের আনন্দ কীর্ত্তন ভারে,
নাচিছে পাগল হ'য়ে অন্তরের চারি ধারে।
দেবতার তরে আজি আমার আকুল হিয়া
ঢেকেছ ঢেকেছ মরি। কি শুধু বিরহ দিয়া।

ভক্ত কবি ভাবে বিভোর! আত্মহারাচিত্তে ভক্ত বৈষ্ণব যেমন মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনিতে ব্যাকুল হইয়া হরিধ্বনি করিতে থাকে—বাঁধন মানে না, সরম ভরম ধরম করম কিছুই মনে হয় না, তন্ময় হইয়া যায়, তেমনি ভক্ত কবি বলিতেছেন,—

"প্রাণারাম! প্রাণারাম! তোমা পাই কি না পাই।
আমি ভেসে ভেসে উঠি, আমি ডুবে ডুবে যাই।
হে সাধক, হে ভকত, করহ কীর্ত্তন নব।
সঙ্গে রেখো চিরকাল, সাধন ভজনে তব।

আর কত উদ্ধৃত করিব? আমরা সাগর-সঙ্গীত পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সাগর-সঙ্গীতে আমরা বৈষ্ণব কবির পবিত্র প্রেমের সন্ধান পাইয়াছি—বিশ্বজনীন প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধার আভাস উপলব্ধি করিয়াছি। বহুদিন সাগর-সঙ্গীতের মত সুমধুর সরল প্রাণের কবিতা পাঠ করি নাই। কবি পাশ্চাত্য-শিক্ষিত আইনজ্ঞ সুপণ্ডিত, কন্তুর ন্যায় তাঁহার হৃদয়-পদ্ম-নিঃসৃত কবিতা পাঠে আমরা বিস্মিত ও ধন্য হইয়াছি। আজকাল রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতিতে একদল কবির উদ্ভব হইয়াছে, যাহাদের কবিতা শুধু শব্দসমষ্টি অর্থাৎ বাহিরেই শুধু ঝকমকি। বাঙ্গালার

মৃতপ্রায় কাব্য সাহিত্যে (পাঠক মহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, গোবিন্দদাস, প্রমথনাথের কথা বলিতেছি না) প্রবীণ কবি চিত্তরঞ্জনের সাগর-সঙ্গীতের অভ্যুদয়ে সত্য সত্যই কাব্য সাহিত্যে এক নূতন জীবন উপলব্ধি করিতেছি। একদিন কবির 'মালঞ্চ' পাঠে নিপুণ মালাকরের সুরভিকুসুমরচিত মাল্যের গ্রন্থে চিত্ত বিভোর হইয়াছিল আর আজ সোণার কমলে কবির গ্রথিত সুরচিত মালা বঙ্গকাব্যলক্ষ্মীর কমনীয় কণ্ঠে দোলাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। কবি মুখপত্রে লিখিয়াছেন,—

"গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।"

আমরা বলি—'গণইতে দোষ তুহুঁ তিল ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।'

এখন বহির বাহ্য সম্পদের কথা বলি। ধরণীকান্তের 'ভারতভ্রমণ ও প্রমথনাথের কাব্য গ্রন্থাবলীর পর এ পর্য্যন্ত এমন সুন্দর বহি আর বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। এক হিসাবে ইহা অভিনব—এমন কল্পিত সুন্দর চিত্র আর প্রতি পৃষ্ঠায় সাগরের চিত্র মধ্যে কবিতাগুলির সুন্দর মুদ্রণ বস্তুতঃই লোভনীয়। যেমন কাগজ তেমন ছাপা। K. V. Seyne কোম্পানী এইরূপ অভিনব প্রক্রিয়ায় গ্রন্থ মুদ্রণকরিয়া তাঁহাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। গ্রন্থ মধ্যে মোট চল্লিশটি কবিতা। প্রিয়জনকে উপহার দিবার এরূপ সুন্দর পুস্তক বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে অতি বিরল। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য সম্বন্ধে গ্রন্থমধ্যে কোন কথা লিখিত নাই। বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক কাব্যপ্রিয় পাঠককে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বিক্রমপুরের প্রাচীন ভাস্কর্য্য কীর্ত্তি (২)

প্রত্যেক শ্রীমূর্ত্তির নিম্নেই কোন না কোন রূপ বাহন দৃষ্ট হয়। কোন্ মূর্ত্তির কিরূপ বাহন হইবে তাহাও পুরাণ-গ্রন্থে বর্ণিত আছে। বিষ্ণু মূর্ত্তিসমূহের অধিকাংশেরই বাহন গরুড়। গরুড় মনুষ্যাকৃতি—পার্থক্যের মধ্যে শুধু পক্ষ দু'টী। মহাভারতে গরুড়ের উৎপত্তি বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। সে বর্ণনার পুর্ব্বে আমরা সংক্ষেপে ভারতীয় ভাস্কর্য্য-শিল্প সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষিগণের মন্তব্য আলোচনা করিব। ইহাতে সমুদয় বিষয় বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া মনে করি। ইহা যে আমাদের কোনও সিদ্ধান্ত নহে তাহা বলাই বাহুল্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধিকাংশের মতে ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব ৩০০ শত খ্রীঃ অঃ পর হইতেই ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে এবং ঐ সময়ের পরবর্ত্তী কালের গঠিত মূর্ত্তিসমূহকে শিল্পের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়াই দোষাবহ, ঐ সকল শ্রীমূর্ত্তি 'আর্টের' দিক্ দিয়া গণ্য হইতে পারে না। সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই যে এমতাবলম্বী তাহা নহে। এসম্বন্ধে দুটী মত দেখিতে পাওয়া যায়। একদল গোঁড়া প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকারী পণ্ডিত, অপর দল কলাবিদ্ শিল্পিগণ। প্রথমোক্ত দলের মতে খ্রীঃ পূঃ ২৫০ হইতে খ্রীঃ অঃ ৫০ এই তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় তক্ষণ-শিল্পকে মিশ্রণ-শিল্প নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। কারণ সে সময়ে গ্রীক্, পারস্য এবং ভারত শিল্প এই ত্রিধারার সম্মিলনেই ভারতীয় ভাস্কর্য্য পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। সে সময়কার কোনও বৌদ্ধ দেব-দেবী মূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এযুগের পরবর্ত্তী যুগে অর্থাৎ খ্রীঃ অঃ ৫০—৩৫০ খ্রীঃ অঃ সময়ে কুশনবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে গান্ধার ও অমরাবতীর আদর্শানুযায়ী ভারতের তক্ষণ-শিল্প সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই সময়ের নির্ম্মিত মূর্ত্তিসমূহ তৎকালীন রোমক সাম্রাজ্যের তক্ষণ-শিল্প অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন বলিয়া বিবেচিত হইত না। ইঁহাদের মত এই যে গান্ধার ও অমরাবতীর ভাস্কর্য্য গ্রীক পুরাণোক্ত দেব দেবীর

বাহন-পরিচয়।

এবং গ্রীসদেশবাসী শিল্পিকুলের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় চিত্র-শিল্প ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে হেভেল, লরেন্স প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ৩00 শত খ্রীঃ অঃ পরবর্ত্তী যুগে যে ভারতীয় ভাস্কর্য্য শিল্পের ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে সে ভ্রান্তিও ঘুচিল। পণ্ডিত আনন্দকুমার স্বামীর মত এই যে "It is probable that none of the most beautiful or important Indian sculpture can be certainly assigned to a date earlier than 300 A. D. তবে একথা সম্পূর্ণ ঠিক যে এক সময়ে ভারতীয় শিল্পের মধ্যে একটা বিশেষ মিলনের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিষ্ণুর বাহন গরুড় হইতে কিয়ৎ পরিমাণে তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বৌদ্ধ শিল্পিগণ হিন্দুদেবদেবীর আদর্শ ও বাহন ইত্যাদির অনুকরণ করিয়া যে সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, পৃথিবীর নানাদেশে উক্ত ধর্ম্মমত বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শিল্পও তদ্রূপ নানাস্থানে ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের গরুড় মূর্ত্তির চিত্র হইতেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। জাপানের তেন-গাস (Ten-gus), চীনের থিয়েন কৌ (Thien-kou), তিব্বতের খাইয়াঙ্গ (Khy-ung) প্রভৃতি আমাদেরি গরুড়ের রূপান্তর মাত্র। অজন্তা গুহার ১৭ নং গুহা চিত্রাবলীর মধ্যেও গরুড়ের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সে সমুদয় চিত্র অদ্ভুত হাস্যোদ্দীপক কল্পনার বিচিত্র অভিব্যক্তি। মনুষ্যাকৃতি গরুড় হিন্দু শিল্পীর নবীন আদর্শ। এরূপ গরুড় মূর্ত্তি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর গঠিত শ্রীমূর্ত্তি সমূহে এবং তৎপরবর্ত্তী সময়েই অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে খ্রীঃ অঃ চতুর্থ হইতে অষ্টম পর্য্যন্তই এই শ্রেণীর শ্রীমূর্ত্তি ও গরুড় মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছিল। চীনদেশীয় থিয়েন কৌর সহিত আমাদের দেশীয় গরুড়ের ঐক্যতা সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া অধ্যাপক গ্রাণওয়াডেল সাহেব বলেন "Brahmanic art makes of it a winged man with a beak, and the Chinese form resembles it." *

মহাভারত পাঠে আমরা গরুড়ের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে জানিতে পারি যে পূর্ব্বে সত্যযুগে কদ্রু ও বিনতা নামে অদ্ভুত রূপবতী দুই ভগিনী ছিলেন। তাঁহারা

---

* Grunwedel's Buddhist Art in India P. 51.

দক্ষ প্রজাপতির কন্যা এবং কশ্যপ মুনির পত্নী। ইঁহাদের গর্ভে নাগ ও গরুড়ের জন্ম হয়। কদ্রুর গর্ভে সহস্রসংখ্য অণ্ড ও বিনতা দুইটী অণ্ড প্রসব করেন। পরিচারিকাগণ সেই সমস্ত অণ্ড উষ্ণযুক্ত ভাণ্ড মধ্যে পঞ্চশত বর্ষ পর্য্যন্ত রক্ষা করেন। সময়ে উভয় ভগ্নীর অণ্ড সমূহ হইতে নাগ ও গরুড়ের জন্ম হইল। গরুড় মাতৃসাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং অণ্ড বিদারণপূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করেন।

গরুড়ের জন্ম বিবরণ।

মহাসত্ত্ব, মহাবল, তড়িন্মালাবৎ পিঙ্গলাক্ষ, অতিভীষণ কালানল-তুল্য-প্রদীপ্ত, মহাঘোর, রুদ্রমূর্ত্তি, মহাকায়, প্রজ্বলিতহুতাশন-রাশি-তুল্য-অতিভয়ঙ্কর, কামরূপ, কামবীর্য্য, কামগতি হইয়াই আকাশ-পথে বিচরণ করেন। পরে বিষ্ণুর সহিত গগন-পথে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বিহঙ্গরাজ ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট দুইটী বর প্রার্থনা করেন,—একটী আমি অমৃত পান না করিয়াও যেন অজর ও অমর হইতে পারি অপর এই বর দাও যে আমি তোমার উপর অবস্থান করি। বিষ্ণু তথাস্তু এই কথা বলিলে গরুড় কহিল 'তুমিও কোন বর প্রার্থনা কর আমি তাহা প্রদান করিতেছি।' বিষ্ণু, মহাবলবীর্য্যসম্পন্ন গরুড়ের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে 'তুমি আমার বাহন হও।' পরে ভগবান্ নারায়ণ উপরে রাখিবার নিমিত্ত গরুড়কে ধ্বজায় থাকিতে কহিলেন। তদবধি গরুড় বিষ্ণুর বাহন। গরুড় বিষ্ণুর বিবিধ প্রকারের মূর্ত্তির নীচেই বাহনরূপে খোদিত বা চিত্রিত হইয়া থাকে। আমরা বিক্রমপুরে বিষ্ণুর দশাবতারের এবং চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বিষ্ণু মূর্ত্তির অধিকাংশ মূর্ত্তিরই সন্ধান পাইয়াছি। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে গণেশ ও বরাহাবতার মূর্ত্তির বিষয় আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে বিষ্ণুর অন্যান্য অবতার এবং বিষ্ণুর বিবিধ প্রকারের শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। বিক্রমপুর অঞ্চলে বিষ্ণুমূর্ত্তি যত অধিক আবিষ্কৃত হইয়াছে অন্য কোন শ্রেণীর মূর্ত্তি তত অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই—অবশ্য বৌদ্ধ শ্রীমূর্ত্তির কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি না। পুরাণসমূহে বিষ্ণুমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বিষ্ণুমূর্ত্তির নাম নানারূপ; যথা—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নৃসিংহ, উপেন্দ্র, সুরেশ,

বিষ্ণু মূর্ত্তি-পরিচয়।

ইত্যাদি। অবতারের মধ্যে আমরা রাম, নৃসিংহ, পরশুরাম, বরাহ, বামন, বুদ্ধ ইত্যাদি মূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছি। বাহন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিয়া পরিশেষে বিক্রমপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তিসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। বিষ্ণুর বাহন যেরূপ গরুড় সেরূপ কোন্ কোন্ দেবদেবীর কোন্ কোন্ জীব বাহন তাহার উল্লেখ করিতেছি। যথা—শিব—বৃষ, পার্ব্বতী—সিংহ, গঙ্গা—মকর, গণেশ—মূষিক, কার্ত্তিক—শিখী, লক্ষ্মী—পেচক, সরস্বতী—পদ্মাসনা (পূর্ব্ববঙ্গে সরস্বতী 'চেলা' বাহনা বলিয়া খ্যাতা), চণ্ডী—গোধিকা। ব্রহ্মা—হংস, যম—মহিষ, সূর্য্য—সপ্তাশ্ব, নৈর্খত—নর, বরুণ—মীন, বায়ু—মৃগ, কুবের—নরযুক্ত বিমান, ইন্দ্র—গজ ইত্যাদি। স্ত্রীমূর্ত্তিসমূহেরও বাহন নানারূপ হইয়া থাকে। তবে শক্তির বাহন পুরুষ তুল্যই হয়। কোন কোন দেবীমূর্ত্তির বাহন বিশেষত্বযুক্ত। যেমন যোগেশ্বরী গৃধ্র বা কাকবাহিনী, কালিকা রাসভবাহিনা। শ্রীমূর্ত্তির বর্ণনায় বাহন-পরিচয় বিশেষ আবশ্যক বোধে আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম। 'মৎস্য পুরাণে' প্রতিমা-পরিচয় অধ্যায়ে এবিষয়ে বিস্তারিত লিখিত আছে।

শিব।

বিষ্ণুমূর্ত্তি বিক্রমপুরের যে সকল গ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং আছে তাহার উল্লেখ করা গেল। যথা—রামপাল, পাইকপাড়া, বজ্রযোগিনী, চুড়াইন, মুন্সীগঞ্জ, আবদুল্লাপুর, সোণারঙ্গ, টঙ্গীবাড়ী, বেত্কা, মহাকালী, বাহেরক, কামারখাড়া, পালঙ্গ, কুড়াশী, নগর, নড়িয়া, নশঙ্কর, হাঁসাইল, শিয়ালদি, বাঘ্রা, লৌহজঙ্গ, ব্রাহ্মণগাঁ, কোরহাটি, রিকাবীবাজার, আউটসাহী, ভরাকর, কল্মা, ছয়গাঁ, কেওয়ার, দুয়ালী, কুকুটিয়া। বিষ্ণুমূর্ত্তিসমূহের মধ্যে অধিকাংশই প্রস্তর-নির্ম্মিত। ধাতব মাত্র তিনটী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার একটী কলিকাতা গভর্মেণ্টের চিত্রশালা বা যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত, অপর দুইটী যথাক্রমে কামারখাড়া ও হল্দিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া পূজিত হইতেছে।

পল্লী কথা। (১)

(স্বাস্থ্যতত্ত্ব)

স্বাস্থ্যসুখ মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ সম্পদ হইতে যিনি বঞ্চিত, পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় দুর্ভাগা অতি বিরল। ব্যক্তিগত কথা ছাড়িয়া দিলে জাতীয় জীবনে ইহার অভাব যে কতদূর শোচনীয় তাহার অধিক বর্ণনা অনাবশ্যক। আমাদের দেশে দিন দিন যে কিরূপ ভীষণভাবে স্বাস্থ্যহানি হইতেছে—ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, বসন্ত, আমাশয় ইত্যাদি মৃত্যু-ব্যাধিতে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে যে হাহাকার উপস্থিত হইতেছে তৎসম্পর্কে এখন শুধু আলোচনা নহে, কার্য্যতঃও কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের সদাশয় মহাপ্রাণ রাজপুরুষগণের দৃষ্টিও এদিকে বিশেষরূপে পতিত হইয়াছে। আজকাল গভর্মেণ্টের উদ্যোগে পঞ্চনদ, বিহার ও আমাদের বাঙ্গালাদেশেও স্বাস্থ্যসমিতির অধিবেশন হইতেছে। এখন কথা এই যে গভর্মেণ্টের উপর সব বিষয়ে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? কিসে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি হয় তৎপ্রতি আমাদেরও কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দিন দিন যেরূপ নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতেছি, তদ্রূপ স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও তাঁহাদের অনুসরণ আমাদের পক্ষে পরম মঙ্গলের কারণ।

বাঙ্গালার পল্লীর অতীত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও স্বাস্থ্যসুখ এখন চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে, ওলাউঠার ভীষণ আক্রমণে, চিকিৎসকের সুব্যবস্থার অভাবে প্রতি গ্রাম হইতেই এখন শিক্ষিতসম্প্রদায় বা সঙ্গতিশালী ব্যক্তি নগরে বা অন্য কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। গ্রামে জঙ্গল বাড়িতেছে—খাল পথ বন্ধ হইতে চলিয়াছে, পরিত্যক্ত বিজন বাটীতে শৃগালদল মহানন্দে সন্ধ্যার উৎসব-গীতি গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। এরূপস্থলে পল্লীর স্বাস্থ্যসুখ পুনরায় সঞ্জীবিত করিতে হইলে গ্রামবাসীর সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। অধিকাংশ পল্লীতেই পল্লীবাসিগণের মধ্যে

পরস্পরে সম্প্রীতির অভাব, এজন্য বহু সাধু সংকল্প শুধু কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'প্রবাসী' (মাঘ ১৩২০) পত্রে পল্লীপরিচর্য্যা শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন "আমাদের দেশের পল্লীবাসিগণের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ও সহানুভূতির অভাব নাই ; সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার প্রণালীও দেখা যায়।" আমরা তাঁহার এ উক্তির প্রতিবাদ করিতেছি। অবশ্য বাঙ্গালা দেশে এরূপ অনেক পল্লী আছে যাহার অধিবাসিবৃন্দ পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারেন—কিন্তু বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে যাঁহারা পল্লীসমাজের সহিত মিলা মেশা করিয়াছেন তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই পল্লীবাসী পরস্পরের দ্বেষ ও বিদ্বেষের ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। আমরা এমন অনেক নিঃস্বার্থ যুবকের কথা জানি যাঁহারা পল্লীর সেবায় প্রাণমন নিয়োজিত করিয়াও সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কাজেই পল্লীগ্রামের উন্নতি, পল্লীবাসিগণের সমবেত চেষ্টা, যত্ন ও প্রীতির উপর নির্ভর করে। একতা ব্যতীত কোন কার্য্য হওয়া অসম্ভব। পল্লীগ্রামে এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় যাহারা শুধু সামাজিক দলাদলি, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ও মাম্‌লা মোকদ্দমার সৃষ্টি-দ্বারা জীবনাতিবাহিত করে। ইহারা পদ্মার 'ভাঙ্গনী' কূলের মত শুধু ভাঙ্গিতেই পারে গড়িতে পারে না, ইহারা গ্রাম্য অপদেবতা। যুবকগণের নিজ নিজ বাস-গ্রামের উন্নতিচেষ্টা এরূপ ভাবেই মুকুলে ঝরিয়া যায়। কাজেই পল্লীসমাজে এখন দিন দিন জাল-জুয়াচুরী, মিথ্যাসাক্ষী ইত্যাদি বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন নিরীহ লোকেরা সহরে যেরূপ শান্তি-সুখে বাস করিতে পারে পল্লীতে তাহা পারে না। গ্রামে এক দিকে সুদখোর মহাজন, অপর দিকে সামাজিক কলহ-প্রিয় গ্রাম্য সমাজপতিগণ ও মোকদ্দমা-প্রিয় গ্রাম্য 'বাস্তু ঘুঘু'—এ ত্র্যহস্পর্শ যোগের প্রবল আক্রমণ হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখা বড় সহজ কথা নহে। কাজেই যাঁহারা পারেন এবং কর্ম্ম কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা আর বড় সহজে পল্লীভবনে বাস করিতে সম্মত হন না বা পারেন না। এরূপ অবস্থায় পল্লীগ্রামের উন্নতি প্রচেষ্টা স্বাভাবিক হইলেও তৎসম্বন্ধে ভাবিবার অনেক কথা আছে।

সর্ব্বাগ্রে দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, (১) আত্মনির্ভর, (২) একতা। এ দুইটীর অভাবে কোন কার্য্যই সম্ভবপর নহে। আজকাল এক

শ্রেণীর শিক্ষিত লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা গ্রাম্য হিতানুষ্ঠান সুধু তর্ক, বক্তৃতা ও দরখাস্তের দ্বারাই সারিতে চাহেন। নিজেদের শক্তির উপর কেহই নির্ভর করিতে চাহেন না। এই শ্রেণীর লোকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন যে—"আত্মনির্ভরতা না থাকিলে বড়ই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পল্লীবাসীরা ক্রমশই ইহা হারাইয়া দুর্গতিপ্রাপ্ত হইতেছে। চক্ষু থাকিতেও তাহারা দেখিতে পাইতেছে না, হস্ত থাকিতেও তাহারা কার্য্য করিতে পারিতেছে না। তাহাদের শক্তি আছে, অথচ তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস নাই। ইচ্ছা করিলেই তাহারা একএকটী বৃহৎ কার্য্য করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু সে ভাব তাহাদের উদ্বুদ্ধ নাই। পানায় পানায় পুকুরের জল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, সেই জল পান করিয়া তাহারা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে ভুগিতেছে, কত অসুবিধাতেই তাহাদিগকে পতিত হইতে হইতেছে, কিন্তু প্রতিদিন হয়ত পাঁচশত লোক সেই পুকুরে স্নানাদি করে, তথাপি তাহার পানা উঠে না! প্রত্যেকে প্রতিদিন স্নানের সময় পাঁচ মিনিট করিয়া পরিশ্রম করিলে কয়দিনই বা এক একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী পরিষ্কার করিতে লাগে!

বর্ষায় পল্লীগ্রামে জল কাদায় মানুষের ত দূরের কথা, গ্রাম্য পশুগুলিও কত কষ্ট পায়; অথচ স্থানে স্থানে দুই চারি কোদাল মাটি কাটিয়া দিলেই এই কষ্ট নিবারিত হইতে পারে, দুই একটা নালা কাটিয়া দিলে গ্রামের জল বাহির হইয়া যায় এবং তাহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কিন্তু তাহা হয় না, শত কষ্টও সহ্য করিবে, প্রতি বৎসরই জ্বরে জ্বরে জীর্ণ হইয়া পড়িবে, অথচ নিজেদের এই সামান্য কাজটি তাহাদের দ্বারা হয় না। তাহারা ইহার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, হয় জমিদারের নিকট, না হয় জেলার বোর্ডের নিকট দরখাস্তের উপর দরখাস্ত ছাড়িবে, আর তর্ক করিবে। অথচ তাহাদের নিজেদেরই যে এই কার্য্য করিবার শক্তি আছে তাহা তাহাদের জানা নাই।" † কথা কয়টি অতি খাঁটি। আমরা ইহা গ্রামবাসী রূপে দৈনন্দিন ব্যাপারে উপলব্ধি করিতেছি। প্রীতির ভাব এখন আর পল্লীগ্রামে নাই। তাহার প্রধান কারণ শিক্ষিত

† গৃহস্থ (অগ্রহায়ণ)। শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

সম্প্রদায়ের পল্লী-ভবন পরিত্যাগ। অপর যুবক সম্প্রদায়ের একপ্রাণতার অভাব। প্রত্যেক দেশেই যুবক সম্প্রদায়ের কার্য্যকারিতার উপর দেশ-হিত-জনক কার্য্যের সাফল্য নির্ভর করে। গ্রাম্য প্রাচীনগণ কিংবা গ্রাম্য যুবকগণ অর্থাৎ যাঁহারা একরূপ পল্লীতেই বৎসরের অধিকাংশ কাল কাটান তাঁহাদের উৎসাহ উদ্যম অধিকাংশ স্থলেই তাশ-পাশা, গাঁজা বা গুলির আড্ডায় কিংবা কুৎসিৎ জল্পনা কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হয়।

দশজনে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিলে সে কার্য্য সুসম্পাদিত হইবার পক্ষে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। পল্লীগ্রামের হিতানুষ্ঠান বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইলেও তাহাই করা কর্ত্তব্য। প্রাচীনগণের কিংবা গ্রাম্য অলস যুবক-গণের শৈথিল্য কিংবা নৈতিক অবনতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দূরে রহিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করা কখনও সমীচীন নহে।

‘তোমরা সবে নামরে জলে
আমি কিন্তু থাকৃবো কূলে’

এ নীতি কর্ম্মী ব্যক্তির অনুকরণীয় নহে। পল্লীগ্রামের অজ্ঞ পরপীড়ক সম্প্রদায়ের ভয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দূরে অবস্থান অর্থাৎ “স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনং” এ নীতির অনুসরণ জ্ঞানীজনের অকর্ত্তব্য। যদি পল্লীর শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় দেশের হিত-কল্পে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হ’ন তাহা হইলে তাঁহাদের সৎকার্য্যের বিরুদ্ধে বাধা-বিপত্তি শিরোত্তোলন করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে এরূপ অমূলক বিশ্বাস নিশ্চিতই কেহ হৃদয়ে পোষণ করিবেন না। জীবনের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া না লইলে পদে পদে বিপদে পড়িতে হয়। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন—“Life is not to live merely, but to live well.” আমাদের শাস্ত্রকারেরাও বলিয়াছেন,

“ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ।
তান্ নিঘ্নতা কিং ন হতং রক্ষতা কিং ন রক্ষিতং॥

ধর্ম্ম বল, অর্থ বল, কাম বল, মোক্ষ বল, শরীর থাকিলেই এ সমুদয় রক্ষা হয়, শরীর নষ্ট হইলে এ সমুদয়ের কিছুই রক্ষিত হয় না।

এজন্যই পল্লীগ্রামকে উন্নত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ইহার স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্বাস্থ্য ব্যতীত জীবনের আর কোনও সার সুখ

নাই। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে ব্যাধির প্রকোপ একরূপ ছিল না বলিলেই হয় কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পল্লীগ্রামের সে শান্তিসুখ চির-অন্তর্হিত হইয়াছে। গ্রামে গেলে এমন একখানা বাড়ীও দেখা যায় না, যে বাড়ীতে কোন না কোন পীড়ার আক্রমণ নাই। প্রভাতে সন্ধ্যায় রমণীকুলের ক্রন্দন ধ্বনিতে হৃদয় বিদীর্ণ না হয়। কতকগুলি ব্যাধি আছে যাহার হস্ত হইতে চেষ্টা ও যত্ন করিলে অনেকটা আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়। গ্রামে সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, আমাশয় ও বসন্ত—একয়টি ব্যাধির প্রকোপই অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামবাসী দরিদ্র—দারিদ্র্যের জন্য তাঁহারা অনেক কার্য্য করিতে পারেন না তাহা সত্য, কিন্তু সমবেত চেষ্টায় তাহা অনায়াসেই সুসম্পন্ন হইতে পারে। প্রথম কথা অর্থ—অর্থ ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না। পল্লীগ্রামে ধনশালী ব্যক্তির একান্ত অভাব। গৃহস্থের (Middle Class men) সংখ্যাই বেশী। সকলেই কোনরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এরূপস্থলে প্রতি পল্লীতেই এক একটী করিয়া পল্লীসমিতি বা পরিষদ গঠন করা কর্ত্তব্য এবং উক্ত সমিতির অর্থাগমের প্রধান উপায় (১) মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ, (২) বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি গ্রাম্য কোন না কোন উৎসব ব্যাপারে সাময়িক দান গ্রহণ এবং যুবকগণের কায়িক শ্রম এ কয়টিই প্রধান। প্রতি বাড়ীহইতে প্রতি বেলায় এক মুষ্টি করিয়া চাউলের ভিক্ষা মাসান্তে সংগৃহীত হইলে অতি ক্ষুদ্র গ্রামেও মাসিক ১০।১৫৲ টাকা আয় হইতে পারে, তার পর বিবাহ ইত্যাদি উৎসব ব্যাপারেও বার্ষিক ২৫৲।৩০৲ টাকা সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য নহে। প্রত্যেক গ্রাম হইতেই মনোযোগ ও একপ্রাণতার সহিত কার্য্য করিলে ন্যূনপক্ষেও বার্ষিক ৩০০৲ তিনশত মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারেন। আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতানুসারেই এই কথা বলিতেছি। প্রতি বৎসর ৩০০৲ তিনশত টাকা হিসাবে যে কোন গ্রামের হিতে ব্যয় করা যাইবে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে গ্রামের প্রভূত কল্যাণ সংসাধিত হইবে। গ্রামের এ সকল কার্য্যে চাষা, ধোপা, মালী, কৈবর্ত্ত, ধিয়র, জেলে, নিম্নশ্রেণীর মুসলমান, বিবিধ অন্ত্যজ ব্যক্তির সহযোগিতাও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ করিলে সমাজে যাহারা ছোট লোক বলিয়া কথিত হয় তাহারাও নিজেদের ভাল-মন্দ কি তাহা বুঝিতে পারে। কারণ গ্রামের অধিকাংশ সংক্রামক ব্যাধিই এই

সমুদয় নিম্ন শ্রেণীর লোক দ্বারা পল্লীগ্রামে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। শুধু ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যেই গ্রাম্য হিতকল্পনা বা কার্য্য সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত নহে।

কবি গাহিয়াছেন,—
" A man is his own star
Our acts our angels are
For good or ill,—

মানব স্বয়ং আপনার ভাগ্য-বিধাতা। ব্যক্তি-সমষ্টি লইয়াই সমাজ। অতএব পল্লীসমাজের ভালমন্দের জন্য পল্লীবাসীই দায়ী। নিজ শরীরের প্রতি অযত্ন করিলে যেমন নানারূপ ব্যাধিতে আপনার দেহ আক্রমিত হইয়া উহার সৌন্দর্য্য ও দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় নিরুদ্ধ হয়, তেমনি সমাজ-জীবনেও প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ জাতীয় হিতানুষ্ঠানের জন্য দায়ী। গ্রামে ওলাউঠা লাগিল— তুমি চিকিৎসক, তুমি সে গ্রামবাসী, তুমি জানিয়া শুনিয়াও যদি সে দারুণ সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধের কথা না বলিয়া দাও তাহা হইলে সারা গ্রামে উহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, বহু প্রাণ ধ্বংস হইলে, তুমি কি অপরাধী হইবে না? আমরা পূর্ব্বে যে পল্লীসমিতি বা পরিষদের কথা বলিয়াছি তাহার প্রত্যেক সভ্যের নিম্নলিখিত-রূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত।

(ক) আমি... ..গ্রামের অধিবাসী। আমি এই লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া বলিতেছি যে (১) গ্রামের যে কোনও সদনুষ্ঠানে আমি সাধ্যানুসারে অর্থদান, মুষ্টিভিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ও আমার পারিবারিক কোনও আনন্দ উৎসব উপস্থিত হইলে গ্রাম্য সমিতিতে যথানুরূপ অর্থ সাহায্য করিব।

(২) গ্রাম্য পথ ঘাট পরিষ্কারের জন্য যদি আমার নিজ অধিকারভুক্ত ভূমিতে কোনও রূপ ফলবান বৃক্ষও থাকে এবং পল্লীপরিষদের নেতাগণ গ্রাম্য হিতার্থ তাহা কর্ত্তন করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন, আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। নিজ বাড়ীর নিকটস্থ জঙ্গল পরিষ্কার, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ইত্যাদি কার্য্যে সর্ব্বদা ব্রতী থাকিব এবং অপরকেও সাহায্য করিব।

(৩) নিজ পরিবারের স্ত্রীলোকগণকে ও বালকগণকে উপযুক্ত রূপ শিক্ষা-দানের জন্য চেষ্টা করিব।

(৪) আমার নিজ স্বার্থঘটিত কোনও মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে

গ্রাম্য সালিসি বা পঞ্চায়েতী প্রথার সাহায্যেই সর্ব্বাগ্রে মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব। যদি তাঁহারা তাহা না পারেন এবং আমি আমার বিশেষ স্বার্থের হানি হইয়াছে বিবেচনা করি তাহা হইলে পরিশেষে আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিব। পূর্ব্বাহ্নে গ্রাম্য নেতৃবৃন্দকে না জানাইয়া কখনই আদালতে যাইব না।

এইরূপ না করিলে কার্য্যকালে অনেককেই পশ্চাৎপদ হইতে দেখা যায়। মুখে মুখে বড় কথা অনেকেই বলেন কিন্তু কার্য্যতঃ ছোট একটী হিত কার্য্যও অনেকের দ্বারা সুসম্পন্ন হয় না। প্রথমতঃ স্বাস্থ্যের কথা। গ্রামের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গ্রাম্য সমিতির সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইলেই সর্ব্বাগ্রে (১) রাস্তাঘাট, (২) পুষ্করিণী, (৩) খালবিল, ডোবা ও জঙ্গল এই তিনটী সংস্কারের জন্য মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

গ্রামবাসীমাত্রেই জানেন পল্লীগ্রামে রাস্তাঘাটের কিরূপ দুর্দ্দশা। অধিকাংশ-স্থলেই পথগুলি স্বল্পপরিসর, জঙ্গলাকীর্ণ—যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ বিঘ্নপ্রদ।

রাস্তাঘাট।

সাপ ইত্যাদি হিংস্রজন্তুর ভয় পদে পদে। কোথাও বেতের ঝোপ, বাঁশের ঝাড়, রাস্তা ঘেরিয়া আছে; কাহার সাধ্য নির্ভয়ে অগ্রসর হয়। তারপর কোথাও খাল, কোথাও ডোবা তাহার ত অবধিই নাই। এরূপ স্থলে গ্রাম্য স্বাস্থ্যের উন্নতি কিরূপে সম্ভবে? বর্ষার সময়ে অনবরত বারি-পাতে, বন্যার জলে যখন এ সমুদয় পথ জলদ্বারা আবৃত কিংবা কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়ে তখন সে সমুদয় পথ দিয়া চলা অসম্ভব। পথের দুইধারে যে সমুদয় বাড়ী সে সকলের বহির্ভাগের ও অন্দরখণ্ডের যে কি শোচনীয় অবস্থা হয় তাহা ভুক্ত-ভোগী ব্যতীত অপরে কল্পনাও করিতে পারিবেন না। গ্রাম্য পথঘাট সংস্কৃত না হইবার প্রথম কারণ—গ্রামবাসিগণের সৌহার্দ্দের অভাব, পথের ধারের বাঁশবন, বেত ঝোপ কিংবা রাস্তা প্রশস্ত করিবার জন্য সামান্য দুই এক হস্ত পরিমিত ভূমি ছাড়িয়া দিতেও অনেক সময়ে ফৌজদারী মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়। যদি গ্রামবাসিগণ আমাদের নির্দ্দেশমত পল্লীপরিষদ গঠিত করিয়া পথের ধারের জঙ্গল কাটাইয়া মাটি ভরাট করাইয়া উহার সুবন্দোবস্তের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিন চারি হাত পরিসর এবং উপযুক্ত পরিমাণ উচ্চ পথ নির্ম্মিত হওয়া বিশেষ কষ্ট-সাধ্য নহে। বর্ষার সময়ে বৃষ্টির জল আটকাইয়া না থাকে এবং বন্যার জল উহার উপর দিয়া না যায় তদ্রূপ ব্যবস্থা করিলেই সর্ব্বপ্রকারে সুবিধা হয়। পল্লীপথের

পার্শ্বস্থিত ভূমির জঙ্গল ইত্যাদি কাটাইতে বাধা না দেওয়া প্রত্যেক গ্রামবাসীরই কর্ত্তব্য—কারণ জীবন অপেক্ষা পৃথিবীতে বহুমূল্য কিছুই নহে। প্রত্যেক বৎসর গ্রামের এক একটী পথের সংস্কারকার্য্যে মনোযোগী হইলেই অর্থের দিক্ দিয়া এবং কার্য্য-প্রণালীর দিক্ দিয়া সুব্যবস্থা হয় বলিয়া মনে করি। আর একটী কথাও প্রণিধানযোগ্য—মনে করুন ক এর বাড়ীর সন্নিকটস্থ পথটি দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে, উহার সংস্কার হইলে ক এর মহদুপকার হয়। এরূপ স্থলে পল্লী পরিষদ ককে উক্ত রাস্তা সংস্কারের জন্য অন্ততঃ পক্ষে অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য বাধ্য করিতে পারেন এবং ঐরূপ ভাবে তাহাকে অনুরোধ করা পল্লী পরিষদের পক্ষেও অন্যায় হয় না, কারণ ক্রমশঃ প্রত্যেক গ্রামবাসীর পক্ষেই ত উহা প্রযুজ্য হইবে।

বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক পল্লীতেই বহুল পরিমাণে দীঘী-পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশই প্রাচীন। এমন একদিন ছিল যখন দীঘী-পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহা জনসাধারণের হিতার্থ উৎসর্গ করা বিশেষ পুণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত—এখন সে দিন আর নাই। এক্ষণে উচ্চ বেতনভোগী রাজকর্ম্মচারী হয় ত সহরে সাহেব পাড়ায় সাহেবীফ্যাসানে বাস করিতেছেন আর তাঁহার বাড়ীর গ্রাম্য দীঘী-পুষ্করিণী অতি জঘন্য অবস্থায় নিপতিত, পানা, ভিট ইত্যাদিতে হাঁজিয়া বুজিয়া আসিতেছে! প্রাচীন দীঘী-পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে গেলে বহু ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না অথচ গ্রামেরও প্রকৃত কল্যাণ হয়। গ্রামে অন্ততঃ এইরূপ একটী দীঘী বা পুষ্করিণী থাকা উচিত যাহার জল কোনরূপেই দূষিত হইতে না পারে। জলের দোষেই নানাবিধ ব্যাধি সঞ্চারিত ও সংক্রামিত হয়। আমাদের দেশের দীঘী-পুষ্করিণী খনন করাইলে কি হইবে? তাহার রক্ষার জন্য কেহই মনোযোগী হ'ন না। গ্রামের পুষ্করিণী ইত্যাদির জল দূষিত হইবার প্রধান কারণ—নানাবিধ ময়লা পদার্থ নিক্ষেপ, পুরীষ ইত্যাদি সংযুক্ত বস্ত্র ধৌত করা, গরু ইত্যাদির স্নান, কাপড় কাচা, বাসন মাজা এবং সর্ব্বোপরি (লিখিতে লজ্জা বোধ হয় কিন্তু না লিখিয়াও পারিতেছি না) রমণীগণের মূত্রত্যাগ—অনেক স্থলে প্রকাশ্য পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া মূত্রত্যাগ করিতেও কুলবধূগণ কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করেন না, এবম্বিধ কুসংস্কার এবং নির্লজ্জ ব্যবহার দূর করিবার জন্য শিক্ষিত পুরুষগণের, বাড়ীর অভিভাবকগণের

দীঘী-পুষ্করিণী

রূঢ় হওয়া উচিত—মলমূত্র ইত্যাদি বাড়ীর এক নিভৃত স্থানে ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই সুসঙ্গত। মূত্রত্যাগে পুষ্করিণীর জল অত্যল্প সময়েই দূষিত হইয়া যায়। ঐরূপ জলদ্বারা হস্ত মুখ প্রক্ষালন ও পাকসাকের কার্য্য যে কিরূপে করিতে প্রবৃত্তি জন্মে তাহা ভাবিলেও মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। আমাদের রোগ বল, শোক বল, প্রত্যেক বিষয়েরই নিদান রমণীগণের মূর্খতা ও কুসংস্কার। আমরা অতীতের ইতিহাস তুলিয়া সীতা-সাবিত্রীর গৌরবে আমাদের রমণীগণকে যতই বিশেষিত করি না কেন—তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে সমাজের যে কতদূর নিম্ন-স্তরে অবস্থান করিতেছেন—তাঁহাদের দ্বারা দেশের যে কতদূর সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। যাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালীর উপর আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা, আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জীবন—এক কথায় একটা জাতির উন্নতি নির্ভর করে, তাঁহাদিগকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখিলে যে আমাদের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইবে তাহা পাঠকবর্গ আমাদের উপরিউদ্ধৃত প্রত্যক্ষদৃষ্ট সামান্য বিবরণী হইতেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

অনেকে পুষ্করিণী খনন করেন কিন্তু পারের গাছগুলির মায়া বিসর্জ্জন করিতে পারেন না। দুই চারিটি ফলবান বৃক্ষের মায়ায় তাঁহারা বিধাতার অমূল্য দান নিজ নিজ জীবনের প্রতিও হেয় ব্যবহার করেন। আম, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষ পুষ্করিণীর পারে থাকিলে উহার পত্রসমূহ পুষ্করিণীর জলে পতিত হইয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যেই জল নষ্ট করিয়া ফেলে। যাঁহারা বহু অর্থব্যয় করিয়া একটী পুষ্করিণী খনন করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে দু'চারিটি ফলবান বৃক্ষের মায়া সংবরণ করা অধিক কিছুই নহে। অনেকে মনে মনে যে সমুদয় বিষয় অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করেন চক্ষুলজ্জার দোষে সে সব কথা মুখ ফুটিয়া বাহিরে প্রকাশ করিতে পারেন না। এইরূপ লজ্জা একান্ত দূষণীয়। আমার খনিত পুষ্করিণীর জল অন্য কেহ আসিয়া অন্যায় রূপে দূষিত করিতেছে দেখিতে পাইয়াও নিরস্ত থাকা কাপুরুষের কার্য্য। মিষ্টভাবে বুঝাইয়া ঐরূপ অন্যায় কার্য্য হইতে নিরস্ত করার সৎসাহস থাকা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যাঁহারা দেশে গাঁয়ে থাকেন তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়ে মনোযোগী না হইলে বিশেষ নিজ নিজ পরিবারের বালকবালিকা ও স্ত্রীলোকগণের প্রত্যেক কার্য্যপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য না করিলে স্বাস্থ্য হানি হওয়ার অত্যধিক সম্ভাবনা। পুষ্করিণীর জল পুরুষ অপেক্ষা

স্ত্রীলোকেরাই নানারূপে দূষিত করেন, কাজেই তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে এই সকল বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

পল্লী-পুকুর *

এবার আমার পল্লী-পুকুর ভাঙ্গ্ পড়েনি তায়,
টল্ টলে নীল জল খানি তার চোখ জুড়িয়ে যায়।
দখিন্ পারে খেতের আলে পুষ্পিত মাঁদার,
বাহু তুলে অম্‌নি করে নৃত্য অনিবার।
তল দিয়ে তার সাদা পথটি বামোন পাড়ার দিক্,
সদাই করে আনাগোনা পল্লীর পথিক।
বাম দিকে তা'র পল্লী-পুকুর ডান্ দিকে তা'র মাঠ
একদিকে তা'র বকুল গাছের মস্ত সদর ঘাট। ১
পুব-উত্তরে একটি ছুটি তল্লা বাঁশের বন
সরল শোভার কাউ গাছেরে দিচ্ছে আলিঙ্গন
ফাঁক দিয়ে তা'র উকি মার্‌ছে গাব্‌বাগানের ছায়া
এক দিকে তা'র হিজল বরুণ অষ্ট-বক্র-কায়া।
ঐ যেখানে মাছরাঙ্গাটি বসে আছে তীরে,
'সোণা-লতা' জড়িয়ে আছে মাঁদার গাছের শিরে,
হিজল-শাখা পরাণভ'রে জল করিছে পান,
ঐ ঘাটেতে দল বাঁধিয়ে মোরা করি স্নান। ২
এই পারেতে বামোন পাড়া, উত্তরেতে চাষী,
ও পারেতে বোসের পাড়া পল্লী প্রতিবাসী।
গুয়া বনের ফাঁক দিয়ে যে ছনের ঘরের 'টুই',
ঐ ওঘরে শয্যা আমার, হোথায় আমি শুই।
ঐ ওখানে ওপারেতে ছুটি ডাবের গাছে
রবি শশির কিরণগুলি পাতার উপর নাচে।

* অনতিবিলম্বে প্রকাশয়িতব্য লেখকের কবিতা গ্রন্থ 'পল্লী' হইতে গৃহীত।

মাঝ দিয়ে তা'র বোসের পাড়ার খিড়্‌কি ঘাটের পথ,
বৌ ঝিয়েরা আসা যাওয়া করে অবিরত। ৩
করে তা'দের কাঁকন বাজে, পায়ে বাজে মল,
প্রেমে তাদের অঙ্গগুলি সদাই ঢল ঢল;
ললাট-ঢাকা-ঘোমটা তাদের ডাগর ডাগর চোক,
বসন দিয়ে ঢাকা তাদের অঙ্গেরি আলোক।
কল্‌সি কাঁকে, বাসন করে, চলে যাইতে দু'পা'
কালো পাছায় ঝিলিক্ জ্বলে চন্দ্র হারের রূপা।
বড় বড় কলসী কাঁকে ছোটো ছোটো মেয়ে
অর্থবিহীন থাকে ঘাটে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে। ৪
ছায়া-কালো পুকুর কোণে স্নিগ্ধ ও সজল,
জলের মাঝে যাচ্ছে দেখা 'হেলাঞ্চের' দল;
সবুজ বরণ ফরিংগুলা নৃত্য করে তায়।
কল্‌মি লতায় ফুল ফুটেছে, মধুর দেখা যায়!
ঝরে পড়ে তারার মত রাঙ্গা হিজল ফুল
জলে জলে ভাস্‌ছে তাহা, বাতাসে আকুল।
উঠ্‌ছে ভেসে মৎস্য কত ঢেউ তুলেছে জলে,—
বাঁশের বনে প্রৌঢ় দুটি বড়্‌শী লয়ে চলে। ৫
ছোটো ছোটো মেয়ের মত ঐ পারেতে থেকে
ঘাটের পথে বিয়ের 'লায়েক' ছেলে মেয়ে দে'খে,
বরুণ গাছের কোটর থেকে যোকারিয়া পাখী
আহ্লাদে সে উলুধ্বনি ক'রছে থাকি থাকি।
পূবের ঘাটে আমের গাছে 'কুটুম্ পাখীর' বাস,—
'পথে কুটুম্' রবে ডাকে,—নারীর মুখে হাস!
থাক্ তবেরে ও প্রবাসী! বল্‌বি কত আর;—
তোর পল্লী-পুকুর দেখ্‌বি কবে ভাব্ দেখি এবার। ৬

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।

আকুলির ব্রত

[নিরাকুলির ব্রতের ন্যায় আকুলির ব্রতও বিক্রমপুর অঞ্চলে বহুল ভাবে প্রচলিত। ব্রতের বিধি ব্রতকথার মধ্যেই আছে। একটী বর্ষীয়সী মহিলার নিকট হইতে এ ব্রতকথাটি সংগৃহীত হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রাদেশিকতা সামান্য পরিমাণে বর্জ্জন করিয়াছি মাত্র—নচেৎ যেরূপভাবে ব্রতকথাটি শুনিয়াছিলাম ঠিক্ সেইরূপ ভাবেই প্রকাশ করিলাম।]

এক বিধবা, তার একটী মাত্র ছেলে, পিতৃহীন বলিয়া গ্রামবাসী সকলেই তাহাকে 'দুইখ্যা' নামে সম্বোধন করে। অতি কষ্টে দিন চলে। মা সূতা কাটিয়া দেয়—দিনের খোরাক তাহাতেই নির্ব্বাহ হয়। এক দিন দুঃখী হাটে চলিয়াছে—পথে একটী বটগাছ, সে গাছ হইতে কে যেন বলিল "আজ তোর সুতো অমূল্য হ'বে। সুতো বেচে আমার জন্যে তেল সিঁদুর আনিস্।" সত্য সত্যই সে দিন দুঃখী হাটে যাইয়া সুতো বিক্রী করিয়া অনেক টাকা পাইল। সে মনের আনন্দে বহু জিনিষ পত্র কিনিয়া নৌকা ভরিয়া লইয়া বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল। তেল সিঁদুর কিনিতে তাহার ভুল হইয়া গেল। নৌকা আর চলে না! হঠাৎ তাহার মনে হইল তেল সিঁদুর ত কেনা হয় নাই! সর্ব্বনাশ! অমনি সে নৌকা ফিরাইয়া বাজারে যাইয়া তেল সিঁদুর কিনিয়া আনিল এবং ঐ যে বটগাছ—সেই বটগাছ তলায় তেল সিঁদুর রাখিয়া বলিল "কে আমাকে তেল সিঁদুর আনিতে বলিয়াছিলেন? আমি তেল সিঁদুর আনিয়াছি এই দেখুন।"

বটগাছে ছিলেন আকুলি ঠাকরুণ—তিনি হাসিয়া বলিলেন "আমার তেল সিঁদুর লাগিবে না, তোর মাকে বলিস্, শনিবারে অথবা মঙ্গলবারে উঠান লেপিয়া পিঁড়ি, ঘট, আমসল্লা দিয়া যেন আকুলির কথা বলে, তবে তোদের সব দুঃখ দূর হ'বে। যে কথা শুনিতে আসিবে তারও মঙ্গল হ'বে।" দুঃখীর মা সাম্নের শনিবার আকুলির কথা বলিল। তাহার সব দুঃখ দূর হইল। গ্রামের লোকে আসে নাই, তাদের অমঙ্গল হইল। শেষে সকলে আসিয়া আকুলির নিকট প্রার্থনা করিল 'আমার মঙ্গল হউক, আমি আকুলির কথা শুনিব।' এইরূপে

আকূলির কথা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সকলে বিপদে পড়িলে আকূলির কথা বলিও এবং আকূলির নিকট প্রার্থনা করিও, সব দুঃখ দূর হইবে। ফল কি? অবিবাহিতার বিয়ে হ'বে, আটকুঁড়ির ছেলে হ'বে, দীন-দুঃখীর দুর্দ্দশা দূর হ'বে।

শ্রীভুবনমোহিনী দেবী।